ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের বিচিত্র ধারা

দীনেশ চন্দ্র সাহা
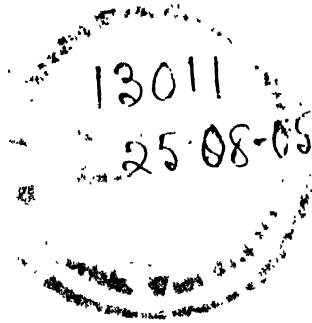
রাইটার্স পাবলিকেশন
প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট
আগরতলা, ত্রিপুরা

ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের বিচিত্র ধারা
Tripuray Gana Andolaner Bichitra Dhara
(Various Streams of Mass Movement in Tripura)
by, Dinesh Ch. Saha
Writers Publication, Palace Compound East
Agartala, Tripura, Ph. (0381) 222-8590
Price : 125/- Only

প্রথম প্রকাশ	:	বইমেলা - ২০০৫
প্রকাশক	:	দীনেশ চন্দ্র সাহা
	:	শ্রীমতী শীলা সাহা প্যালেস কম্পাউন্ড ইস্ট আগরতলা, ত্রিপুরা
অক্ষর বিন্যাস	:	রাজেশ ঘোষ, **প্লাজা গ্রাফিক্স** ওরিয়েন্ট চৌমুহনী, আগরতলা।
প্রচ্ছদ	:	**স্বপন নন্দী**
মুদ্রণ	:	অনিল লিথো গ্রাফিং কোং ১৩, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা-১২
মূল্য	:	**১২৫ টাকা**

ISBN-81-902476-1-1

প্রাপ্তি স্থান

- **রাইটার্স পাবলিকেশন**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **ত্রিপুরা দর্পণ**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **স্বাগতম প্রকাশনী**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **বুক ওয়ার্লর্ড (জ্ঞান বিচিত্রা)**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **ত্রিপুরা বাণী প্রকাশনী**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **অক্ষর প্রকাশনী**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **উত্তরণ**
  আগরতলা, ত্রিপুরা
- **লোকায়ত সাহিত্য কেন্দ্র**
  আগরতলা, ত্রিপুরা

উৎসর্গ

ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের ঋষিতুল্য জননেতা
সর্বজন শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার

গণতান্ত্রিক সমাজে গণআন্দোলন হল জনশক্তিব মূল উৎস । সবকাব এবং প্রশাসন পবিচালনায জনগণেব অংশগ্রহনেব অধিকাবকেই বলে গণতন্ত্র । সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায প্রজাদেব কোন অধিকাব ছিলনা । বাজাব ইচ্ছা এবং আদেশই শেষ কথা ।

১৯৩৫ সালেব ভাবত শাসন আইনে ভাবতেব সমস্ত দেশীয বাজ্যে সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনেব নির্দেশ দেওযা হয । তাবই পবিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুবা বাজ্যেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রয়োগ কবাব উদ্যোগ শুরু হয । কিন্তু দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবাব ফলে মহাবাজাব উদ্যোগ স্থগিত হয়ে যায ।

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব পব গণ আন্দোলনেব জোযাব শুধু বৃটিশেব সাম্রাজ্যবাদী শাসনেবই উচ্ছেদ ঘটাযনি, ভাবতেব বুক থেকে বাজন্য শাসনেবও অবসান ঘটিয়েছে ।

ত্রিপুবায় বাজন্যশাসনেব শেষলগ্নে অভূতপূর্ব গণ আন্দোলনেব জোযাব সৃষ্টি হয়েছে । যাব মধ্যে ভাবতীয গণ আন্দোলনেব সব কযটি ধাবাব সৃষ্টি, বিকাশ ও পবিনতি লক্ষ্য কবা যায ।

বাজন্যযুগে গণআন্দোলনেব অধিকাব না থাকায শোষিত ও অত্যাচাবিত প্রজাবা প্রতিকাবেব একমাত্র উপায হিসাবে বিদ্রোহ করেছে । বাজশক্তি সেসব বিদ্রোহ নির্মম ভাবে দমন করেছে । ভাবতেব ইতিহাসে অসংখ্য প্রজা বিদ্রোহেব একই পবিনতি ঘটেছে ।

ভাবতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেব দমননীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুঃসাহসী দেশপ্রেমিক যুবকবা বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছেন । বিদেশী অত্যাচাবীদেব এ দেশেব মাটিতেই শাস্তি দেবাব ব্যবস্থা করেছেন । বিদেশীদেব স্বার্থ বক্ষাব জন্য যেসব দেশীয কর্মচাবীবা অত্যাচাবীব ভূমিকা নিয়েছে বিপ্লবীবা তাদেবও রেহাই দেযনি । ত্রিপুবায বিপ্লবীবা আশ্রয় নিলেও দেশীয বাজাদেব বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা নেযনি । তবু তাদেব প্রেবণায ত্রিপুবায গণ আন্দোলনেব উর্বব ক্ষেত্র তৈবী হয়েছিল ইতিহাস তাব সাক্ষ্য দেয ।

ত্রিপুবায গণ আন্দোলনেব অগ্রণী নেতাবা প্রায সকলেই বিপ্লবী অনুশীলন দল অথবা যুগান্তব দলেব সদস্য ছিলেন । জেলখানায গিয়ে গান্ধীবাদী বা মার্কসবাদী হয়ে ফিরে এসেছেন ।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ত্রিপুবাব গণ আন্দোলন প্রধানত গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী ধাবায প্রবাহিত হয়েছে । ভাবতভুক্তিব প্রশ্নে সাম্প্রদাযিক ও বক্ষণশীল দুটি ধাবা সৃষ্টি হলেও জন-জোযাবে তা ভেসে গেছে ।

ভাবত ভুক্তিব পব ত্রিপুবায প্রবল বেগে উদ্বাস্তু আগমনেব ফলে গণআন্দোলনেব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাবাব সৃষ্টি হয । স্থানীয সমস্যাব ভিত্তিতে জনগণেব উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন দেখা দেয । আলাপ আলোচনাব মাধ্যমে এসব সমস্যাব সমাধান হবাব পব আন্দোলনেব সমাপ্তি ঘটে ।

ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন বাজনৈতিক দলেব আবির্ভাব ঘটে । বিভিন্ন মতাদর্শে গণআন্দোলন সংগঠিত হয । অনেক ক্ষেত্রে দলীয স্বার্থে গণআন্দোলন নিযন্ত্রিত হয । ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘাত- সংঘর্ষেব ঘটনাও ঘটে । সাধাবণ স্বার্থে যৌথ আন্দোলনেব সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অনেক

ক্ষেত্রে তা সংগঠিত করা যায়নি ।

বর্তমান গ্রন্থে ত্রিপুরায় সংগঠিত গণ আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে । লেখক নিজেই এসব গণ আন্দোলনের অংশীদার এবং প্রত্যক্ষ্যদর্শী হওয়ায় বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ইতিহাসের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভারতের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে ত্রিপুরা সবশেষে যাত্রা শুরু করলেও আন্দোলনের বিকাশ ও গণচেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারিতে স্থান লাভ করেছে ত্রিপুরা। সাধারন নির্বাচনে জনগণের অংশ গ্রহনের হার লক্ষ্য করলেই এই সত্য প্রমানিত হয় ।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য গণ আন্দোলনেও ত্রিপুরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে । এই আন্দোলন গণতন্ত্র রক্ষারও আন্দোলন । তাই এসব আন্দোলনের বিচিত্র ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া গণতান্ত্রিক সমাজের সচেতন পাঠকদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহের উপযুক্ত সুযোগের অভাবে যে সব ত্রুটি রয়ে গেছে তা সংশোধনের সহায়তা ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে ।

পরিশেষে এই গ্রন্থ রচণায় যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন - নিধুভূষণ হাজরা, অমল দাসগুপ্ত, শ্যামল চৌধুরী, সুদর্শন দাস, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, সাধন দাস, ধনমণি সিং ও অন্যান্য বন্ধুরা। প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের পুরানো পত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ত্রিপুরায় ষাটের দশকের পূর্ববর্তী পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছে। যা পাওয়া যায় তাও অসম্পূর্ণ। তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন।

এই গ্রন্থে লেখকের মূল লক্ষ্য হল বিভিন্ন ধারার গণ-আন্দোলনের সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া কোন একটি মাত্র দলের নীতি বা আদর্শের দ্বারা জনমত প্রভবিত নয় । বৈচিত্র্যের মধ্যেও জনগণের আদর্শে ঐক্য গড়া সম্ভব এই সত্যটি তুলে ধরা। পাঠকের মতামত লেখকের চিন্তাধারাকেও সমৃদ্ধ করবে আশা রাখি।

শ্রী দীনেশ চন্দ্র সাহা
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

বীরেন দত্ত

প্রভাত রায়

বংশী ঠাকুর

গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা

শচীন্দ্র লাল সিংহ

সুখময় সেনগুপ্ত

উমেশ লাল সিংহ

তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত

দশরথ দেব
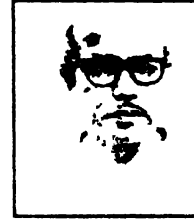
অঘোর দেববর্মা

সুধন্বা দেববর্মা

হেমন্ত দেববর্মা

নৃপেন চক্রবর্তী

বীরচন্দ্র দেববর্মা

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

জীতেন পাল

ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের অগ্রণী নেতৃত্ব

মানিক সরকার

অনিল সরকার

তপন চক্রবর্তী

বাদল চৌধুরী

মানিক দে

জিতেন চৌধুরী

কেশব মজুমদার

গোপাল দাস

খগেন্দ্র জমাতিয়া

ফয়জুর রহমান
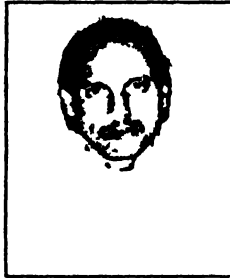
বিজয়লক্ষ্মী সিংহ
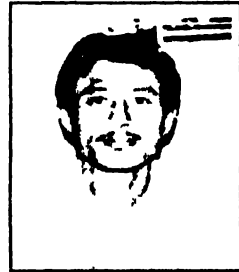
প্রণব দেববর্মা

গণআন্দোলন থেকে উঠে আসা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম মন্ত্রী সভা

প্রথম অধ্যায়

গণআন্দোলনের পটভূমি

পৃথিবীব সব দেশেই ইতিহাসেব এক সুনির্দিষ্ট পবিস্থিতিতে গণআন্দোলনেব জন্ম হয়েছে। জনগণেব অধিকাব বোধ এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাব সংগ্রাম থেকেই গণআন্দোলনেব জন্ম হয। বহু বক্তপাত, অত্যাচাব, নির্যাতন ও জীবন দানেব মধ্য দিয়েই গণআন্দোলনেব অধিকাব অর্জন কবতে হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাব মধ্য দিয়েই গণআন্দোলনেব অধিকাব জনগণেব মৌলিক অধিকাব রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায লিখিত বা অলিখিত সংবিধান পৃথিবীব সব গণতান্ত্রিক দেশেই প্রতিটি নাগবিকেব জন্য সুনির্দিষ্ট মৌলিক অধিকাব হিসেবে গণআন্দোলনেব অধিকাবকে স্বীকৃতি দিয়েছে যে দেশে নাগবিকদেব এই অধিকাব নেই সে দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে স্বাকাব কবা হয না। সে দেশেব নাগবিকদেব গণতান্ত্রিক অধিকাবেব জন্য কোন না কোন ধবনেব সংগ্রাম কবতে হয। স্বৈবাচাবী শাসনেব প্রচন্ড দমননীতিব মোকাবিলা কবতে হয। সেখানে অন্যায অবিচাবেব বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ কবা ছাডা দ্বিতীয পথ খোলা থাকে না।

'ত্রিপুবাব গণআন্দোলনেব পটভূমি বুঝতে হলে প্রথমেই ভাবতেব গণআন্দোলনেব ইতিহাস বিশ্লেষণ কবতে হবে সেই সঙ্গে সাবা বিশ্বেব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেব দিকেও খানিকটা দৃষ্টি নিক্ষেপ কবতে হবে।

ইউবোপায গণতন্ত্রই ভাবতেব গণআন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক আদর্শেব প্রেবণা যুগিয়েছে। আজকেব ইউবোপ দুইশ বছব আগেও এমনটি ছিল না। ১৮১৫ সালেও ইতালি এবং জার্মানী অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাজ্যে বিভক্ত ছিল। একই ভাষাভাষি বাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ কবে এক একটি শক্তিশালী জাতিভিত্তিক বাষ্ট্র গঠনেব জন্য বহু যুদ্ধ, বহু বক্তপাত হয়েছে নেপোলিযন ইউবোপে নিজেব অজ্ঞাতসাবেই জাতীযতাবাদ এবং স্বাধীনতাব স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ফবাসী বিপ্লব থেকে এসেছিল বাজতন্ত্রেব উচ্ছেদ এবং প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাব ধাবণা। বহু বক্তপাতেব পব ১৮৬১ সালে অখন্ড ইতালী বাষ্ট্র গঠিত হল, বোম হল বাজধানী।

জার্মানীব বাব যুবকবা অস্ত্র ও বক্তেব হোলি খেলায বাব বাব পবাজিত হল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবাব পব জার্মানীতে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবেব আগে ইউবোপে ছিল ধর্মেব শাসন বাজা এবং পুবোহিত ছিল জনগণেব ভাগ্যবিধাতা। জনগণও বিশ্বাস কবতো বাজা হলেন ঈশ্ববেব প্রতিনিধি। এই পবিবেশেই জন্ম নিয়েছিল অসংখ্য ধর্মীয ও সামাজিক কুসংস্কাব।

বিজ্ঞান এবং যন্ত্রশিল্প ভেঙ্গে দিয়েছে পুবানো সব সংস্কাব। বাজা এবং পুবোহিত উভয শক্তিব উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কবেছে আধুনিক পুঁজিবাদ। বাজাকে হটিয়ে প্রজাদেব শাসন প্রতিষ্ঠা কবে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাব মহৎ আদর্শকে তুলে ধবেছে বুর্জোযা দেশপ্রেমিক বাজনীতিবিদ এবং দার্শনিকেবা। এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে পূর্ণ সহযোগিতা কবেছে কৃষক - শ্রমিব ও মধ্যবিত্তবা।

ইংলন্ডের গণতন্ত্রে একজন রাজ প্রতিনিধিকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষমতার শীর্ষ আসনে, যদিও তিনি পার্লামেন্টের নির্দেশকে মেনে চলতে বাধ্য। রাজতন্ত্রের উপর এই মোহের প্রধান কারণ হল ইংলন্ডেই প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছে। ইংরেজরাই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে বহু দেশকে পদানত করেছে। তাই দেশের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র এবং উপনিবেশের সাম্রাজ্যে রাজার নামে - স্বৈরাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য গণতন্ত্রের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেছে।

অবশ্য অভিজাত ইংরেজদের মধ্যে রাজতন্ত্রের একটা মোহ সর্বদাই ছিল তাদের কাছে রাজা হলেন অভিজাত্যের প্রতীক।

ফরাসীরাও শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে বিশ্ব বাজার দখলের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে প্রায় একই সময়ে। ভারতে এবং কানাডায় ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের বার বার যুদ্ধ হয়েছে। ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান সহযোগী ছিল রাজা এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট। কিন্তু ফরাসী পার্লামেন্টের মাথায় রাজা ছিল না। কাজেই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় ফরাসী বণিকরা ফ্রান্স সরকারের সাহায্য পায়নি তাই ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিটি যুদ্ধে ফরাসীরা হেরে গেছে। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার ছিল বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য।

রুশ বিপ্লবের আগে ইংলন্ডে বা ইউরোপের কোন দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শ্রমিক, কৃষক এবং নারীর ভোটাধিকার ছিল না। রুশ বিপ্লবের ধাক্কায় ইউরোপের সবদেশেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সব নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেতে থাকে। অবশ্য গণআন্দোলন ছাড়া কোন দাবীই আদায় হয়নি।

শিক্ষা বিস্তার, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার এবং যন্ত্রশিল্পের আবির্ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটে গেছে। সমাজের সকল মানুষের স্বার্থেই রাজার শাসন এবং পুরোহিতের কর্তৃত্বকে উচ্ছেদ করার জন্য বণিক শিল্পপতি, কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইউরোপের প্রতিটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তাক্ত সংগ্রাম করেছে এবং সমাজ কাঠামোর বদল ঘটিয়েছে। এইসব ঘটনায় জনগণের আন্দোলনকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং নিষ্ঠুর দমননীতি চালানো হয়েছে। সেজন্যই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে সশস্ত্র লড়াই করতে হয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠার পর প্রতিটি দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র হিসেবে নতুন নতুন শহর, নগর গড়ে উঠেছে। নগর জীবনে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচর্চা। রাজার শাসনে কোন দেশেই জনগণের জন্য শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ ছিল না। জনগণের সংস্কৃতি ও ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত। রাজন্য শাসনের স্বার্থে ইউরোপের সব দেশেই দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে গীর্জা। গীর্জাগুলোকে সর্বাধিক আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরোহিতের হাতে ছিল সামাজিক শাসনের অনেক ক্ষমতা। রাজা বা পুরোহিতের কোন কাজের সমালোচনা করলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো। ধর্মীয় আচরণে ত্রুটি ধরা পড়লে খুঁটিতে বেঁধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো।

ভারতে ধর্মীয় আচরণে এতটা নিষ্ঠুরতা ছিল না। মুসলিম আগমণের আগে ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশী। যার যেমন খুশী ধর্মমত পোষণ করতে বাধা ছিল না। মুসলিম

আগমনের পর ব্যাপক ধর্মান্তর শুরু হওয়ায় হিন্দু ধর্মের প্রাচীন দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - ১) পর ধর্ম সহিষ্ণুতা এবং ২) বিবেকের স্বাধীনতা,সামাজিক জীবন থেকে প্রায় মুছে গেছে। ধর্মের মুখোশ পরে নানা কুসংস্কার, রীতিনীতি ও মতবাদ হিন্দু সমাজের ঘাড়ে চেপে বসেছে।

প্রাচীন ভারতের সমাজে এক ধরনের গ্রামীণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। রাজার শাসন সেখানে হস্তক্ষেপ করত না। সেই ব্যবস্থা এক সময়ে হারিয়ে গেল। সমাজের সর্বস্তরে জনগণের স্বাধীনতা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

প্রাচীনকালে রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠার প্রথম যুগে সব দেশের দার্শনিকেরাই রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের কল্যাণ হয় এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাধারা পরবর্তীকালে সারা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল।

ভারতে- **'কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্র'**-- প্রাচীন রাজাদের রাষ্ট্র পরিচালনার এক অভিনব শাস্ত্র বলে গণ্য হয়। গ্রীক সেনাপতিরা ভারতে এরকম উন্নত রাষ্ট্র কাঠামো দেখে অবাক হয়েছিলেন। কৌটিল্যের অপর নাম চাণক্য, অসল নাম ছিল বিষ্ণুগুপ্ত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজা ও মন্ত্রীর কর্তব্য, গ্রাম ও নগরের শাসন ব্যবস্থা, আইন-আদালত, সামাজিক রীতিনীতি, নারীর অধিকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তির প্রতিপালন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ব্যবস্থা, বয়ন শিল্প, যুদ্ধ ও শান্তি, সেনাবাহিনীর গঠন ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অতি মূল্যবান নীতি ও নির্দেশ রয়েছে।

রাজার অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রজারা সমবেত হয়ে রাজার হাতে রাজভার অর্পণ করতো। রাজা শপথ গ্রহণ করতেন — "প্রজাদের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত রাখবেন" --- এই শপথ বাক্য পাঠ করে। মূল আদর্শ ছিল--- "প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ"- - সে যুগে রাজা অর্থে প্রজার সেবক বোঝাত।

সে যুগে নগরবাসীদের কেউ রাস্তায় আবর্জনা ফেললে জরিমানা আদায় করা হত। এই নীতি বর্তমান যুগেও প্রযোজ্য। নগরে পৌরসভা এবং গ্রামে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে ভারতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং বার বার বিদেশী আক্রমণের ফলে ভারতীয় গ্রামীণ এবং নগর জীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যে সব গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য বীজাকারে দেখা দিয়েছিল তা সুদীর্ঘকালের মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসনে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল।

বৃটিশ বণিকরা ভারতবর্ষ শাসন করেছে একশ বছর। পরবর্তী নব্বই বছর শাসন করেছে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি বৃটেনের রাজা বা রাণী। বৃটিশ বণিকরা চেয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার। কিন্তু ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকেরা তাদের হাতে তুলে দিয়েছে শাসনের অধিকার। বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার এবং রক্ষার মূল শক্তি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ পার্লামেন্ট বুঝতে পেরেছিল যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ভারতবাসী অর বেশীদিন বরদাস্ত করবে না। তাই কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি বৃটিশ সরকারের অধীনে ভারত শাসনের সিদ্ধান্ত নিল বৃটিশ পার্লামেন্ট।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবাসীর জন্যে বহু প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন। ভারতীয় প্রজাগণ এক বুক আশা নিয়ে প্রতীক্ষায় রইলেন প্রতিশ্রুতি পূরণের মাধ্যমে কিভাবে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হয় তা দেখার জন্যে।

বলা যায় ভারতীয় জনমনে এই সময় থেকেই আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত হয়েছিল, যদিও তা ছিল ইংরেজী শিক্ষিত অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু গণআন্দোলনের অধিকার তখনও স্বীকৃত হয়নি। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা যেখানেই সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ করেছে সেখানেই কৃষক বিদ্রোহ আখ্যা দিয়ে প্রচন্ড দমননীতি চালিয়ে কৃষকদের প্রতিবাদ এবং দাবী দাওয়াকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব দমননীতি চালানো হয়েছে জমিদার এবং দেশীয় রাজাদের পূর্ণ সহযোগিতায়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা না ঘটলে ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যই ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ সরকারকে দেশীয় রাজা মহারাজারা যেভাবে সাহায্য করেছে তা দেখে বৃটিশ পার্লামেন্ট অভিভূত হয়ে যায়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করলেন --- যতদিন দেশীয় **রাজারা বৃটিশ সরকারের অনুগত থাকবে --- ততদিন তাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষার সব দায়িত্ব বৃটিশ সরকার বহন করবে।**

ভারতে বিশাল জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিল বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করার প্রয়োজনেই। জমিদার এবং দেশীয় রাজা-মহারাজারা স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিল যে, বৃটিশ সরকারের অস্তিত্বের উপর তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কাজেই তারা আন্তরিকতার সঙ্গেই বৃটিশ স্বার্থ রক্ষায় সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। বিনিময়ে প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেছে। বৃটিশ শাসকরা নিজেদের দেশে গণতন্ত্র ভোগ করলেও ভারত সাম্রাজ্যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে মজবুত করে তুলল সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থা।

সামন্ততন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঃ-- কৃষক ও গ্রামীণ কারিগর শ্রেণীর উপর নির্মম শোষণ, বল প্রয়োগ করে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো এবং নানা রকমের কর ও ভেট আদায় করা। ভারতে জমিদার শ্রেণী এবং দেশীয় রাজা-মহারাজা ও নবাবেরা বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা করে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অধিকার ভোগ করেছে। ফলে গণতন্ত্রের ভেকধারী বৃটিশ সরকারের শাসনে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যাবতীয় প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ বলে ঘোষণা দিয়ে নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে।

ভারতের বহু রাজ্যে অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যেও কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। ইউরোপের প্রতিটি দেশে কৃষক বিদ্রোহ ভয়ানক, রক্তাক্তরূপ নিয়েছিল। আমেরিকায় সামন্ত শাসন ছিল না। ইংরেজ এবং ফরাসী বণিকরা উপনিবেশ স্থাপন করে কৃষি কাজের জন্য কৃষক বা কৃষি মজুর খুঁজে পায়নি। স্থানীয় রেড ইন্ডিয়ান উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা কৃষি কাজ করতে রাজি হয়নি। ফলে রক্তাক্ত সংঘর্ষ হয়েছে। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা রেড ইন্ডিয়ানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছে রেড ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীগুলোকে।

কৃষি কাজের জন্য আমেরিকানরা এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ থেকে জোর করে ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে কৃষি কাজে নিয়োগ করেছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে। প্রকাশ্যে পশুর মত খাঁচায় বেঁধে ক্রীতদাসদের কেনা বেচার বহু বাজার ছিল আমেরিকায়।

১৭৭৫ সালে আমেরিকার তেরটি বৃটিশ উপনিবেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।রক্তাক্ত যুদ্ধের পর স্বাধীন আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র রূপে আবির্ভূত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল- -- **"সব মানুষই সমান হয়ে জন্মায়।"** অর্থাৎ স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু চল্লিশ লক্ষ ক্রীতদাসকে তারা মানুষ বলেই গণ্য করল না।

১৮৬৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ক্রীতদাস প্রথার অবসান ঘোষণা করলেন। আমেরিকান খামার মালিকেরা বিদ্রোহ করল। দুই বছর গৃহযুদ্ধ চলল। আব্রাহাম লিংকন আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। গৃহযুদ্ধের অবসান হল। ক্রীতদাসরা মুক্তি পেল। কিন্তু আইনত নাগরিক অধিকার পেলেও আমেরিকায় সাদা-কালো মানুষের বৈষম্য শেষ হল না। আজও তার অবশেষ রয়ে গেছে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধে অসংখ্য যুবক মারা গেছে। এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশ থেকে বহু যুবক আমেরিকায় আসার সুযোগ পেল। আমেরিকার বিপুল প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের তুলনায় লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা প্রসারের জন্য নানা দেশ থেকে আগত দক্ষ শ্রমিক ও কর্মীদের স্বাগত জানানো হলো।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে নানা দেশের নানা ভাষার অজস্র মানুষের স্রোত আমেরিকায় এসে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় নতুন এক মিশ্রজাতির আবির্ভাব ঘটল আমেরিকায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে বৃটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল আমেরিকা। শিল্প পণ্য বিক্রীর বাজার দখলের জন্য নতুন কোন দেশ দখলের যুদ্ধে গেলনা আমেরিকা। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে লাগল অন্যান্য দেশকে। এভাবেই নতুন এক অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল আমেরিকা। বর্তমানে সারা বিশ্বে অবাধ বাণিজ্য এবং উদার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে আমেরিকা। কারণ যন্ত্র শিল্পে আমেরিকা আজ এতই উন্নত যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় তাদের পক্ষে বাজার দখল করা খুবই সহজ।

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করতে হয়নি। ভারতেও এই অধিকার অর্জনের জন্য অহিংস এবং সহিংস দুই ধরনের লড়াই হয়েছে প্রায় একশ বছর ধরে। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছিল বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ ভারতীয় সিপাহীরা।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য দেশীয় রাজা-মহারাজাদের সাহায্য না পেলে তখনই এ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হতো ইংরেজ শাসকদের।

তখন ভারতীয় জনগণের মধ্যেও স্বাধীনতার কোন চেতনাই ছিল না। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী দখল করে প্রাক্তন সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। কাজেই ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে মুসলমান শাসন ফিরিয়ে আনার আগ্রহ অধিকাংশ ভারতীয়দের মধ্যে ছিল না। তবুও

এই বিদ্রোহের ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হল। ভারতবর্ষ বৃটিশ পার্লামেন্টের সরাসরি শাসনে গেল। এতে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তনের সূচনা হল। প্রতিটি প্রজা বিদ্রোহ এবং কৃষক বিদ্রোহের মধ্যেই কিছু না কিছু রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত সময়ে শিক্ষা ও নেতৃত্ব পেলে বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের বীজ থেকেই গণআন্দোলন বিকশিত হয়ে উঠে।

ত্রিপুরায় প্রজা বিদ্রোহগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে ছিল গণআন্দোলনের বীজ। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই বীজ থেকেই বিকশিত হয়েছিল গণআন্দোলনের সবুজ চারা গাছ। কিন্তু সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে সে চারা গাছটি বেড়ে উঠতে পারলনা স্বাভাবিক গতিতে। গণআন্দোলন প্রায় বিদ্রোহের ধারায় প্রবাহিত হল নতুন পরিবেশে।

ভারতভুক্তির পর ত্রিপুরায় যে গণআন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রধান ভিত্তি তৈরী হয়েছিল জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্যেই। অবশ্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেই প্রথম গণআন্দোলনের পথ খুলে দেওয়া হয়। শহরের শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে জেগে উঠে জাতীয়তাবাদী আবেগ।

ভারতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পথে প্রধান বাধা ছিল নিরক্ষরতা, জাতিভেদ প্রথা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অস্পৃশ্যতা ও চরম দারিদ্র্য ইত্যাদি।

গান্ধীজির নেতৃত্বে এসব বাধা একে একে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছেদ থেকে মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। ভারতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বার বার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শুধুমাত্র বৃটিশের ভেদনীতিকে এর জন্য দায়ী করে দায়িত্ব এড়ান যায় না। জাতীয়তাবাদী নেতাদের ভূমিকাও একজন্য দায়ী।

মুসলমান আগমনের পর থেকেই ভারতীয় হিন্দুরা ক্রমশ সংকীর্ণতার নীতি নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছে। চরম গোড়ামীর পথে ধর্মীয় রীতিনীতিকে কঠোর করে তুলেছে।

একইভাবে মুসলমানদের মধ্যেও শরিয়তি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচণ্ড গোড়ামীর জন্ম দিয়েছে।

সম্রাট আকবর দুই ধর্মমতের মিলন ঘটাতে গিয়ে মোল্লা মৌলবী ও পণ্ডিতদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতারা করেননি।

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং অভিজাত মুসলমান। তাদের নিজেদের মধ্যেই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ লোকহিত প্রবন্ধে এ বিষয়ে তীব্র কষাঘাত করেছেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করার ভারতীয় আদর্শ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফল হয়নি। নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং আন্দোলনের নীতির মধ্যে পার্থক্য থাকার ফলেই এই ব্যর্থতা। বৃটিশ সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে।

জাতিভেদ প্রথা মুসলমান সমাজেও প্রচলিত হয়েছিল। ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধরা সামাজিক সাম্য ও মর্যাদা লাভের আশায় দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু

মুসলিম অভিজাতরা তাদেরকে নিম্নবর্ণের মুসলমান বলেই গণ্য করেছেন। খৃষ্টান ধর্ম যারা গ্রহণ করেছিল, তাদের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটেছিল। দক্ষিণ ভারতে নিম্নবর্ণের খৃষ্টানদের জন্য আলাদা গীর্জা তৈরী হয়েছিল।

আসল সমস্যা হল অর্থনৈতিক বৈষম্য। সেক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী নেতারা খুব বেশী নজর দেননি। একই গ্রামের কৃষক-জমিদার ও মহাজনকে একই সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা সফল হতে পারে না।

সারা ভারতে অখন্ড মুসলিম সমাজ বলে কিছু ছিল না। প্রতিটি প্রদেশে পৃথক পৃথক ভাষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত এক সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। সেটাই ছিল ঐক্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিবেচনায় ভারতীয় সংস্কৃতি মানে হিন্দু সংস্কৃতি। মুসলিম অভিজাতরা এই দৃষ্টিভঙ্গী মেনে নিতে পারেনি। ক্রমে ক্রমে তা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের রূপ নিয়েছে। গান্ধীজীও জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐক্য গঠনের ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি উপেক্ষা করেছেন।

উপরন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে দলিত শ্রেণীকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতারা দলিত শ্রেণীকে কি পরিমাণ অবজ্ঞা করতো ডাঃ আম্বেদকরের জীবন থেকে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। আম্বেদকরের বাবা ছিলেন মহারাষ্ট্রের অস্পৃশ্য মাহার শ্রেণীর লোক। বহু চেষ্টা করে একটি গ্রামের পাঠশালায় আম্বেদকরকে ভর্তি করাতে সক্ষম হন। কিন্তু আম্বেদকরের জন্য নির্দিষ্ট হয় পৃথক একটি আসন। কোন শিক্ষক আম্বেদকরের খাতা-বই স্পর্শ করতো না। ফলে পড়াশুনার মূল্যায়ন হতো না।

এই সময় আর্য সমাজ হিন্দু সমাজের সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছিল। একজন আর্য সমাজপন্থী আম্বেদকরকে বোম্বাইয়ের একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে একটি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। মেট্রিক পাশ করার পর কোন কলেজে স্থান পাওয়া যাচ্ছিল না। বরোদার মহারাজা একটি কলেজে আম্বেদকরকে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। বি.এ পাশ করার পর মহারাজার একটি অফিসে চাকুরী পাওয়া গেল। পৃথক চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার সময় পিয়নরা অফিসের ফাইল ছুঁড়ে দিত যাতে স্পর্শ না লাগে। অফিসে পানীয় জল স্পর্শ করতে দিত না। অপমানে আম্বেদকর চাকুরী ছেড়ে দেন। মহারাজার চেষ্টায় একটি বৃত্তি পেয়ে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষায় যান। লন্ডন থেকে অর্থনীতিতে এম.এ এবং আমেরিকা থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। মহারাজার সেনাবাহিনীতে সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত হন।

মহারাজা আশা করেছিলেন উচ্চশিক্ষিত ও পরিচ্ছন্ন আম্বেদকরকে সেনাবাহিনী অস্পৃশ্য করে রাখবে না। কিন্তু মহারাজার নির্দেশও কার্যকর হল না। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের চটাতে রাজা-মহারাজাও সাহস পেতেন না। কারণ প্রশাসন তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ আম্বেদকর অস্পৃশ্য মানুষের সামাজিক মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে সদলবলে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দলিত শ্রেণী অংশ নিল না। বামপন্থীরাও শ্রেণী সংগ্রামের

তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দলিত সমস্যার দিকে নজর দিতে পারল না। ফলে সব রাজনৈতিক দলের উপর দলিতরা বিশ্বাস হারিয়েছে। জগজীবনরামকে সামনে রেখে কংগ্রেস দল দীর্ঘ ত্রিশ বছর দলিতদের মোহগ্রস্ত করে রাখার চেষ্টা করেছে। মিছিলে ও সভায় সংখ্যা বাড়ানো এবং নির্বাচনে ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া দলিত শ্রেণীকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রকৃত কোন কাজ করেনি কংগ্রেস সরকারগুলো। তাই সুদীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা দলিত শ্রেণীকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত অধিকার আদায়ের জন্যই গণআন্দোলন সংগঠিত করছে। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ও পার্লামেন্টে ভাবতেব সংগঠিত দলিতরা বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগ্য নির্ধারক হয়ে উঠেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতারা আজ স্বীকার কবতে বাধ্য হচ্ছেন যে দলিতদের আর উপেক্ষা করা চলে না।

তবে আদর্শহীন, সুবিধাবাদী ও ক্ষমতালোভী নেতৃত্ব দলিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে পারে না- বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আদর্শবাদী নেতৃত্ব এবং বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচীর একান্ত প্রয়োজন। কর্মসূচীব ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী গণআন্দোলন। এক্ষেত্রে বামপন্থীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। অথচ বাপন্থীরাই এ বিষয়ে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে।

রাজন্য যুগের ইতিহাসে আমরা ত্রিপুরাতেও দেখতে পাই শহরেব অভিজাত শ্রেণী পাহাড়ের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মানুষকে খুবই অবজ্ঞার চোখে দেখত। সামন্ততান্ত্রিক শোষণের শিকাব হয়েছিল সারা রাজ্যের প্রজারাই। তবে ত্রিপুরার প্রজারা অস্পৃশ্য বলে গণ্য হয়নি। রাজ পরিবারেও স্থান পেয়েছে পাহাড়িয়া উপজাতি কন্যারা। অনেকে রাণী বা মহারাণীর সম্মানও পেয়েছে।

কিন্তু সামন্ততন্ত্রের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য যেমন - বেগারখাটা, জোর করে যে কোন কাজে বাধ্য করা, কর ও ভেট আদায় করা, পুরোহিতের নির্দেশ মানতে বাধ্য করা, শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ইত্যাদি ত্রিপুরাতেও অব্যাহতভাবেই প্রচলিত ছিল।

উপজাতি সমস্যার দুটো দিক রয়েছে ১) জীবিকার সমস্যা, ২) স্বাধীনতাব সমস্যা। রাজন্য যুগে অনাড়ম্বর জীবনে জীবিকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেনি। জমির উপর কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের পথে বাধা ছিল না। তাছাড়া বনজ সম্পদ সংগ্রহের স্বাধীনতা ছিল। প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবিকা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে জাতিসত্ত্বা বিকাশের ফলে নিজস্ব রাজনৈতিক ক্ষমতার দাবী তীব্রভাবেই দেখা দিয়েছে।

এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়, ভারতের যেসব রাজ্যে উপজাতিরা রয়েছে সেসব রাজ্যেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ভারতের উপজাতিরা এক জাতিগোষ্ঠীর নয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যেমন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর প্রাধান্য তেমনি অন্যান্য অঞ্চলে নর্ডিক ও অষ্ট্রালয়েড জাতিগোষ্ঠীর উপজাতিরা রয়েছে। ধর্মের দিক থেকেও হিন্দু-বৌদ্ধ-ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীরা রয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক সমস্যায় কোন পার্থক্য নেই। জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অংশীদার হবার আকাংক্ষা খুবই স্বাভাবিক। শিক্ষিত উপজাতি

বুদ্ধিজীবীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করেছেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতার অংশীদার হতে না পারলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেও উপজাতিদের জরুরী সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। অর্থের অভাবে এমনটা হয়েছে তা নয়। প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা এবং সদিচ্ছার অভাবেই এরূপ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে হতাশা এবং বিক্ষোভ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু উপজাতিরাই উপজাতি সমস্যার সমাধান করতে পারবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। রাজ্যের সমস্ত জনগণের মৌলিক সমস্যাগুলো যাচাই করে, সমস্যার কারণগুলো অনুসন্ধান করে সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে এমন কর্মসূচীর ভিত্তিতে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। গণআন্দোলন থেকেই জন্ম নেয় জনগণের সরকার। শুধুমাত্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ক্ষমতার অংশীদার হওয়া যায় না।

আফ্রিকা এক সময় অন্ধকার মহাদেশ বলে পরিচিত হয়েছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অসহায় নিপীড়িত মানুষগুলোকে নতুন পথ দেখালেন মহাত্মা গান্ধী। গণআন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি করে জাগিয়ে দিলেন ঘুমন্ত শক্তিকে। সেই আন্দোলনের পথেই নেলসন মেন্ডেলার মতো নির্ভিক দেশপ্রেমিক নেতাদের আবির্ভাব ঘটলো আফ্রিকা মহাদেশে, যারা অন্ধকার আফ্রিকার চেহারাটাই পাল্টে দিচ্ছেন গণআন্দোলন এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে।

ত্রিপুরায় উপজাতি নেতারা বামপন্থীদের উপর আস্থা রাখতে পারছেন না। কারণ শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই দেখা যায় একই শ্রেণীর মানুষ বামপন্থীদের মিছিলেও আসছে আবার উপজাতি নেতাদের ডাকা মিছিলেও আসছে।

গণআন্দোলনের দুই স্রোত ধারাকে একই মিছিলে যুক্ত করার পথ অনুসন্ধান করা এখন জরুরী হয়ে উঠেছে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং মানবিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন নেতৃত্বই সে পথ দেখতে পারে। ত্রিপুরায় এখনো সেরকম নেতার আবির্ভাব ঘটেনি।

ত্রিপুরায় জমিদার শ্রেণী নেই, শিল্পপতি নেই, বৃহৎ কোন বাণিজিক সংস্থা নেই, কাজেই শ্রেণী সংগ্রামে বাস্তব ভিত্তিও এ রাজ্যে এখনো সৃষ্টি হয়নি। রাজ্যের নব্বই শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদের অর্দ্ধেক অংশ ক্ষেতমজুর এবং দিনমজুর। চরম দারিদ্র্যেই তাদের প্রধান সমস্যা। রাজ্যের দশ শতাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিশাল শিক্ষিত বেকার বাহিনী।

বর্তমানে দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যাই রাজ্যের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে আধুনিক অর্থনীতর বিকাশ ঘটাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকেই এই দায়িত্ব বহন করতে হবে। জননেতা নৃপেন চক্রবর্তী এই মৌলিক সমস্যাটি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার উপযুক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরী করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।

রাজন্য যুগের গণআন্দোলন

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৃথিবীর কোন দেশেই প্রজাদের সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা বা কোন দাবী পেশ করার অধিকার ছিল না। রাজার কথা এবং ইচ্ছাই আইন, রাজা নিজেই বিচারক। রাজার ইচ্ছায় যে কোন ব্যক্তির প্রাণদন্ড হতো। রাজার সমালোচনা দেশদ্রোহীতা বলে গণ্য হতো।

কাজেই রাজন্য যুগে গণআন্দোলনের কোন সুযোগ ছিল না। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজাগণ বিদ্রোহ করতো। রাজা শক্তিশালী হলে কঠোর হস্তে নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহ দমন করতেন। দুর্বল রাজা বিদ্রোহী প্রজার হাতে নিহত হয়েছেন, এমন ঘটনা ত্রিপুরাতে ঘটেছে। রাজমালায় বর্ণিত অত্যাচারী রাজা ত্রিপুর বিদ্রোহী প্রজাদের হাতেই নিহত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। অবশ্য রাজমালায় শিবের হাতে নিহত হবার কথা বলা হয়েছে।

ইউরোপের ইতিহাসে বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে বহু রাজার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলন্ডের বিদ্রোহী প্রজারা অত্যাচারী রাজা চার্লসকে বন্দী করে শিরশ্ছেদ করে হত্যা করে। বেশ কয়েকজন অত্যাচারী রাজা বিদ্রোহী ইংরেজ প্রজাদের হাতে নিহত হয়েছেন। শেষবারের নতুনত্ব হল প্রজারা একত্রে মিলিত হয়ে বিচারসভায় রাজার বিচার করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল। এরপর থেকে সে দেশে পার্লামেন্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও বহুকাল যাবত ইংলন্ডে কৃষক-শ্রমিক ও নারীর ভোটাধিকার ছিল না তবু রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার শাসন থেকে প্রজারা মুক্ত হয়েছিল।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বহু রাজাকে প্রাণ দিতে হয়েছে বিদ্রোহী প্রজাদের হাতে। ফরাসী বিপ্লব সারা বিশ্বের সমস্ত রাজা ও পুরোহিতের মনে ভয়ানক আতংক সৃষ্টি করেছিল। রাজা ও পুরোহিতরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচন্ড দমননীতি চালিয়ে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করার ফলে বহু দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সবত্রই প্রজাদের জয় হয়েছে। স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ইউরোপের বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।

ইউরোপের ইতিহাস থেকে একটা বড় শিক্ষা পাওয়া গেছে, তা হল কয়েকজন ব্যক্তির অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে প্রজা বিদ্রোহ সৃষ্টি করা যায় না। ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিদ্রোহকে অনায়াসে দমন করা যায়। কিন্তু একটা দেশের অধিকাংশ প্রজা যখন বিদ্রোহ করে তখন কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের পক্ষে, তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন ঐক্যবদ্ধ প্রজা বিদ্রোহকে সহজে দমন করা সম্ভব হয় না।

ইতিহাসের এই অভিজ্ঞতা জানা ছিল বলেই বৃটিশ সরকার ভারতের শাসন ক্ষমতা ভারতীয় প্রজাদের হাতে যথাসময়ে তুলে দিয়ে সসম্মানে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিল এবং ভারতের দেশীয় রাজারাও ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইতিহাসের নির্দেশকেই মেনে নিয়েছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম বিদ্রোহী প্রজাদের নির্মমভাবে দমন করে স্বেচ্ছাচারী সামন্ত শাসন চালিয়ে যাবার শেষ চেষ্টা করে প্রাণ বাঁচাবার জন্য শেষ পর্যন্ত রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

গণচেতনা থেকেই গণআন্দোলনের জন্ম হয়। এই চেতনা সৃষ্টি হয় শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক উন্নতির আকাংখা এবং রাজনৈতিক অধিকার বোধ থেকে। এর প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে জাতীয়তাবোধের মধ্যে। ✓

ভারতবর্ষে এই জাতীয়তা বোধ দেখা দিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে। জমিদারতন্ত্র ও বিদেশী শাসকদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বহুকৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু সেগুলো গণআন্দোলনের রূপ নেয়নি। বিদ্রোহগুলো দমন করা হয়েছে নির্মমভাবে। প্রতিবাদ হয়েছে সামান্যই।

ক্রমশঃ দর্শন-অর্থনীতি- বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে জেগে উঠেছে মানবতাবোধ, অধিকার বোধ এবং অন্যায় অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করার দায়িত্ববোধ। এই চেতনা থেকেই দেখা দিল সংবাদপত্র-সভা-সমিতি ও প্রতিবাদ মুখর মিছিল। দেশবাসী জানতে পারল জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী, নীলকরদের নির্মম নির্যাতনের ইতিহাস এবং ভারতীয় কৃষকদের চরম দুর্দশার কথা।

সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হল, সম্পাদকদের জেল হল, ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের তীব্র ঘৃণা। ত্রিপুরায় বিদেশী শাসক ছিল না, শিক্ষারও বিস্তার ঘটেনি, আর্থিক উন্নতির কামনাও জেগে উঠেনি তাই রাজন্য শাসনে গণচেতনায় বিকাশ যথাসময়ে ঘটেনি।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ত্রিপুরায় অতি ক্ষুদ্র পরিসরে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে থাকে। প্রধানত বৃটিশ বিরোধী মানসিকতার বিকাশ ঘটেছে এই পর্বে।

এর পূর্ববর্তী ইতিহাস থেকে জানা যায় ত্রিপুরায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহ ঘটেছে বহুবার। একেকটি সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকে দমন করতে অন্য একটি সম্প্রদায়কে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে অত্যন্ত নির্মমভাবে। নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন এবং গ্রামের পর গ্রাম ভস্মীভূত করা হয়েছে অবাধে। প্রতিরোধ এবং সংঘর্ষও হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে।

প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন গোষ্ঠীর মানুষেরা রাজ্যে প্রবেশ করেছে। জুমের এলাকা নিয়েও সংঘাত হয়েছে। শিকারজীবী গোষ্ঠীর মানুষেরা জুমের ফসল ঘরে তোলার খবর নিয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে লুণ্ঠন করে নিত জুমের ফসল। সঙ্গে নিয়ে যেত কর্মক্ষম নারী ও পুরুষদের। ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করে দিত গোপন দাস ব্যবসায়ীদের কাছে।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রজাদের নিরাপত্তা দান করা অনেক সময় রাজাদের পক্ষে সম্ভব হত না। এমনকি রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ধরে রাখাও কঠিন হত। সমশের গাজীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ তারই প্রমাণ বহন করছে। রাজা নিজেই রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন পুরানো আগরতলায়।

অন্যদিকে কুকী বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হওয়ায় বৃটিশ সেনা বাহিনী বিদ্রোহ দমনে এগিয়ে

এসেছিল। রাজ পরিবারের আত্মকলহ থেকেও অনেক সময় প্রজা বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী কংগ্রেস নেতা তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত --- ত্রিপুরার স্বাধীনতা সংগ্রামের স্মৃতি---গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন ১৯৩০ সালের আগে ত্রিপরা রাজ্যে বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করার দাবী ছিল দন্ডনীয় অপরাধ। উমাকান্ত একামেডীতে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের শেখানো হতো — মহারাজা হলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি সকল প্রজার নমস্য ব্যক্তি। আরো শেখানো হতো মহারাণী ভিক্টোরিয়া হলেন অতি দয়ালু সম্রাজ্ঞী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুগত্য জানানো সকল প্রজার অবশ্য কর্তব্য।

সারা রাজ্যে তখন একটি মাত্র হাইস্কুল। কোন মহকুমায় তখন হাইস্কুল ছিল না। ছাত্র সংখ্যাও খুব বেশী নয়। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল, বিক্রমপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও সিলেট থেকে যে সব শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাকুরী লাভের আশায় ত্রিপুরায় আসতেন তারা কোন সময়েই কোন রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলন করার কথা ভাবতে পারতেন না।

১৯১২ সালে অনুশীলন সমিতির কিছু নেতা ত্রিপরার জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ১৯০২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শ অনুসরণ করে ব্যারিস্টার প্রথমনাথ মিত্রের নেতৃত্বে কলকাতায় অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সমিতির সদস্য হন। প্রকাশ্যে লাঠিখেলা, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সমাজসেবা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরী করার কাজ শুরু হয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা বাংলায় অনুশীলন সমিতির দ্রুত বিস্তার লাভ ঘটে। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে সারা পূর্ব বাংলায় অনুশীলন সমিতির ৫০০ শাখা গড়ে উঠে। কুমিল্লা ছিল শক্তিশালী একটি কেন্দ্র। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতেও ছিল শক্তিশালী কেন্দ্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেমে যাবার পর অনুশীলন সমিতির উপর বৃটিশ সরকারেব আক্রমণ শুরু হয়। এই সময় কুমিল্লা ও ব্রাহ্মবাড়িয়ার বিপ্লবী নেতারা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। ক্রমে ক্রমে উদয়পুর ও বিলোনীয়ায দুটি বৃহৎ খামার বাঁড়ী তৈরী করে বিপ্লবীদের প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তোলা হয়। দিনের বেলায় নিরীহ কৃষকদের মত খামার বাড়ীতে কাজ করা এবং রাতের অন্ধকারে লাঠি, পিস্তল ও বন্দুক চালনা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়। এইসব বিপ্লবীরা কোন সময়েই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা বা রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য আন্দোলনের কথা বলেননি। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বৃটিশ রাজকর্মচারীদের হত্যা করে প্রশাসন অচল করে দেওয়া এবং এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা।

শুধুমাত্র গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক দুঃসাহসী বিপ্লবীদের চেষ্টায় বৃটিশ সরকারকে হঠান যায় না। এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে বহু সময় লেগেছে। বিপ্লবীদের বহু মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। অনেকেই সুদীর্ঘকাল কারাগারে বন্দী জীবনযাপন করেছেন। আন্দামান জেলে বন্দী জীবন কাটিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তি পেয়েছেন অনেকে। কারাগারে থেকে বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া নানা গ্রন্থ পাঠ করে এবং বিভিন্ন পাঠচক্রে যোগ দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে যারা ফিরে এসেছেন, তারা প্রধানত দুটি মতাদর্শে বিভক্ত হয়েছেন। একটি হল - অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পথ। অন্যটি হল সশস্ত্র বিপ্লবের

মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের মার্কসবাদী পথ। অনেকে আবার ভিন্ন পথও নিয়েছেন।

ত্রিপুরায় গান্ধীবাদী ও মার্কসবাদী এ দুটি ধারায় বিপ্লবীরা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শচীন্দ্র লাল সিংহ, উমেশ লাল সিংহ, তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত, সুখময় সেন, হরিগঙ্গা বসাক, ক্ষিরোদ সেন, গান্ধীবাদী পথে গেলেন।

বীরেন দত্ত, অনন্ত দে, নলিনী সেনগুপ্ত, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর মার্কসবাদী চিন্তা ধারায় আকৃষ্ট হন। এইভাবে মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক বছর আগে ১৯৩৮সালে ।

বৃটিশ পার্লামেন্ট বিশ্বযুদ্ধের আগেই ভারতীয় জনগণের সাহায্য লাভের আশায় ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ করে। এই আইনে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশীয় রাজ্য সহ ভারতের শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই আইনের বলেই ত্রিপুরায় প্রথম গণআন্দোলরে সূত্রপাত হয়।

এর আগে বিপ্লবী নেতাদের গোপন উদ্যোগের ফলে সমাজসেবামূলক বেশ কিছু সংগঠনের জন্ম হয়। লাঠি খেলা, শরীরচর্চা, সমাজসেবার বিভিন্ন অরাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ করা এসব সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্য এরূপ পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

সমাজসেবামূলক প্রথম সংগঠন হল 'ছাত্রসংঘ' নামে একটি ক্লাব। কিছুকালের মধ্যেই তা ভেঙ্গে তৈরী হয় নতুন সংগঠন ভ্রাতৃসংঘ। প্রথমটির সংগঠক ছিল অনুশীলন সমিতি; দ্বিতীয়টির সংগঠক ছিল যুগান্তর পার্টি। এছাড়াও অনেক সংঘ গড়ে উঠেছিল এই সময়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রিপুরা রাজ্যের সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সভা সমিতি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ১৯৩৮ সালে গণআন্দোলরে সূত্রপাত হলেও তা এক বছরের মধ্যেই স্থগিত হয়ে যায়।

প্রকৃত গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ঝড় সৃষ্টি হয় তার ঢেউ এসে পড়ে ত্রিপুরায়ও। এই আন্দোলনের ঝড় সামলাতে না পেরে বৃটিশ সরকার দুই বছরের মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। শেষবারের আন্দোলনে সারা ভারতের ছাত্র-যুবক, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, পুলিশ, মিলিটারী ও সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী সকলেই মিশে গিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের মহামিছিলে।

ত্রিপুরা রাজ্যেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, জনশিক্ষা আন্দোলন, সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, উদ্বাস্তু ও জমিয়া পুনর্বাসনের আন্দোলন এমন এক জোয়ার সৃষ্টি করেছিল যে রাজতন্ত্রের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের দেয়াল লিখন যথাসময়ে উপলব্ধি করে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরাকে স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু ত্রিপুরাবাসীর দুর্ভাগ্য হল এরূপ সমাজ সচেতন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মহারাজা বীরবিক্রম স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন মাস আগে অকালে প্রয়াত হন। ফলে আধুনিক ইউরোপের ধারায় ত্রিপুরা রাজ্যকে উন্নত করে তোলার যে স্বপ্ন মহারাজা বীর বিক্রম পোষণ করতেন তা থেকে

ত্রিপুরাবাসী বঞ্চিত হল। একটা স্বপ্ন ও পরিকল্পনা ছাড়া একটা জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। অনভিজ্ঞ এবং দ্বিধাগ্রস্ত নেতৃত্বের ফলে ত্রিপুরায় দীর্ঘকাল উন্নয়নের ধারা ধীরগতি সম্পন্ন ছিল।

রাজন্য যুগের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা বিকশিত হয়েছে বিশেষ একটি ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহের ক্ষীণ প্রভাব অবশ্যই এই ইতিহাস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। প্রতিটি বিদ্রোহের মধ্যেই কিছু না কিছু গণচেতনার ক্ষীণ ধারা সৃষ্টি হয়। ১৯৪২ সালে সারা ভারতে যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জোয়ার বইছে ত্রিপরায় তখন সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক নেতৃত্বের দ্বারা- রিয়াং বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। গণচেতনা বিকাশে তার প্রভাব বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

ত্রিপুরায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহের ধারা

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে যেসব প্রজা বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছে রাজমালায় তার কিছু কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার পূর্ববর্তী প্রজা বিদ্রোহের ইতিহাস জানার কোন উপায় নেই।

পৃথিবীর সব দেশেই উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে জাতিসত্তার বিকাশ ঘটেছে এবং জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতে সমতল অঞ্চলেও তেমনটা ঘটেনি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে জাতিসত্তার বিকাশও সেভাবে হয়নি।

ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কখন, কিভাবে রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে তা এখনো অজ্ঞাত। তবে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত আবিষ্কৃত উপাদান বিশ্লেষণ করে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন যে, ত্রিপুরার রাজবংশ ত্রিপুরী উপজাতিদের মধ্য থেকেই অতীতে কোন এক সময় উদ্ভূত হয়েছে। রাজমালায় বর্ণিত যযাতির বংশধর রূপে ত্রিপুরার রাজবংশকে মেনে নেবার কোন যুক্তি নেই।

মঙ্গোলিয়ানরা দুর্বল জাতি নয়। পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর চারটি মহাজাতির মধ্যে মঙ্গোলিয়ানরা আর্যদের মতোই শক্তিশালী ছিল। এশিয়া-ইউরোপ এবং আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মঙ্গোলিয়ান মহাজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা ছড়িয়ে পড়েছিল। চেঙ্গিস খাঁ এশিয়ার অধিকাংশ এবং ইউরোপের অধিকাংশ দখল করেছিলেন। চেঙ্গিস খাঁর বাহিনী সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না, কিন্তু শৃঙ্খলা এবং সাহসে ছিল অদম্য। বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস করে দিয়ে, বহু নগর নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সারা বিশ্বে সৃষ্টি করেছিল ভয়ানক আতংক। সমৃদ্ধ সমরখন্দ নগরীর দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে বেঁচে ছিল মাত্র ৫০ হাজার নাগরিক। রাশিয়ার কৃষ্ণ সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল চেঙ্গিস খাঁর সাম্রাজ্য।

এর আগে এরকম ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি করেছিল তুর্কী, তাতার, হুন, শক প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর আক্রমণ। আফগানরা গজনি নগরী দখল করে সাতদিন ধরে লুণ্ঠন চালিয়েছিল। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল নগরীর সব পুরুষদের। সে কালে অর্ধবর্বর জাতিগুলো নগর সভ্যতাকে

একেবারেই পছন্দ করত না। আর্যরাও ভারতে এসে সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলো ধ্বংস করেছিল। চেঙ্গিস খাঁ চীনের সবগুলো নগর ধ্বংস করাব পরিকল্পনা করেছিল।

চেঙ্গিস খাঁ শেষ বয়সে যাযাবরদের সঙ্গে নগর সভ্যতার মিলন ঘটাতে চেয়েছিলেন।

চেঙ্গিস খাঁ নিজে এবং তার বাহিনীর সবাই ছিলেন নিরক্ষর। লিখিত ভাষায় লিপিও তাদের ছিল না। মৌখিক দূত মারফত সংবাদ আদান প্রদান করে এই বিশাল সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল শাসন করেছেন। এটাও এক আশ্চর্য দক্ষতা এবং প্রতিভার পরিচয়।

চেঙ্গিস খাঁর অনুগামীরা চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু মধ্য এশিযায বেশীর ভাগই ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। রাশিয়ায় যারা ছিল তারা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের পিতা ছিলেন তৈমুরের বংশধব এবং মাতা ছিলেন চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। ক্ষুদ্র একটি বাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন। সঙ্গে ছিল উন্নত ধরনের কামান। বিশাল আফগান বাহিনী বাবরেব কামানের গোলায় বিধ্বস্ত হল। কাবুল, গজনি, কান্দাহার, দিল্লী পর্যন্ত, সেকালের শ্রেষ্ঠ নগরীগুলো বাবরের অধীনে এল। মাত্র চার বছর পরই বাবরের মৃত্যু হল। ১৮১ বছর টিকে ছিল মোগল সাম্রাজ্য। এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় সঙ্গীত ভাস্কর্য এবং হস্তশিল্প বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করেছিল।

-ভাঁরতে আর্যরা অন্য সব জাতিকেই অনার্য বলে পরিচয় দিত অর্থাৎ যারা আর্য নয়, তারাই অনার্য। বহু যুদ্ধ, সংঘাত, সংঘর্ষ ও সমন্বয়েব মধ্য দিয়ে বহু ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেরা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু উপজাতি জনগোষ্ঠীব মানুষেবা পাহাড় পর্বতে পৃথক জাতিসত্তা নিয়ে টিকে রয়েছে। তবে উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরাও এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীব মধ্যে মিশ্রণ ঘটছে এবং ঘটবে। এটা সভ্যতাব বিকাশে অনিবার্য নিয়ম। জোব করে এ নিয়মকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না আবার জোর করে এ নিয়ম কার্যকর করাও যায় না। শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ নতুন সমাজ কাঠামো সৃষ্টি করে, যার মধ্য দিয়ে জাতি সত্তা পরিনতি লাভ করে।

ত্রিপুরায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রাজভক্ত নিরক্ষর প্রজাদের মধ্যেও একটা মর্যাদা বোধ লুকিয়ে থাকে। সেখানে আঘাত করলেই অন্ধ রাজভক্তি অন্ধ বিদ্রোহের রূপ নেয়।

ত্রিপুরায় সরকারী নথিপত্রে প্রজা বিদ্রোহের কোন বিবরণ খুঁজে পাওযা যায় না। বৃটিশ সরকারের পলিটিক্যাল এজেন্টদের রিপোর্টে কিছু কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই সংক্ষিপ্তভাবে ত্রিপুরার প্রজা বিদ্রোহের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা যেতে পারে।

সমশের গাজীর বিদ্রোহ

১৭৪৫ সালে সমশের গাজী নামে এক কৃষক নেতা রাজধানী রাঙ্গামাটির দক্ষিণে ফেনী নদীর উত্তর তীরবর্তী জমিদার নাশির মহম্মদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জমিদার ও তার পুত্রদের হত্যা করে নিজেকে দক্ষিণ শিকের (অঞ্চলের) জমিদার বলে ঘোষণা করেন এবং জমিদার কন্যাকে বিয়ে করেন।

তখন ত্রিপুরার রাজা ছিলেন ইন্দ্র মাণিক্য। সমশের গাজীকে দমন করার জন্য উজীরের নেতৃত্বে একদল সেনা পাঠানো হয়। কিন্তু রাজার সেনারা যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং উজীর বন্দী হন। সমশের গাজীকে দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে উজীর মুক্তি পান।

সমশের গাজী নবাবের প্রতিনিধি হাজী হোসেনেব সহায়তায় নবাবকে ত্রিপুরার মহারাজার চেয়ে বেশী রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমগ্র চাকলা রোশনাবাদের জমিদারী লাভ করেন।

এই সময় ঢাকায় যেমন চলছিল অরাজকতা এবং ঘুষ দুর্নীতির রাজত্ব, তেমনি ত্রিপুরায় চলছিল সিংহাসনের দাবীতেচার ভাইয়ের মধ্যে তীব্র কলহ ও ষড়যন্ত্র। কুমার ইন্দ্র, কুমার কৃষ্ণমণি, এক পক্ষে এবং কুমার জয় ও বিজয় অপর পক্ষে। নবাবের দববারে ঘুষ দিয়ে কখনো ইন্দ্র রাজা হন আবার কয়েক মাস পরেই জয় রাজা হন। ইন্দ্র মাণিক্য প্রতিশ্রুতিমত হাতি দিতে না পারায় বন্দী হন। মুর্শিদাবাদের কারাগারে অকালে মারা যান। জয় মাণিক্য রাজা হয়ে এক বছরের মধ্যেই উদয়পুরে মারা যান।

এবার দ্বন্দ্ব শুরু হল কৃষ্ণমণি ও বিজয়েব মধ্যে। মোগলবাহিনী বিজয়কে সিংহাসনে বসায়। কিন্তু তাদের দাবী মত হাতি দিতে না পারায় বিজয় মাণিক্য এক বছরের মধ্যেই বন্দী হন এবং ঢাকার কারাগারে অকাল মৃত্যু বরণ করেন। বিজয় মাণিক্যের ভয়ে কৃষ্ণ মণি গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুতে রাজ্যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে সমশেব গাজী বিনা খরচে বেশী সংখ্যায় হাতি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজধানী দখল করেন।

১৭৪৫ থেকে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে, এই তিন বছবে তিনজন রাজা রাজত্ব করেছেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সমশের গাজী রাজ্যের সিংহাসন দখল করেন। কিন্তু উপজাতি প্রজাগণ সমশের গাজীকে কর দিতে অস্বীকার করায় বুদ্ধিমান গাজী ধর্ম মাণিক্যেব এক পৌত্রকে লক্ষ্মণ মাণিক্য নাম দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

যুবরাজ কৃষ্ণমণি আত্মরক্ষার জন্য হেড়ম্ব বাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কুকী প্রজারা তাকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনে। উদয়পুরের কাছে অবস্থানকালে জানতে পারেন উজীর রামধন সমশের গাজীর পক্ষ অবলম্বন কবায় উজীরকে গোপনে হত্যা কবা হয়েছে। ক্ষিপ্ত সমশের গাজী ভয়ংকর প্রতিশোধ নিতে পারে এই আশংকায় যুবরাজ রাজধানীতে প্রবেশ করতে সাহস পাননি। ত্রিপুর সেনাপতি রণমর্দনের নেতৃত্বে এক বাহিনী উদয়পুরে পাঠানো হল এবং রাজভক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিকটবর্তী রিয়াং পাড়ায় আশ্রয় নিলেন।

সেনাপতি বণমর্দন সমশের গাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিবর্তে রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সমশের গাজীর প্রীতিভাজন হয়ে উদয়পুরে আশ্রয় নিলেন। সমশের গাজী রিয়াং পাড়া আক্রমণ করলেন। রাজার বিশ্বস্ত সেনাপতি বাটিরায় সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হলেন। কিছুদিনেব মধ্যেই নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে সেনাপতি জয় দেবের নেতৃত্বে রিয়াংপাড়াতে আক্রমণ করে জয়ী হলেন। হেড়ম্ব রাজার কাছে কিছু সেনা সাহায্যের আবেদন জানিয়ে দূত পাঠালেন। ইতিমধ্যে হেড়ম্ব রাজার মৃত্যু হওয়ায় সাহায্য পাওয়া গেল না।

পুরান আগরতলায় নতুন বসতি স্থাপন করে যুবরাজ কৃষ্ণমণি রাজ্য লাভের জন্য

নবাবের কাছে দরবার শুরু করেন।

এদিকে সমশের গাজী কয়েক লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব এবং বিনা খরচে হাতি সরবরাহ করে নবাবকে সন্তোষ্ট করতে চেষ্টা করেন। তিনি নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা দেননি। জমিদার বলেই পরিচয় দিতেন। দরিদ্র প্রজাদের মধ্যে ভূমি বন্টন করেন। দ্রব্য মূল্য স্থির রাখার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্দিষ্ট বিক্রয় মূল্যের তালিকা প্রচার করেন। অতিরিক্ত মূল্য আদায় করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। দরিদ্র ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমি দান করেন। পানীয় জলের জন্য বহু পুকুর খনন করান।

বিভিন্ন জনহিতকর কাজের দ্বারা প্রজাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। কিন্তু নবাবের রাজস্ব সময়মত দেবার জন্য প্রজাপীড়নের পরিবর্তে রাজ্যের বাইরে ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের বাড়ীতে ডাকাতি করা শুরু করেন।

নবাবের দরবারে বহু ধনী ও জমিদার ডাকাতির প্রতিকারের জন্য আবেদন জানান। এই সুযোগে যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাবের কাছে রাজ্য ও জমিদারী উদ্ধারের আবেদন জানান। জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে নবাব সেনা পাঠিয়ে সমশের গাজীকে বন্দী করেন। ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিচারে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। নবাবের নির্দেশে কামানের মুখে সমশের গাজীকে বেঁধে গোলা ছুঁড়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।

যুবরাজ কৃষ্ণমণি কৃষ্ণ মাণিক্য নাম ধারণ করে ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন। সমশের গাজীর শাসনকাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে নয় বছর কারো মতে ১২ বছর রাজ্যের শাসন ক্ষমতা সমশের গাজীর হাতে ছিল।

সমশের গাজীর পরিচয় সম্পর্কেও মতভেদ আছে। মনোহর শেখ রচিত "গাজী নামা" অনুসারে সমশের গাজীর পিতা ছিলেন একজন ফকির এবং মাতা ছিলেন একজন কৃষক রমনী। ছোট বেলায় জমিদার নাশির মহম্মদের গৃহে লালিত পালিত হন। বড় হয়ে জমিদারের তহশীলদার নিযুক্ত হন। জমিদার কন্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিতাড়িত হন। ক্ষুব্ধ সমশের গাজী আত্মগোপন করে বিভিন্ন এলাকায় কৃষকদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে উত্তেজিত করে তোলেন। একদিন হঠাৎ জমিদার গৃহে আক্রমণ চালিয়ে জমিদার ও তার পুত্রদের হত্যা করে জমিদারী দখল করেন এবং জমিদার কন্যাকে বিয়ে করেন।

সমশের গাজীর বিদ্রোহকে অনেকে কৃষক বিদ্রোহ বলে গণ্য করেন। কারণ কৃষকদের সাহায্যে ক্ষমতা দখল করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জনাই সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।
আবার অনেকে সমশের গাজীকে একজন দক্ষ ডাকাত বলেই গণ্য করেছেন। কারণ অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি নিয়মিত ডাকাতি করেছেন। কৃষকদের একটা অংশ এই ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুনির্দিষ্ট নথিপত্র না থাকায় সমশের গাজীর বিদ্রোহের সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না এটা নিশ্চিত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় থেকে কর্মচারী নিয়োগ করেছেন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণদের নিষ্কর ভূমিদান করেছেন তার প্রমাণ রয়েছে।

রাজন্য যুগের পরবর্তী সময়ে উপজাতি প্রজাদের বিদ্রোহের সঙ্গে সমশের গাজীর বিদ্রোহের কোন মিল নেই। সমশের গাজী রাজ পরিবারের তীব্র কলহের সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখল

করেছেন এবং প্রজা কল্যাণেই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

কিন্তু উপজাতি প্রজাদের বিদ্রোহে ক্ষমতা দখলের কোন লক্ষ্য ছিল না। উপজাতি প্রজারা নিঃসন্দেহে রাজভক্তির পরিচয় দিয়েছে। শুধুমাত্র রাজ কর্মচারীদের অন্যায় অবিচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিকার না পেয়ে বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু বিদ্রোহের কারন জানার চেষ্টা না করেই মহারাজারা যেভাবে নিষ্ঠুর দমননীতি চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছেন তা শুধু অমানবিকই নয়, বরং সে যুগের চরম স্বেচ্ছাচারী শাসনেরই জ্বলন্ত নিদর্শন। তবুও অসহায় প্রজারা শেষ পর্যন্ত মহারাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

কুকী বিদ্রোহ

ত্রিপুরায় কুকী আক্রমণের ঘটনা প্রাচীনকাল থেকেই ঘটেছে। কুকীরা ছিল শিকারজীবী। গভীর জঙ্গলে এবং ছোট-বড় পাহাড়ে বিভিন্ন কৌশলে পশু শিকারের দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা জুম চাষে অভ্যস্ত ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে জুম চাষীরা জুমের ফসল ঘরে তোলার পর হঠাৎ করে কুকী আক্রমণ শুরু হতো। সমস্ত ফসল লুণ্ঠন করে নিত, যুবক-যুবতীদের বন্দী করে নিয়ে যেত, দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করে প্রচুর অর্থ পেত। কোথাও বাধা পেলে নির্বিচারে গণহত্যা চালাতো এবং সমস্ত ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিত।

কুকীদের দমন করার জন্য বহুবার অভিযান চালিয়ে ত্রিপুরার মহারাজারা ব্যর্থ হয়েছেন। কিছু কিছু অঞ্চলে সাফল্য পাওয়া গেছে। কুকীদের একটা অংশ ত্রিপুরার মহারাজার আনুগত্য স্বীকার করেছে। ধণ্য মাণিক্যের শাসনকালে লুসাই হিলের একাংশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। ঐ অঞ্চলের কুকীরা মহারাজার আনুগত্য স্বীকার করে। রিয়াং সেনাপতি রায়কচাগ এবং রায়কছাগের অভিযানে এই সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল।

কিন্তু কোন কালেই কুকী আক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি। বৃটিশ অধিকৃত সমতল অঞ্চলে কুকী আক্রমণ বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। কুকীরা বীরত্ব প্রকাশের জন্য নিরীহ মানুষের মাথা কেটে নিয়ে যেত। কোন সর্দার মারা গেলে মৃতদেহের সঙ্গে মানুষের মাথা উপহার দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে মাথা কেটে আনা হত মৃত সর্দারকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যরূপে দেওয়ার জন্য।

বৃটিশ শাসকরা তাদের এলাকায় কুকী আক্রমণের জন্য ত্রিপুরার মহারাজাদের কাছে কুকীদের দমনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবী জানালে অনেক সময় আক্রমণকারী কুকীরা ত্রিপুরার মহারাজার প্রজা নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হত।

ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পিতা কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে কুকীরা ছয়বার সমতলের বাঙ্গালী গ্রামগুলিতে লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালিয়েছিল। ১৮৩৬, ১৮৪৩, ১৮৪৪,১৮৪৬, ১৮৪৭, ১৮৪৯ এই ছয় বছরে ছয়টি ভয়াবহ আক্রমণ সংঘটিত হওয়ায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ একদল ইংরেজ সেনা পাঠিয়ে কুকীদের দমন করতে উদ্যোগী হয়। ত্রিপুরার মহারাজা সৈন্য দিয়ে এই অভিযানে

সাহায্য করেন। কুকীরা রাজস্ব বন্ধ করে দিয়ে স্বাধীন কুকী রাজ্য বলে ঘোষণা দেয়। ইংরেজ সেনারা বিদ্রোহী কুকী নেতা লাল চোকলাকে বন্দী করতে সমর্থ হয়। বিচারের পর দ্বীপান্তরিত করা হয় লাল চোকলাকে। এই ঘটনার পর লুসাই পাহাড়ের বৃহৎ অংশ ইংরেজ অধিকারে চলে যায় ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজদের অধিকৃত এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে ১৮৫০ সালের বিভিন্ন সময়ে কুকীরা চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বিভিন্ন গ্রামে নির্বিচারে লুণ্ঠন চালায়। বহু মানুষ হত্যা করে এবং অনেক মানুষকে বন্দী করে নিয়ে যায়। অসংখ্য ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেয়। এসব ঘটনায় কুকীদের দমনে মহারাজার ব্যর্থতার জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করে। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বের শেষকালে ১৮৬০ সালের জানুয়ারী মাসে কুকীরা ছাগলনাইয়া অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালায়। ১৮৫জনকে হত্যা করে, শতাধিক যুবতী নারীকে ধরে নিয়ে যায়, বহু ঘরবাড়ী পুড়িয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ঠিক এক বছর পরেই ১৮৬১ সালে কুকীরা প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে ব্যাপক লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালায়। এবারও ১৫০জনকে হত্যা করে, ২০০ যুবতী নারীকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ফিরে যাবার পথে কয়েকটি চাকমাপাড়া পুড়িয়ে দিয়ে যায়। গ্রেহাম সাহেবের বিবরণে এসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ছাগলনাইয়া অঞ্চলে থানা স্থাপন করা হয় এবং উদয়পুর থানাকে জোরদার করা হয়। এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় রতন পুইয়া। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পাঠায়।

১৮৭১ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে আবার কুকীদের আক্রমণ শুরু হয়। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং চাকলা রোশনাবাদ জমিদারীর কিছু অঞ্চলে ব্যাপক লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ডের ঘটনায় জনগণের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার কুকীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমগ্র লুসাই পাহাড়ের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এরপর বড় আকারের কুকী আক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। এবছর থেকেই ত্রিপুরায় বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালের অনুসন্ধানে জানা গেছে, এসব আক্রমণের পেছনে রাজ পরিবারের সিংহাসনের দাবীদার রাজপুত্র বা রাজভ্রাতাদের সরাসরি মদত ছিল। রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে সিংহাসন দখল করাই ছিল মূল লক্ষ্য। কুকী আক্রমণে মদত দাতাদের মধ্যে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র ভগবান ঠাকুর এবং রামকানু ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। খন্ডল পরগনায় আক্রমণে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজার বিদ্রোহী ভ্রাতা নীলকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ চন্দ্র ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হয়।

তিপ্রা বিদ্রোহ

ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা শান্ত প্রকৃতির এবং অত্যন্ত রাজভক্ত বলেই পরিচিত। রাজার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহে ত্রিপুরীরা যোগ দেয়নি।

১৮৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেন। পিতা

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী এবং অমিতব্যয়ী। পুত্রের জন্য তিনি ১১ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা রেখে যান।

পিতার ঋণ পরিশোধের জরুরী ব্যবস্থার জন্য নিজের বিশ্বস্ত অনুচর বলরাম হাজারীকে রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। বলরাম হাজারী ছিলেন ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পিতামহী মহারাণী চন্দ্রতারার এক দাসীর পুত্র। বলরামের এক ভাই ছিল শ্রীদাম হাজারী। দুই ভাই ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির।

রাজ্যের দেওয়ান পদে সাধারণত রাজ পরিবারের লোকেরা নিযুক্ত হয়। হঠাৎ এই পরিবর্তন রাজ পরিবারের অনেককে ক্ষিপ্ত করে তোলে।

বলরাম ও শ্রীদাম অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রজাদের উপর নতুন নতুন করের চাপ সৃষ্টি করে মহারাজার ঋণ পরিশোধের জন্য উদ্যোগী হয়। দুই ভাইয়ের দুর্ব্যবহারে প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। এই সুযোগে রাজ পরিবারের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রজাদেরকে নানাভাবে উত্তেজিত করে তোলে।

১৮৫০ সালের এপ্রিল মাসে মহারাজার সিংহাসনে আরোহনের তিন মাসের মধ্যেই দুইজন তিপ্রা সর্দার কীর্তি ও পরীক্ষিতের নেতৃত্বে একদল তিপ্রা প্রজা গভীর রাতে বলরাম হাজারীর বাড়ী আক্রমণ করে। প্রহরীরা বাধা দিতে চেষ্টা করায় তাদের হত্যা করা হয়। বলরাম হাজারী গোপন পথে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেন। কিন্তু বলরামের ভাই শ্রীদাম বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। রাজার সেনাদলের হাতে বিদ্রোহীরা বন্দী হন। বিদ্রোহীদের একজন নেতা কীর্তি ষড়যন্ত্রকারী যুবরাজ উপেন্দ্রের নিযুক্ত গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হবার ভয়ে দ্রুত এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়।

মহারাজা বলরাম হাজারীকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর অনুচরবর্গসহ তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসন দেন। বলরাম হাজারী একদল সেনার সাহায্যে গোপনে মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যকে হত্যা করে যুবরাজ উপেন্দ্র চন্দ্রকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

জমাতিয়া বিদ্রোহ

জমাতিয়ারা ত্রিপুরার মহারাজাদের অতি বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধের সময় বা জরুরী নিরাপত্তার কারণে ডাক পড়লে তারা অতিদ্রুত রাজ দরবারের সামনে জমায়েত হতো। অনেকের ধারনা এর থেকেই তাদের নাম হয় জমাতিয়া। রাজধানীর আশেপাশেই জমাতিয়াদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল যাতে দ্রুত জমায়েত হতে পারে।

রাজধানী উদয়পুরের আশেপাশে এখনো জমাতিয়া গ্রামগুলো টিকে আছে। যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং শান্তির সময় চাষবাস করা এই ছিল জমাতিয়া সম্প্রদায়ের কাজ। মহারাজাদের বিরুদ্ধে জমাতিয়াদের বিদ্রোহের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে।

১৮৬৩ সালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য জমাতিয়া বিদ্রোহ ঘটেছিল। এর প্রধান কারণ দুটি।

প্রথমত— ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে পিতৃ ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে প্রজাদের

উপর নানা ধরনের কর ধার্য করা হয়। জমাতিয়াদের উপরও কর আদায়ের জন্য নানা রকম চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

দ্বিতীয় কারণটি হল—রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে মহারাজা বীরচন্দ্রের ভাইদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। মহারাজার এক বৈমাত্রের ভাই নীলকৃষ্ণ ঠাকুর জমাতিয়াদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বয়সের দিক থেকে তিনিই সিংহাসনের প্রধান দাবীদার হলেন। মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য কাউকে যুবরাজ নিযুক্ত করে যাননি বলে অভিযোগ উঠে। গুরু বিপিন বিহারী গোস্বামীর উদ্যোগে জাল দালিল করে বীরচন্দ্র ঠাকুরকে যুবরাজ নিযুক্ত করা হয়েছে বলে আদালতে মামলা করা হয়। নীলকৃষ্ণ ঠাকুর নিম্ন আদালতে জয়ী হয়ে দ্রুত চাকলা রোশনাবাদ দখল করে নিলেন। মহারাজা বীরচন্দ্র উচ্চ আদালতে আপীল করলেন। নীলকৃষ্ণ ঠাকুর জমাতিয়াদের পরামর্শ দিলেন আদালতের মামলা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ যেন খাজনা না দেয়। জমাতিয়ারা সাময়িকভাবে খাজনা দেওয়া বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য নীলকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রতি জমাতিয়াদের আনুগত্য ও খাজনা না দেবার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। জমাতিয়াদের মিসিপ ওয়াখিরায় হাজারীকে খাজনা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে জমাতিয়া গ্রামে পাঠালেন।

ওয়াখিরায় বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে জমাতিয়া গ্রামে প্রথমেই তিতুন প্রথা অনুযায়ী কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য তিতুন প্রথা বাধ্যতামূলক হলেও যোদ্ধা জাতি হিসেবে জমাতিয়াদের উপর তিতুন প্রথায় নিয়োগ প্রচলিত ছিল না। কাজেই ওয়াখিরায়ের দলবলের সঙ্গে জমাতিয়াদের তর্কবিতর্ক ও কলহ সৃষ্টি হয়। ওয়াখিরায় রাগ করে দলবল নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে মহারাজাকে জানালেন যে জমাতিয়ারা খাজনা দিতে রাজী নয়। তারা বিদ্রোহ করার জন্য তৈরী হয়েছে।

মহারাজা বীরচন্দ্র খবরাখবর নিয়ে একটা মীমাংসা করার পরিবর্তে একদল সেনা পাঠালেন বিদ্রোহ দমন করার জন্য। গ্রামের পথে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দেখে জমাতিয়া যুবকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হল। জমাতিয়া সর্দার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে জমাতিয়ারা জয়ী হল। সৈন্যরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত হল।

এই খবর পেয়ে মহরাজা বীরচন্দ্র ক্ষিপ্ত হয়ে কুকীদের সাহায্য চাইলেন। কুকীরা ত্রিপুরার ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে সব সময় কাজ করতো। কুকী সর্দার মরছুই লালা ও হাপপুই লালা নামে দুই সেনাপতির অধীনে ৬০০ দুর্ধর্ষ কুকী বাহিনী জমাতিয়া বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠালেন। মহারাজার কিছু সৈন্যও তাদের সঙ্গে গেল।

কুকীরা জমাতিয়া গ্রামগুলো চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। জমাতিয়ারা এরকম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ঘন্টাধ্বনী দিয়ে কুকীরা বার বার যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানালো। দুই শতাধিক জমাতিয়া যুবক সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ে। সর্দার পরীক্ষিতের নেতৃত্বে বীরের মত যুদ্ধ করে অসম যুদ্ধে প্রাণ দেয়। সর্দার পরীক্ষিত কয়েকজন অনুগামী সহ বন্দী হন। কুকীরা তাদের যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধে নিহত ২০০ যুবকের মাথা কেটে মহারাজার দরবারে হাজির হয়। এছাড়াও বহু কিশোরী ও বালিকাদের বন্দী করে নিয়ে আসে।

মহারাজার আদেশে কাটা মাথাগুলো রাস্তার দুই পাশে বাঁশের মধ্যে গেঁথে ঝুলিয়ে রাখা

হয়। আর কোন প্রজা যাতে বিদ্রোহের সাসহ না দেখায় সেজনাই এই আতংকজনক ব্যবস্থা করা হয়।

সেকালের যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী বন্দী বালিকাদের মহারাজা অর্থ দিয়ে কিনে নেন। আহত পরীক্ষিতকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মাথা মুড়িয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য বন্দীরাও এভাবে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তি পায়।

বহু জমাতিয়া আতংকিত হয়ে চাকলা রোশনাবাদে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। ইংরেজ সরকারের নির্দেশে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে আর কোন বিদ্রোহ হবে না এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করা হয়।

রিয়াং বিদ্রোহ

ত্রিপুরার রিয়াং সম্প্রদায় অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। জনসংখ্যার দিক দিয়ে উপজাতিদের মধ্যে রিয়াংদের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে তাদের স্থান সবার পেছনের সারিতে। রাজন্য আমলে যেমন ছিল স্বাধীন ভারতে অন্তর্ভুক্তির ৫৫ বছর পরেও রিয়াংদের সামাজিক অবস্থান সেখানেই রয়েছে।

গণতান্ত্রিক সরকার রিয়াং সম্প্রদায়কে আদিম জাতিভুক্ত করেছে। সবচেয়ে পেছনে পড়া আদিম জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ দপ্তরও রয়েছে। মাঝে মাঝে এই দপ্তরকে গুরুত্ব দিয়ে একজন পূর্ণ মন্ত্রীও নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তথাপিও অর্ধশতাব্দীর গণতান্ত্রিক শাসনেও রিয়াং সমাজের আদিম অবস্থা ঘুচল না কেন এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

রাজন্য যুগে ত্রিপুরীদের তুলনায় রিয়াংরা শিক্ষা ও অর্থনীতির দিক থেকে অনেক পেছনে ছিল। কিন্তু রিয়াংদের উপর ঘর চুক্তির হার ছিল বেশী। মহারাজার সেনা বিভাগে রিয়াংদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সুযোগ সুবিধা ছিল খুবই কম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে ত্রিপুরার পূর্ব সীমান্তে জাপানী বাহিনী যখন আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই রিয়াংরা রতনমণির নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে এই ঘটনা রিয়াং বিদ্রোহ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই বিদ্রোহ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল না।

এই বিদ্রোহের দুটি কারণের মধ্যে প্রথমটি হল --- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত ত্রিপুরায়ও সরকারী উদ্যোগে খাদ্য মজুত করা হয়। মহাজন এবং বিত্তবান সর্দাররাও গোপনে খাদ্য মজুত করতে থাকে। ফলে বাজারে খাদ্যের অভাব তীব্র হয়। সব রকম নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অসহনীয় অবস্থার মধ্যে যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন রকম কর আদায় শুরু হয়।

দ্বিতীয় কারণটি হল---রিয়াং সমাজে বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী একজন নির্বাচিত সর্দারের জীবিতকালে অন্য কাউকে সর্দার নিযুক্ত করা যায় না। সে সময় রিয়াংদের

নির্বাচিত সর্দার ছিলেন অমরপুরের দেবী সিং। মহারাজা বীর বিক্রম ঘনিষ্ঠ কোন পারিষদের পরামর্শে বিলোনীয়ার খগেন্দ্র চৌধুরীকে নতুন সর্দার নিযুক্ত করে অবিলম্বে যথেষ্ট সংখ্যায় রিয়াংদের মধ্যে থেকে সেনা বিভাগে লোক নিয়োগের জন্য নির্দেশ দেন।

হঠাৎ করে সর্দার পরিবর্তন এবং যুদ্ধের জন্য সেনা বিভাগে যোগদানের নির্দেশের কথা প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। মহারাজার মনোনীত রিয়াং মিসিপ খগেন্দ্র চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ হওয়ায় রিয়াংদের আপত্তি ও অসন্তোষের কথা মহারাজার কাছে পৌঁছানো গেল না।

অন্যদিকে খগেন্দ্র চৌধুরী জোর করে বহু যুবককে ধরে এনে সেনা বিভাগে যোগ দেবার জন্য চাপ দিলেন। দরিদ্র রিয়াংদের উপর শুরু হল নানা ধরনের নির্যাতন। রিয়াংরা তাদের গুরু রতনমণির সঙ্গে পরামর্শ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সংঘবদ্ধ হল এবং খগেন্দ্র চৌধুরীকে সর্দার বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল। রতনমণি কয়েকজন চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে খগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে গিয়ে একটা মীমাংসা করার জন্য আলোচনায় বসতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু খগেন্দ্র চৌধুরী কোন রকম মীমাংসায় রাজী হলেন না। বরং মহারাজার কাছে রিপোর্ট পাঠালেন যে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াংরা বিদ্রোহ করার প্রস্তুতি নিয়েছে।

মহারাজা উদয়পুর থানার দারোগা দীনেশ দাসকে নির্দেশ দিলেন উপযুক্ত তদন্ত করে অবিলম্বে যেন রিপোর্ট পাঠানো হয়। রতনমণি চট্টগ্রাম থেকে ১৯৩৭ সালে প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্য উদয়পুরে আসেন। অমরপুরে রিয়াং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচুর শিষ্য পাওয়ায় চেলাগাং অঞ্চলে একটি স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া ও সাব্রুম অঞ্চলে অনেকগুলো আশ্রম গড়ে উঠে। রিয়াং ও নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষ রতনমণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

দরিদ্র শিষ্যদের উপর সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরীর অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি শিষ্যদের নিয়ে একটি বিদ্রোহী বাহিনী গঠন করেন। অত্যাচারী সর্দারকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য।

উদয়পুরের তুইনানী এবং অমরপুরের তৈছারবহা অঞ্চলে বিদ্রোহীদের দুটি শক্ত ঘাঁটি ছিল। অমরপুরের তৈছারবুহা ঘাঁটিতে উদয়পুরের দারোগা দীনেশ দাস রতনমণির সঙ্গে দেখা করেন। গুরু রতনমণি দারোগাবাবুকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন দরিদ্র রিয়াং ও নোয়াতিয়াদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার কাজই তিনি করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরানের কাহিনী বর্ণনা করে শিষ্যদের মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক চেতনা বিকাশের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। তারা মহারাজার বিরুদ্ধাচরণ করছেন না। তবে মহারাজার নিযুক্ত সর্দারকে মেনে নিতে পারছেন না। ক্ষুব্ধ রিয়াংদের অভিযোগ মহারাজার কাছে পেশ করার চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন। রতনমণির ভদ্র ও অমায়িক ব্যবহারে দারোগাবাবু খুশী হন এবং মহারাজাকে জানিয়ে দেন যে, রতনমণি প্রকৃতই একজন সাধু। মহারাজার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহের ইচ্ছা তাদের নেই।

এই সময় সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরী রতনমণির কয়েকজন শিষ্যকে ধরে নিয়ে খুবই নির্যাতন করেন এবং বিশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। ক্ষুব্ধ রিয়াংরা খগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়। আরো কয়েকজন সর্দার সমর্থকদের বাড়ী লুন্ঠন করে পুড়িয়ে দেওয়া

হয়। খগেন্দ্র চৌধুরী মহারাজার কাছে রিপোর্ট করেন রতনমণির দল ডাকাতি ও বিদ্রোহ শুরু করেছে।

একই সময়ে ইংরেজ সামরিক কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট করে যে, গুপ্তচর মারফত জানা গেছে রতনমণির সঙ্গে আজাদহিন্দ বাহিনীর যোগাযোগ রয়েছে। ত্রিপুরা আক্রান্ত হলে রতনমণির বাহিনী জাপানী ও আজাদহিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করবে। অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহারাজাকে অনুরোধ জানানো হয়।

মহারাজা চরম মুহূর্তে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য উদয়পুর, বিলোনীয়া ও অমরপুরে তিন সেনাপতির নেতৃত্বে তিনটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উদয়পুরে মনোরঞ্জন দেববর্মা, বিলোনীয়ায় হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা এবং অমরপুরে ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মা বাহিনীর নেতৃত্ব দিলেন। মহারাজা বিদ্রোহী দমনের জন্য নির্বিচারে হত্যা, গৃহদাহ, গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেন। **১৯৪৩ সালের ৩১ শে জুলাই এই আদেশ জারি হয়।**

রতনমণি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। তাই রাজার সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার মত কোন প্রস্তুতিও ছিল না। আকস্মিক আক্রমণে লাঠি, বল্লম ও টাক্কাল ইত্যাদি অস্ত্রধারী রিয়াংবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অমরপুর ও বিলোনীয়ায় খণ্ডযুদ্ধ হল। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে আদিম জাতির বিদ্রোহীরা বেশীক্ষণ প্রতিরোধ অক্ষুন্ন রাখতে পারল না। বহু বিদ্রোহী গুলিতে নিহত হন। দুইশ মহিলা এবং ১২জন শিশু সহ তিন হাজার বিদ্রোহী বন্দী হল। ৫০টি গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হল। রতনমণি চট্টগ্রামে পালিয়ে যান। যুদ্ধের কারণে চারদিকে তখন শত শত গুপ্তচর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ছয় মাসের মধ্যেই রতনমণি ধরা পড়েন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ রতমণিকে রাজদরবারে পাঠিয়ে দেয়। রতনমণিকে রাজপ্রাসাদে অবিরাম শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয়। কিন্তু প্রচার করা হয় যে রতনমণি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। পরবর্তীকালে মেডিক্যাল রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছিল যে নির্মম প্রহারের ফলে রতনমণির লাংস ফেটে গিয়ে মারা যান।

কয়েকজন নেতৃ স্থানীয় রিয়াংকে বিভিন্ন মেয়াদের জেল দেওয়া হয়। বাকীদের মাথা মুড়িয়ে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রিয়াং বিদ্রোহের উপর এক তদন্ত রিপোর্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রিয়াং বিদ্রোহের পিছনে কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না। এই বিদ্রোহ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও ছিল না। চরম দারিদ্র্য এবং সর্দারের অত্যাচারই রিয়াং বিদ্রোহের প্রধান কারণ।

ভারতভুক্তির পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রিয়াং সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে রিয়াং বিদ্রোহকে নিজেদের স্বার্থের উপযোগী ব্যাখ্যা দিয়ে প্রচার করেছেন।
যেমন — একদল প্রচার করেন যে, রতনমণি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। ত্রিপুরায় রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্যই রিয়াং বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আরেক দল প্রচার করেছেন যে—রতনমণি নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে ত্রিপুরায় এসে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রিয়াং বিদ্রোহীদের সংগঠিত করেছিলেন।

আরেক দল প্রচার করেন যে, রতনমণি মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কুমিল্লায়

কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নাকি রিয়াং বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেন। বীরেন দত্তের সঙ্গেও নাকি রতনমণির যোগাযোগ হয়েছিল। অথচ ১৯৪০-৪৩ সালে বীরেন দত্ত সহ সব রাজনৈতিক দলের নেতারাই জেলে বন্দী ছিলেন বা রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন।

আরেকটি অতিবিপ্লবী প্রচার হল — ২২ হাজার বিদ্রোহী রিয়াং রতনমণিকে রাজা বলে ঘোষণা দিয়ে একটি স্বাধীন শোষণ মুক্ত রিয়াং রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক'--- নামক গ্রন্থে লেখক সুপ্রকাশ রায় এরূপ মন্তব্য করেছেন। (পৃষ্ঠাসংখ্যা-১২১)

এই গ্রন্থের লেখক একই প্রবন্ধে সমশের গাজী সম্পর্কেও লিখেছেন - "ঐ ত্রিপুরা জেলারই সমশের গাজী নামে অখ্যাত অজ্ঞাত এক চাষী ক্রীতদাস - যিনি সুদুর ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জনতার এক শোষণ মুক্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে জনতার অফুরন্ত কর্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলে ছিলেন, ভারতের ইতিহাসে এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" (পৃষ্ঠা সংখ্যা-১২৬)

যে সমাজে শোষণ করার মত উৎপাদন ব্যবস্থাই গড়ে উঠেনি, সেখানে শোষণ মুক্ত রাজ্য স্থাপনের কথা একজন লেখক কিভাবে বলতে পারেন? সমশের গাজীর শাসনকালে পৃথিবীর কোথাও শোষণ শব্দটির প্রচলন হয়নি। এভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে যুবকদের মনে উত্তেজনা ছড়িয়ে দেওয়া সমাজের পক্ষে কল্যাণকর মনে হয় না।

ত্রিপুরায় রিয়াং বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে ঘোষণা দিয়ে পেনসান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সুবিধাবাদী রাজনীতির দ্বারা কিছু লোক উপকৃত হলে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু কোথায়, কিভাবে পাওয়া গেল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকা তা অনেকেই জানতে চাইতে পারেন।

ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা অধিকার থেকে প্রকাশিত প্রাক্তন মন্ত্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্তের **"বিদ্রোহী নেতা রতনমণি"** গ্রন্থে লেখক খুব জোর দিয়েই লিখেছেন যে ব্যাপক অনুসন্ধান, সাক্ষাৎকার এবং নথিপত্র পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক আন্দোলন। মহারাজা সঠিক সময়ে মীমাংসার জন্য উদ্যোগী হলে এ বিদ্রোহ ঘটত না।

পরবর্তীকালে সর্দার খগেন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, একজন নোয়াতিয়া সাধু রিয়াং সমাজের নেতা বনে যাওয়াকে খগেনবাবু মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলেন রিয়াং সমাজের উন্নয়নের স্বার্থেই যত বেশী সম্ভব রিয়াং যুবকদের সেনাবাহিনীতে ভর্তির জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রিয়াং সম্প্রদায়কে যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী কৃষিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। রিয়াংদের একাংশ চৌধুরীকে ভুল বুঝেছিলেন।

গোলাঘাটির কৃষক বিদ্রোহ

১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে গোলাঘাটিতে মহাজনের ধান লুঠ করার

অভিযোগে একদল ক্ষুধার্ত কৃষকের উপর গুলি চালিয়ে পুলিশ বাহিনী ৭জন কৃষককে হত্যা করে। বহু কৃষক আহত হয়। এই ঘটনায় সারা রাজ্যে তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

মহারাজা বীরবিক্রম ১৭ মাস আগে হঠাৎ মারা গেলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। ত্রিপুরা রাজ্য ভারতে যোগদানের ইচ্ছা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। যুবরাজ কিরীট বিক্রম নাবালক থাকায় মাতা মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী রাজপ্রতিনিধি হিসেবে কার্যভার পরিচালনা করছেন। কিন্তু প্রশাসন পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব পালন করছেন ভারত সরকারের মনোনীত দেওয়ান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে রাজ্যে চলছিল প্রচন্ড খাদ্যাভাব। একদিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে সরকার খাদ্য মজুত করেছিলেন। অন্যদিকে মহাজন ও সর্দাররা খাদ্য মজুত করে বেশী দামে বিক্রী করেছিলেন। চারদিকে চলছিল দুর্ভিক্ষের অবস্থা। রাজ্যে চলছিল চরম অস্থিরতা। সদর এবং খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়ানক গো-মড়ক, কলেরা, বসন্ত দেখা দিয়েছিল। কয়েক বছর ধরে খরা অথবা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ত্রিপুরার চাষবাস। দেশ বিভাগের ফলে বনজ সম্পদ বিক্রীতেও সৃষ্টি হয়েছে নানা রকম বাধা।

এরকম সময় বিনা পারমিটে নৌকা যোগে ধান পাচার করার সময় সিপাইজলায় প্রহরারত মিলিটারীরা মহাজনদের ৭টি ধান বোঝাই নৌকা আটক করে স্থানীয় সর্দারদের সহযোগিতায় দরিদ্র উপজাতি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। শর্ত দেওয়া হয় কৃষকদের পরবর্তী ফসল ঘরে উঠার পর মহাজনের ঋণ পরিশোধ করা হবে। মহাজনরা এই শর্তে রাজী হয়ে যায়।

এর কয়েকদিন পরই গোলাঘাটি বাজারের উজানে বিশালগড়ের বড় মহাজন হরিচরণ সাহার ২৩টি ধান বোঝাই নৌকা প্রহরীরা আটক করে স্থানীয় প্রভাবশালী সর্দারদের খবর দেয়। চারদিকে দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে যে গোলাঘাটিতে ধান বন্টন করা হবে। মহাজন প্রহরীদের কাছে দাদন হিসেবে কৃষকদের মধ্যে ধান বন্টন করতে রাজী হয়ে যায়। কিন্তু গোপনে লোক পাঠিয়ে বিশালগড় থানায় পূর্ব বন্দোবস্ত মত খবর পাঠায়। থানার দারোগার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক করা হয়েছিল নৌকা আটক করলে পুলিশ উদ্ধার করে আনবে। ক্ষুধার্ত কৃষকেরা যে কোন শর্তে ধান পেতে আগ্রহী। এ রাজ্যে বহুকাল থেকে অভাবের সময় দাদন দিয়ে মহাজনরা পরবর্তী ফসল থেকে সুদ সহ আদায় করার পদ্ধতি প্রচলিত করেছিল। গ্রামের সর্দাররাই কৃষকদের পক্ষে জামিনদার থাকতো।

কিন্তু ঐ দুর্ভিক্ষের সময় মহাজনরা নগদ দামে অনেক বেশী লাভে বিক্রীর জন্য ধান দাদন দিতে ইচ্ছুক ছিল না। পুলিশের সহযোগিতায় ধান নামিয়ে আনার জন্য বন্দোবস্ত করেছিল। ক্ষুধার্ত মানুষেরা কূটচাল বুঝতে না পেরে বন্টন করার উদ্দেশ্যে নৌকা থেকে ধান নদীর তীরে তুলে আনতে থাকে।

হঠাৎ একদল পুলিশ এসে ধান লুঠ হচ্ছে বলে হুঁশিয়ারী দিয়ে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। তৎক্ষনাৎ ৭জন কৃষকের মৃত্যু হয়। বহু লোক আহত হয়। শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ আতংকে চারদিকে ছুটে পালাতে থাকে।

ক্ষুধার্ত কৃষকেরা ধান লুঠ করতে আসেনি। এসেছিল দাদন হিসেবে ধান নিতে। মহাজন দাদন দিতে অস্বীকার করায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। জোর করে ধান বন্টন করা হবে বলে গুঞ্জন শুরু

হওয়ায় মহাজন দাদন দিতে রাজী হবার ভান করে গোপনে পুলিশকে খবর দেয়।

এই ঘটনার চার মাস আগেই পুলিশের জুলুম প্রতিরোধ করার জন্য -- "মুক্তি পরিষদ" গঠিত হয়। গোলাঘাটি এলাকার দায়িত্বে ছিলেন অঘোর দেববর্মা। পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করার মত কোন সংগঠন তখনো তৈরী হয়নি। এরকম অবস্থায় উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অঘোর দেববর্মার সমালোচনা করা হয় মুক্তি পরিষদের সভায়।

কিন্তু গোলাঘাটির হত্যাকান্ড অতিদ্রুত উপজাতি গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দেয় পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার আকাংক্ষা। হঠাৎ করে রাজার মৃত্যু হওয়ায় সর্দাররা খুব অসহায় বোধ করে। বাঁচার তাগিদেই সবাইকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এই চেতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

গোলাঘাটির কৃষকদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ ছিল, উত্তেজনাও ছিল। কিন্তু আক্রমণ করার মত কোন অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে ছিল না। কাজেই এটাকে বিদ্রোহ বলা চলে না। পুলিশবাহিনী নিজেদেব স্বার্থে এই ঘটনাকে কৃষক বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছে। এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত একটি বিক্ষোভের ঘটনা। সংগঠিত কোন আন্দোলন নয়। এই ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১) ইন্দ্র কুমাব দেববর্মা, ২) সতীশ দেববর্মা, ৩) দেবেন্দ্র দেববর্মা, ৪) কড়া দেববর্মা, ৫) আকুয়া দেববর্মা, ৬) বাগমার এক দেববর্মা, ৭) গাছি মিঞা। গুরুতব আহত হয়েছিল ১) হরি রায় দেববর্মা, ২) যদুমণি দেববর্মা, ৩) ললিত দেববর্মা, ৪) তথী রায় দেববর্মা, ৫) নবদ্বীপ দেববর্মা, ৬) নরেন দেববর্মা, ৭) রাধা দেববর্মা, ৮) অশ্বিণী দেববর্মা।

এই ঘটনাব পবই গণমুক্তি পরিষদ সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পদ্মবিলের নারী বিদ্রোহ

গোলাঘাটিতে কৃষক হত্যার ঘটনার কয়েক মাস পরেই খোয়াই মহকুমার পদ্মবিল গ্রামে নারী হত্যাব ঘটনাটি ঘটে। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে এই ঘটনা ঘটে।

মুক্তি পরিষদের নেতাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে হামলা চালাতে থাকে। তখন কোথাও রাস্তাঘাট ছিল না। পুলিশ-মিলিটারী বা রাজ কর্মচারীদের যাতায়াতের জন্য জঙ্গল কেটে রাস্তা করে দেওয়া এবং মালপত্র এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে বিনা মজুরীতে পৌঁছে দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এই প্রথার নাম ছিল তিতুন।

মুক্তি পরিষদ এই তিতুন প্রথা বাতিলের দাবী করে এবং সমস্ত উপজাতিদের এই তিতুন প্রথা অগ্রাহ্য করার জন্য আহ্বান জানায়। গোলাঘাটির ঘটনায় উপজাতিদের মধ্যে জমা হয়েছিল চরম উত্তেজনা। তাদের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে রাজ্যে এখন রাজা নেই। আর কোন রাজা থাকবে না। কংগ্রেস দল রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছে। দেওয়ানী শাসনে উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এই শাসনের পরিবর্তে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই রকম পরিস্থিতিতে পদ্মবিল গ্রামে একদল মিলিটারী গিয়ে পুরুষদের না পেয়ে

মেয়েদেরকে তিতুন প্রথায় কাজ করার জন্য আদেশ জারি করে। গ্রামের মেয়েরা দলে দলে এসে পথ অবরোধ করে এবং তিতুন প্রথায় কাজ করতে অস্বীকার করে। ক্ষুব্ধ মিলিটারীরা কয়েকজন মহিলাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তিতুন প্রথায় কাজ করার জন্য। এতে সমবেত নারীদের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। তারা টাক্কাল জাতীয় অস্ত্র নিয়ে মিলিটারীব উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনেক নেতা ও সর্দারের ধারনা ছিল পুলিশ বা মিলিটারী নারীদের উপর গুলি চালাবে না। কিন্তু ক্ষিপ্ত মিলিটারী নারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি বর্ষণ করতে থাকে। ঘটনাস্থলেই কুমারী, মধুতি ও রূপশ্রী নামে তিনজন মহিলা মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়।

এখবর চাবদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে বহু নারী ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। মেয়েদের এই সাহস দেখে মিলিটাবীর লোকেরা ঘাবড়ে যায়। তারা খোয়াই শহরেব দিকে রওনা হবার প্রস্তুতি নেয়। এমন সময় গভীর জঙ্গল থেকে বিষাক্ত তীব ছুটে আসতে থাকে। হিন্দুস্থানী গেরিলারা মিলিটারীর উপর আক্রমণ চালায়। মিলিটারীরা চাবদিক থেকে আক্রমণেব আশংকা কবে গুলি করতে করতে পিছু হটে যায়।

এই ঘটনার পর শত শত উপজাতি নারী গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য দাবী জানাতে থাকে। পুলিশ ও মিলিটাবীর বিরুদ্ধে নারী হত্যার প্রতিশোধ নেবাব জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হয।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় শুধুমাত্র উপজাতি প্রজাদেব উপব তিতুন প্রথা চাপিয়ে দেওয়া হয়। সমতল অঞ্চলের অন্যান্য প্রজাদের উপব তিতুন প্রথা প্রযোগ করা হয়নি। এটাই উপজাতিদের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। এই তিতুন প্রথা নিয়েই জমাতিয়া সম্প্রদাযেব সঙ্গে রাজ কর্মচারীদের বিবোধ সৃষ্টি হয়েছিল। রাজার সামবিক বাহিনীতে কাজ কবাব ফলে জমাতিয়া সম্প্রদায়কে তিতুন প্রথা থেকে রেহাই দেওয়া হযেছিল। কিন্তু বাজস্ব আদায় কবতে গিয়ে রাজ কর্মচারীরা জমাতিয়া গ্রামে তিতুন প্রথা জোর করে চাপিযে দেবাব চেষ্টা কবায় জমাতিযা বিদ্রোহেব সূত্রপাত হয়।

পদ্মবিলের পরেই খোয়াই মহকুমার চাম্পাহাওর এলাকায জনতাব সঙ্গে মিলিটারীব সংঘর্ষ হয। এখানেও জনতা সংগঠিত ছিল না। উত্তেজনার বশে যার যাব অস্ত্র নিয়ে মিলিটারীব বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমবেত হয়েছিলেন কয়েক হাজার সাধাবণ মানুষ। তাদের হাতে ছিল টাক্কাল, তীর ধনুক এবং গাদা বন্দুক। এসব অস্ত্র নিয়ে আধুনিক অস্ত্রে সুশিক্ষিত মিলিটারীব সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করা আত্মহত্যারই সামিল। মুক্তি পরিষদের নেতাবা অতিক্রুত নির্দেশ দিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জনতাকে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ করার পরামর্শ দিলেন। ক্ষিপ্র গতিতে আক্রমণ করে ক্ষিপ্র গতিতে নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে পড়াই গেরিলা যুদ্ধের প্রধান কৌশল।

নিরক্ষর উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা অল্পদিনের প্রশিক্ষণ পেয়েই গেরিলা যুদ্ধে দক্ষতা অর্জন করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ছাঁটাই হওয়া প্রাক্তন সৈন্যরাই এই প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিল।

এভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের যুগ অতিক্রম করে ত্রিপরার প্রজারা সংগঠিত সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক যুগ সৃষ্টি করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরায় বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাবতীয় ধারা কোন না কোন সময়ে ত্রিপুরার সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেছে, আলোড়িত করেছে এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম মুখর করে তুলেছে।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় সংগঠিত গণআন্দোলন গড়ে উঠার সুযোগ ছিল না। তাই স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহ বার বার দেখা দিয়েছে। বৃটিশ ভারতের প্রতিটি রাজ্যে শত শত প্রজা বিদ্রোহ বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে দেখা দিয়েছে। কোন সময়েই সমগ্র কৃষক সমাজ এসব বিদ্রোহে যুক্ত হয়নি। প্রতিটি বিদ্রোহ নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়েছে।

১৮৫৭ সালে ভারতে প্রথম বড় আকারের সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সশস্ত্র সিপাহীরা এই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তদের মূল লক্ষ্য ছিল এ দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা। বহু রাজা নবাব ও জমিদার যারা ইংরেজদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে এবং ক্ষমতা হারিয়েছে তারা এই বিদ্রোহে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছে। বিদেশী বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে এই প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহকে ভারতীয়রা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছে। অন্যদিকে বিদেশী সরকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে এটাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার কৃষক। বীরের মত যুদ্ধ করে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে দিল্লী থেকে হটিয়ে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে শুরু করেছিল দেশীয় সরকারের শাসন। কিন্তু বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের বিপুল সংখ্যক জনগণের সমর্থন ছিল না এই বিদ্রোহের পেছনে।

তাছাড়া দেশীয় রাজারা বিপুলসংখ্যক সেনা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল বিদ্রোহ দমন করতে। নতুবা তখনই ইংরেজরা এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হতো। ইংলন্ড থেকে সেনা এনে ভারত রক্ষা করা বা উদ্ধার করা সে যুগে সম্ভব ছিল না। ইংরেজ সরকারকে খুশী করার জন্য দেশীয় রাজারা হত্যা করেছে হাজার হাজার বিদ্রোহী ভারতীয় সেনাকে।

তখনকার সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয়ত্ব বোধ জেগে উঠেনি। এক রাজার পতন ঘটে নতুন রাজা আসে। যখন যিনি রাজা হন প্রজারা তারই আনুগত্য স্বীকার করে। এমন একটি পরিবেশে দেশীয় রাজাদের অধীনস্থ ভারতীয় সেনাদের সাহায্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা পেল। বিদ্রোহী সেনাদের নির্বিচারে হত্যা করা হল। শুধু দিল্লীতেই ২৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল।

ভারতের সিপাহীরা সকলেই ছিল কৃষক সন্তান। পেটের দায়ে বৃটিশের সামরিক বিভাগে যোগ দিয়েছিল। তখন সারা ভারতে ইংরেজ সেনা ছিল ৩০ হাজার আর ভারতীয় সেনার সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ পনের হাজার।

কাজেই বিদ্রোহের নেতাদের আশা ছিল একটা অঘাতেই ইংরেজ বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে। দেশীয় রাজারা সাহায্য না করলে সে রকমই ঘটত। ইংরেজ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

বিদ্রোহের প্রস্তুতি পর্বে সিপাহীরা গোপনে সমস্ত ব্যারাকে ব্যারাকে মিটিং করে স্থির করেছিল একই দিনে সারা ভারতের সমস্ত ব্যারাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমস্ত ইংরেজ সৈন্যকে হত্যা করা হবে। সমস্ত সরকারী দপ্তর ও কোষাগার দখল করবে এবং সমস্ত দুর্গ অধিকার করে নেবে। তারপর দেশের জনগণকে সহযোগিতার জন্য আহ্বান জানানো হবে।

সামরিক পরামর্শদাতারা সমস্ত দিক বিচার বিশ্লেষণ করে পরামর্শ দিলেন, আধুনিক সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করা কঠিন। কারণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সবই তখন ইংরেজ সৈন্যদের হাতে থাকতো। কাজেই পেছন থেকে আক্রমণ করে গেরিলা যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীকে ধ্বংস করতে হবে।

সিপাহী বিদ্রোহের নায়কেরা ছিলেন রাজ্যহীন রাজা। অর্থ এবং অস্ত্রও ছিল সামান্য। নায়কদের প্রধান লক্ষ্য ছিল তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়া। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহীদের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসকদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুন ভারতীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পরাজয় ঘটে। ইংরেজ বণিকরা বাংলা ও বিহারের শাসন ক্ষমতা দখল করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্যে সারা ভারতের স্বাধীনতা হরণ করে নেয়। এর জন্য বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে ইংরেজদের। শেষ যুদ্ধ হয়েছে পাঞ্জাবে। সর্বত্রই ভারতীয় সেনারা ছিল ইংরেজদের মূল শক্তি।

পলাশীর পরাজয়ের দিনটিকেই বিদ্রোহীরা বেছে নিয়েছিল, বিদ্রোহের এবং প্রতিশোধ নেবার দিন হিসেবে। তদনুযায়ী পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশ বছর পূর্বের দিনে অর্থাৎ ২২ শে জুন ১৮৫৭ সালের তারিখটি বিদ্রোহের দিন হিসেবে স্থির হয়েছিল। কিন্তু মার্চ মাসে হঠাৎ করে কলকাতার ব্যারাকপুরের সৈন্য ব্যারাকে বিনা কারণে এক ইংরেজ অফিসার ভারতীয় এক সিপাইকে ঘুষি মেরে বসে। মঙ্গলপান্ডে নামে এক সেপাই এই ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে অফিসারটিকে গুলী করে মেরে ফেলে। এর জন্য সামরিক বিচারে মঙ্গলপান্ডের ফাঁসি হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় বিদ্রোহ। বাংলার ব্যারাকপুর, বহরমপুর এবং চট্টগ্রামে এই আকস্মিক বিদ্রোহ ঘটে যাওয়ায় ইংরেজদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমনের কাজ সহজ হয়। সিপাহীরা যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন করে। সারা ভারতে একই দিনে বিদ্রোহ ঘটলে ইংরেজ সরকারের পতন ছিল অনিবার্য।

বাংলার পর সারা ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে কৃষকেরা এই বিদ্রোহে যোগ দিতে থাকে। বিদ্রোহীরা অনায়াসে দিল্লী দখল করে নেয়। বাহাদুর শাহের শাসন তিন মাস কাল চলার পর দেশীয় রাজাদের সেনাবাহিনীর আক্রমণে দিল্লীর অবরোধ ভেঙ্গে পড়ে। কানপুর, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, ঝাঁসি সব রণক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। সর্বত্র নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হাজার হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। বিদ্রোহের নায়কদের গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভারতের অধিকাংশ মানুষ এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝতেই পারেনি।

চট্টগ্রামের যুদ্ধে পরাজিত কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের আশা ছিল স্বাধীন রাজ্যের গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার ত্রিপুরার মহারাজাকে অবিলম্বে সব বিদ্রোহী সিপাহীকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকারের

হাতে তুলে দিতে নির্দেশ পাঠায়। মহারাজার সেনারা বহু চেষ্টা করে কিছুসংখ্যক সিপাহীকে গ্রেপ্তার করে কুমিল্লায় ইংরেজ সরকারের হাতে সমর্পণ করে। তাদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়। বাকীরা পালিয়ে কাছাড় ও আসামে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে বিদ্রোহীরা মৃত্যুবরণ করে।

এই সময় বিদ্রোহীদের প্রতি ত্রিপুরার মহারাজার সহানুভূতি রয়েছে বলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গোপন রিপোর্ট পেশ করা হয়। ক্ষুব্ধ ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্য দখল করে ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পাঠায়। কিন্তু উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নতুন কোন ঝুঁকি না নিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের কোন রাজ্যেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা বিদ্রোহের পক্ষে ছিল না। কারণ এই সময় ইংরেজ শাসনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা নানা রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছিল।

ত্রিপুরায় প্রজারা ইংরেজ শাসনের দ্বারা অত্যাচারিত হয়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও তখন জন্ম হয়নি। কাজেই ত্রিপুরায় জনগণের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের কোন প্রভাব পড়েনি। তবে আশ্রিত বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি একটা সহানুভূতি ছিল। আদিবাসী সমাজে অনেকদিন তারা খাদ্য ও আশ্রয় পেয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পর শাসক শ্রেণীর পরিবর্তন হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বাতিল হয়ে বৃটিশ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু কিছু সংস্কারমূলক কাজও চালু হয়। প্রথমদিকে অনেকটা উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু গ্রাম-প্রধান ভারতের অর্থনৈতিক মূল শক্তি কৃষক শ্রেণীর জন্য কোন পরিকল্পনাই বৃটিশ সরকারের ছিল না। বরং জমিদার শ্রেণীর শোষণ ও অত্যাচারের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করা হয়। জমিদারদের অধীনে অনেক মধ্যসত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়। জোতদার, তালুকদার, ইজারাদার শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

কৃষক শ্রেণীর উপর সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক অঞ্চলে কৃষকরা বিদ্রোহ করেছে। এসব বিদ্রোহ দমনে বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও বিচার বিভাগ জমিদার শ্রেণীকেই সাহায্য করেছে।

ত্রিপুরার প্রজা বিদ্রোহের সঙ্গে বৃটিশ প্রজাদের বিদ্রোহের কোন সম্পর্ক ছিল না। ত্রিপুরায় জমিদার শ্রেণী ছিল না। এখানে মহাজন শ্রেণীর শোষণ ছিল কিন্তু অত্যাচার ছিল না। অত্যাচার চালাতো রাজার কর্মচারীরা। অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিত। এসব বিদ্রোহ সাধারণতঃ এক একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। তাই খুব সহজেই এসব বিদ্রোহ দমন করা যেত। রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন এবং রাজা নিজেই হলেন বিচারক। ফলে এখানে সুবিচার পাওয়ার সুযোগ ছিল না। ত্রিপুরায় প্রজা বিদ্রোহের পরিণতি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে। ইংরেজ শাসকরা কখনোই এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেনি।

এ দেশে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল -

১) ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর অবাধ অধিকার অর্জন করা।

২) কৃষি প্রধান ভারতের কৃষি অর্থনীতি থেকে যত বেশী সম্ভব অর্থ আদায় করা।

৩) ভারতের কৃষিজ, বনজ ও খনিজ সম্পদ ইংলণ্ডে পাঠিয়ে বৃটেনের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা।

৪) ইউরোপীয় বাজারে ভারতীয় পণ্যের ব্যবসায়ে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করা।

৫) ভারতে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা জন্য একটি বিশ্বস্ত ও অনুগত শ্রেণী সৃষ্টি করা।

ঐ সময় বৃটেনের অর্থনীতিও ছিল খুবই দুর্বল। ভারতের মত বিশাল দেশের প্রশাসন পরিচালনা এবং বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য পুঁজি নিয়োগ করার ক্ষমতা ইংরেজদের ছিল না। তাই এ সময় চলেছে লুণ্ঠনের রাজত্ব। ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং শাসকরা দেশের জন্য এবং নিজের জন্য যে যেমনভাবে পেরেছে লুণ্ঠন চালিয়েছে। অতি সাধারণ এক সৈনিক ক্লাইভ সাহেবের মত ব্যক্তিরা দেশে ফিরে গেছেন কোটিপতি হয়ে। এ দেশের লুণ্ঠনকারী ইংরেজ সাহেবরাই হয়েছেন বৃটেনের প্রথম সারির শিল্পপতি।

ত্রিপুরায় লুণ্ঠনের মত মূল্যবান সম্পদ ছিল না বলেই ইংরেজদের লুলোপদৃষ্টি এ রাজ্যের প্রতি ছিল না। বৃটিশ সরকারের প্রতি মহারাজার আনুগত্য, অভিষেকের নজরানা এবং জমিদারীর জন্য নির্দিষ্ট রাজস্ব পেলেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ খুশী থাকত। রাজস্ব ঠিকমত না পেলেই হুমকি শুরু হত। পার্বত্য ত্রিপুরার বার্ষিক আয় ছিল মাত্র কয়েক লক্ষ টাকা। একটা রাজ পরিবারের আভিজাত্য রক্ষার পক্ষেও এই আয় যথেষ্ট নয়। তাই মহারাজার চাকলা রোশনাবাদের জমিদারীর উপরই ছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষের লোভ। জমিদারী এলাকা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় ত্রিপুরার মহারাজাদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সহজ ছিল।

ত্রিপুরার মহারাজারা বৃটিশ সরকারের অধীনস্থ জমিদার রূপে গণ্য হতো। তাই রাজপরিবারের যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির জায়গা ছিল বৃটিশ আদালত। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য এ বিষয়ে আপত্তি তুলে ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ কর্তৃপক্ষ তা গ্রাহ্য করেনি।

পার্বত্য ত্রিপুরার প্রজারা বৃটিশ শাসকদের অত্যাচার থেকে মুক্ত ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পার্বত্য ত্রিপুরার প্রজাদের উপরও করের বোঝা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কর আদায়ের জন্য জুলুমও বেড়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের ৪৫ বছর পর ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯০২ সালে। বাংলার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনতত্ত্বের অনুসরণে অনুশীলন সমিতি নামে এক বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, তাঁর ভাই বারীন ঘোষ, যতীন বন্দোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই গুপ্ত সমিতির সদস্য হন।

প্রকাশ্যে ক্লাব গঠন করে সমাজসেবামূলক কাজকর্ম করা, লাঠিখেলা, ব্যায়াম, খেলাধুলা নীতিশিক্ষা, চরিত্র গঠন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। গোপনে বাছাই করা সাহসী যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হত।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে ভাইসরয় কার্জন **'বঙ্গভঙ্গ'** আদেশ জারী করেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলার আইনজীবী, ছাত্র-যুবক-ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশার কর্মীরা প্রচন্ড বিক্ষোভে

ফেটে পড়েন। শহরে ও গ্রামে প্রতিবাদ মিছিলে হাজার হাজার মানুষ যোগ দিতে থাকে।

এই সুযোগে বাংলার বিপ্লবীরা শহরে ও গ্রামে শত শত গুপ্ত সমিতি গঠন করে বৃটিশ সরকারকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার শপথ গ্রহণ করে।

ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় পাঁচশতাধিক গুপ্ত সমিতি সৃষ্টি হয়। কুমিল্লাতেও একটি গুপ্ত সমিতি সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করে। এগুলো সবই অনুশীলন সমিতির শাখা।

কিছুকালের মধ্যেই অনুশীলন সমিতির কিছু নেতা "যুগান্তর" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে 'যুগান্তর' দল নামে পৃথক একটি বিপ্লবী দল গঠন করে।

এ দুটি গুপ্ত সমিতি ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর ১০টি গুপ্ত সমিতি গঠিত হয় এবং চারদিকে শাখা-প্রশাখা ছড়াতে থাকে। এসব গুপ্ত সমিতি গঠনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গুপ্ত বিপ্লবী দলগুলোর প্রভাব পড়েছিল।

বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছিল বেশী। এছাড়া ইতালী, আইরিশ, জার্মান ও রুশ বিপ্লবীদেরও প্রভাব ছিল। ঐ সময় পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়নি।

বাংলার বিপ্লবীদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও মূল লক্ষ্য ছিল এক। ভারতের বুক থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়ে দেশীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। এই সময়ের বিপ্লবীরা বিশ্বাস করত কিছুসংখ্যক সাহসী এবং দেশের স্বার্থে জীবন বিসর্জন করতে প্রস্তুত নির্ভিক যুবকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়িত্বশীল ইংরেজ অফিসারদের ক্রমাগত হত্যা করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারলেই ইংরেজ সাহেবরা এ দেশ ছেড়ে পালাবে। বিপ্লবীদের এই বিশ্বাস যে অমূলক ছিল না তা ইংরেজদের গোপন রিপোর্ট থেকে প্রমাণিত হয়।

কিন্তু কিছু সংখ্যক ইংরেজ অফিসার পালিয়ে গেলেই যে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো যায় না এ বিষয়টা বিপ্লবীদের চিন্তা চেতনায় ছিল না। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে এবং সাম্রাজ্য রক্ষায় ভারতীয় সেনা, অফিসার এবং কর্মচারীরাই ছিল বৃটিশ প্রশাসনের মূল শক্তি। ভারতে বৃটিশ সরকারের অনুগত এবং বিশ্বস্ত তাঁবেদার দল সৃষ্টি করার পরিকল্পনা সফল হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় নৌ সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ এবং জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাংক্ষা ও উত্তাল গণআন্দোলন সৃষ্টি হওয়ার আগে বৃটিশ সরকার ভারত ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও রাজী ছিল না। ১৯৪৫ সালেও কেউ ভাবতে পারেনি যে মাত্র দুই বছরের মধ্যে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবে।

প্রথম যুগের বিপ্লবীরা সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সাফল্য পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করতেন। তাই তাদের বলা হত সন্ত্রাসবাদী। জনগণের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের উপর দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া প্রতিবাদের রূপ নেয়নি। নিরীহ ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করার ফলে তাদেরকে যখন গুলি করে মারা হত বা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিত তখন সাধারণ মানুষ নির্বিকার থাকত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাধারণ মানুষের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন এল। নির্ভিক যুবকরা দেশের মানুষের জন্য অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে একথা প্রচারিত হবার ফলে মানুষের মধ্যে সহানুভূতির

ঢেউ জেগে উঠে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরামের ফাঁসির খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে সহানুভূতির ঝড় বয়ে যায়।

ত্রিপুরাতেও মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন রাজ অন্তঃপুরে সারাদিনব্যাপী কীর্তনের আয়োজন করেছিলেন। 'বঙ্গভঙ্গ' - আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ রাখী বন্ধনের রীতি প্রচলিত করেন। ত্রিপুরায় রাজ পরিবারেও রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হয়। এসব ঘটনায় প্রমাণ হয় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। মহারাজার অজ্ঞাতসারে বিপ্লবীরা ত্রিপুরায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালিয়ে গেছেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মহারাজার সহানুভূতিই ছিল বিপ্লবীদের কাজে বাধা না দেবার কারণ। বিপ্লবীরা কোন সময়েই দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য রাখেননি। রাজতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যকলাপও তাদের ছিল না।

বাংলার বিপ্লবীরা ছাড়াও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরল, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বিভিন্ন বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতেন।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের তিনটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়।

১) ১৯০২-১৯১৩ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রথম পর্ব।

২) ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব।

৩) ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত তৃতী ও শেষ পর্ব।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রথম পর্বের কাজ শুরু হয়। ক্ষুদিরামের ফাঁসি এবং প্রফুল্ল চাকীর নিজের গুলিতে প্রাণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সারা দেশকে আলোড়িত করে প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে। এই সময়েই মানিকতলা বোমা মামলায় অধিকাংশ বিপ্লবী নেতা বন্দী হয়ে শাস্তি ভোগ করেন।

অরবিন্দ ঘোষ মুক্তি পেয়ে বিপ্লবের পথ ত্যাগ করে পন্ডিচেরীতে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোযোগ দেন। তাঁর ভাই বারীন ঘোষ এবং উল্লাস করের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজসাক্ষী হবার অপরাধে জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে কানাই লাল দত্ত ও সত্যেন বসু ফাঁসিতে জীবন দেন। এমনিভাবে অন্যান্য বিপ্লবী দলগুলিও নির্ভিক দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে শাস্তি ভোগ করে দেশবাসীকে জাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। ভারতবাসী ভীতু, তারা মরতে ভয় পায় এই কলংক থেকে দেশকে মুক্ত করলেন এইসব বিপ্লবীরা। জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য এই চেতনার প্রয়োজন ছিল। প্রথম পর্বের শেষ দিকে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীরা দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর ও বিলোনীয়ায় দুটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেন।

'বঙ্গভঙ্গ' রদ হবার পর বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। নতুন পর্বের জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সারা ভারতের সমস্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সিপাহী ও সামরিক অফিসারদের সংগঠিত করে সারা দেশে একই সময়ে বিদ্রোহ ঘটিয়ে বৃটিশ শাসকদের হটিয়ে দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ

করেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে অত্যন্ত গোপনে সারা দেশ ভ্রমণ করে পরিকল্পনামত বিদ্রোহের সংগঠন গড়ে তোলেন এবং প্রস্তুতি শুরু করেন।

এই পরিকল্পনা সফল হলে বৃটিশ সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী হত। কিন্তু এক ভারতীয় সেনা মোটা পুরস্কার পাওয়ার আশায় বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে গোপন পরিকল্পনার সব খবর জানিয়ে দেয়। ফলে বিদ্রোহের পরিকল্পনায় জড়িত সব নেতারা হঠাৎ ধরা পড়ে যান। বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষে বহু বিপ্লবী ও সেনা মারা যায়। রাসবিহারী বসু গোপনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনিই জাপানে আজাদ হিন্দবাহিনী গঠন করে সুভাষ বসুর হাতে নেতৃত্ব তুলে দেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর গান্ধীজী কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন এবং বিপ্লবী কার্যকলাপ এক বছরের জন্য বন্ধ রাখতে সব বিপ্লবীদের কাছে আবদেন জানান। বিপ্লবীরা সাময়িকভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ স্থগিত রাখেন। কিন্তু গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন চৌরীচৌরায় হিংস্ররূপ নেওয়ায় হঠাৎ করে আন্দোলন বন্ধ করে দেন। সারা দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষ যখন আন্দোলন অংশ নিচ্ছে ঠিক তখনি গান্ধীজি একক সিদ্ধান্তে আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় কংগ্রেস দলের মধ্যেই তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বিপ্লবীরা নতুনভাবে তৃতীয় পর্বের বিপ্লবী কাজ শুরু করে চৌরীচৌরার ঘটনায় ৭০জনের ফাঁসি হয়েছিল।

কিন্তু এ ঘটনায় কোন বিপ্লবী দল জড়িত ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে এই অঞ্চলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং একটি বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা।

বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একদল নির্ভিক যুবক-'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' নামে গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে। বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একই সময়ে সারা ভারতে আক্রমণ চালিয়ে বৃটিশ সরকারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর অস্ত্রাগার ও কোষাগার দখল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

কলকাতায় মেছুয়া বাজারে বোমা তৈরীর কারখানায় রিভল্টগ্রুপের প্রথম সারির নেতারা ধরা পড়ে যান। অনেকের শাস্তি হয়। মেছুয়া বাজার বোমা মামলার অনুসন্ধান করতে গিয়ে বহু বিপ্লবীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়।

লাহোরে হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েনের ভগৎ সিং এবং রাজগুরু ধরা পড়েন। তাদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে বোমা তৈরী করতে গিয়ে আকস্মিক বিস্ফোরণে তাদের কেন্দ্রীয় নেতা ভগবতীচরণ ভোরা মারা যান।

এসব ঘটনায় বৃটিশ পুলিশ বড় রকমের আক্রমণের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে প্রচন্ডভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে। নানা দলের বহু বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে সফল হয়।

মাস্টারদা সূর্য সেন দেখলেন চট্টগ্রামের প্রস্তুতি কাজে লাগাতে হলে আর দেরী করা চলে না। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল সামরিক পোষাক পরিহিত একদল যুবকদের সঙ্গে নিয়ে সূর্য সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করে ক্ষিপ্রগতিতে দখল করেন।

পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় অস্ত্রাগারটি দখলে এল। প্রচুর বন্দুক, কামান ও পিস্তল হাতে

এল। কিন্তু এগুলো বহন করার মত লোক বিপ্লবী দলে ছিল না। অল্পসংখ্যক যুবক নিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছিল। সমাজের কোন স্তরের মানুষের সঙ্গেই বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল না।

বিপ্লবী দলের ৬৫জন যুবক মূল অস্ত্রাগার এবং রেলওয়ের অস্ত্রাগার দুটি দখল করে। টেলিগ্রাফ অফিস পুড়িয়ে দিয়ে, রেল লাইন তুলে দিয়ে চট্টগ্রামকে দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। রাতের মধ্যে ইস্তেহার ছাপিয়ে শহরবাসীকে বিশেষত সমস্ত যুবকদের কাছে এই বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

সব বিপ্লবীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তিন রাউন্ড গুলি ছুড়ে বিপ্লবের জয় ঘোষণা করে। বন্দেমাতরম এবং ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনীতে চট্টগ্রামের আকাশ মুখরিত করে তুলে। শহরবাসী চকিত হয়। বহু যুবক বিপ্লবীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।

মাস্টারদা সূর্য সেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক সরকারের চেয়ারম্যান রূপে নিজের পরিচয় ঘোষণা করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের নিয়েই বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে তখন আরেকটি অস্ত্রাগার ছিল। সেটি দখল নেবার প্রস্তুতি শুরু হয়। ব্যাংক এবং বীমা অফিস দখলের জন্য একদল প্রস্তুত হয়।

বিপ্লবীরা বিভক্ত হয়ে পড়ায় এবং আগে থেকে কোন পরিকল্পনা না থাকায় কাজকর্মে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। চারদিনের মধ্যেই নতুন বৃটিশ বাহিনী এসে বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ শুরু করে। পার্শ্ববর্তী জালালাবাদ পাহাড়ে সরে গিয়ে বিপ্লবীরা আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু বারুদ খাদ্য এবং পানীয় জলের অভাবে যুদ্ধরত বিপ্লবীরা কাতর হয়ে পড়ে। ১১জন বিপ্লবী ঘটনাস্থলে মারা যায়। বৃটিশ বহিনীর মারা যায় ৮০জন। রাতের অন্ধকারে বিপ্লবীরা বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে।

বিভিন্ন অঞ্চলে বার বার বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী সূর্য সেন ধরা পড়েন। অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় বন্দী মাস্টারদার উপর। বিচারের এক প্রহসন করে ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪ সালে বিপ্লবী সূর্য সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মৃত্যুর আগে মাস্টারদার শেষ বাণী হল- "আদর্শ এবং একতার জন্য লড়াই চালিয়ে যাও। আমি তোমাদের জন্য রেখে গেলাম একটি স্বপ্ন। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন। কখনো হতাশ হয়ো না। সাফল্য আমাদের নিশ্চিত।" ঠিক একই আবেদন রেখে গেলেন উত্তরপ্রদেশের বিপ্লবী নেতা ভগৎ সিং।

১৯৩০ সাল ছিল ভারতীয় বিপ্লবীদের অ্যাকসানের বছর। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কয়েকশ বিপ্লবী বৃটিশের গুলিতে এবং ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। অনেকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল খাটার শাস্তি পেলেন।

এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং অহিংস আন্দোলনকারীদের উপর বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতির পর্যালোচনা করে গান্ধীজীর মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি একধাপ এগিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। পাঞ্জাবের শ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপত রায়কে অহিংস আন্দোলনের সময় বৃটিশ পুলিশ নির্মমভাবে লাঠিপেটা করেছিল

যার ফলে এই শ্রদ্ধেয় নেতার মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় সারা দেশ আলোড়িত হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রস্তুতি পর্বে কিছু পিস্তল সংগ্রহ করার জন্য বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিং আগরতলায় এসেছিলেন। অনন্ত সিং নিজের মামাতো ভাই উমেশ সিংহের সহায়তায় মহারাজার অস্ত্রাগার থেকে কয়েকটি পিস্তল সংগ্রহ করেছিলেন। শচীন্দ্র লাল সিংহও এই কাজে সাহায্য করেছিলেন। তখন মহারাজার অস্ত্রাগারের দায়িত্বে ছিলেন উমেশ লাল সিংহের এক মামা। এই ঘটনায় তিনি চাকুরী হারিয়েছিলেন।

অনন্ত সিং-এর প্রভাবেই আগরতলায় যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের রোমান্টিক ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছিল। এছাড়া কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিপ্লবী নেতারা মাঝে মাঝে আগরতলায় এসে যুবকদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের খবরা খবর দিয়ে বৃটিশ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলে ক্রমশঃ বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা হল বৃটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম ঘটনা। এই ঘটনায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে গভীর আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছিল। একটি মহৎ আদর্শের জন্য সংঘবদ্ধ হলে যে কোন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সাফল্য অর্জন করা যায় এরূপ মনোবল সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের শিক্ষিত যুবক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। এর প্রভাব পড়েছিল ত্রিপুরাতেও।

ত্রিপুরায় যেসব মধ্যবিত্তরা রাজ কর্মচারী হিসেবে সব রকম রাজনৈতিক মতাদর্শ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাদের মধ্যেও ক্রমশঃ বৃটিশ বিরোধী চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনেরও প্রভাব পড়তে থাকে। এর ফলে রাজ কর্মচারীদের পরিবার থেকেও শিক্ষিত যুবকেরা সমাজসেবামূলক ক্লাব গঠনের কাজে এগিয়ে আসে।

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে ব্যক্তি হত্যার পরিবর্তে সংগঠিত আক্রমণে বৃটিশ প্রশাসন অচল করা এবং দখল করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন তারই জলন্ত নিদর্শন। পরিকল্পনামত সারা দেশে একই সময়ে সমস্ত অস্ত্রাগার দখল করতে পারলে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হত না।

বিপ্লবী দলের মধ্যে পুলিশের গুপ্তচর ঢুকিয়ে দিয়ে বিপ্লবীদের সব পরিকল্পনা জেনে নেওয়ার সুযোগ পেয়েই বৃটিশ সরকার বার বার রক্ষা পেয়ে গেছে। আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এসব গুপ্তচর বৃত্তিতে এবং পুলিশী আক্রমণে ভারতীয় কর্মচারীরাই সবচেয়ে বেশী দক্ষতা দেখিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে নানা রকম পুরষ্কার এবং প্রমোসনের সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে। স্বদেশ প্রেমের অভাব থাকার ফলেই এসব কাজকে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করার মানসিকতা দেখা যায়নি।

ত্রিপুরায় ক্লাবের আড়ালে বিপ্লবী কাজকর্মে যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত যুবকরাও অনেক সময় ক্ষমা পেয়েছে অথবা অল্প শাস্তি ভোগ করেছে।

সমাজ সংস্কার মূলক বিভিন্ন সংগঠনের আবির্ভাব

১) ছাত্রসংঘ

১৯২৭ সালে অনুশীলন সমিতির গোপন পরামর্শে আগরতলায় নীলু গাঙ্গুলীর পিতা লালবিহারী গাঙ্গুলীর বাড়ীতে একদল ছাত্র মিলিত হয়ে 'ছাত্র সংঘ' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। মূল উদ্যোক্তার নাম জানা যায়নি। ঐ সময় গুপ্ত সমিতির নেতারা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে আড়ালে থেকে বিশ্বস্ত কর্মীদের সাহায্যে সংগঠন গড়া এবং পরিচালনার কাজ করতেন।

এ ভাবে কত মহৎ ব্যক্তি নীরবে নিঃশব্দে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করে গেছেন তার হিসেব কোনদিনই পাওয়া যাবে না। সুপ্ত জাতিকে জাগিয়ে দেবার জন্য কিছু প্রাণ বলিদান করতেই হবে এটাই ছিল বিপ্লবীদের গভীর বিশ্বাস।

প্রথমদিকে যারা ছাত্র সংঘের নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে - শচীন্দ্র লাল সিংহ, উমেশ লাল সিংহ, বীরেন দত্ত, দেব প্রসাদ সেনগুপ্ত, নীলু গাঙ্গুলী, অনন্ত দে, সুকুমার ভৌমিক, প্রভাত রায়, ধীরেন দত্ত, জিতেন দত্ত, কান্তি দেববর্মা, নলিনী সেনগুপ্ত, শচীন দত্ত, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, পবিত্র পাল প্রমুখরা ছিলেন প্রধান। আড়ালে থেকে পরামর্শ দিয়েছেন উপেন্দ্র চন্দ্র লস্কর, রাসমোহন ভট্টাচার্য, নারায়ণ ব্যানার্জী।

সমাজসেবামূলক কাজ, ব্যায়াম, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কাজ প্রকাশ্যে করা হতো। এসব কাজে মহারাজা বীর বিক্রম যুবকদের উৎসাহ দিতেন। এমনকি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে পুরস্কারও বিতরণ করতেন।

সাহসী যুবকদের নিয়ে আলোচনা সভা হতো। বিবেকানন্দের বাণী, আনন্দমঠের কাহিনী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমমূলক গল্প, কবিতা পরিবেশন করে যুবকদের আবেগ এবং প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হত। যারা স্বদেশ প্রেমমূলক গল্প কাহিনী শুনে মুগ্ধ হতো তাদের জন্য পৃথক আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো। জঙ্গলে গিয়ে পাখি শিকার করার ভান করে যুবকদের হাতে পিস্তল তুলে দেওয়া হতো। কয়েকদিন পিস্তলটি ব্যবহার করতে দিয়ে যুবকদের মানসিকতা পরীক্ষা করা হত। বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা তাও দেখা হতো। এভাবে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ভিক যুবকদের বিপ্লবী দলের সদস্য করা হত।

অনুশীলন সমিতির সদস্যরা আগরতলায় পুলিশ অফিসার ধীরেনবাবুর পিস্তলটি চুরি করে অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যের দোকানে ডাকাতি করেন। এই ঘটনায় শচীন দত্ত, কৃষ্ণ চক্রবর্তী (নৃপেন চক্রবর্তীর ভাই) এবং পবিত্র পাল ধরা পড়ে দীর্ঘদিন জেল খাটেন।

জেল থেকে বন্দীদের উদ্ধার করার জন্য প্রভাত রায় নিজের মামাতো বোনের সাহায্যে সোনামুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট মামা ললিত মোহন দেববর্মার পিস্তলটি চুরি করে এনে কান্তি দেববর্মার হাতে দিয়ে অনন্তদেকে সঙ্গে নিয়ে কুমিল্লায় পৌঁছে দেবার নির্দেশ দেন। পথেই তারা ধরা পড়ে যান। প্রভাত রায় মামাতো বোন অমিয়া দেবীকে হুঁশিয়ার থাকার পরামর্শ দিয়ে এক পত্র পাঠান। পুলিশের হাতে চিঠিখানা ধরা পড়ে যায়। ফলে কান্তি দেববর্মা, অনন্ত দে এবং প্রভাত রায়ের জেল

হয়ে যায়।

আগরতলায় একটি মাত্র ডাকাতির ঘটনা ছাড়া অনুশীলন সমিতির আর কোন বড় ধরনের ঘটনার কথা জানা যায়নি। সমিতির সদস্যরা কখনোই রাজা বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেনি।

ভ্রাতৃসংঘ

১৯২৮ সালে অনুশীলন সমিতির একদল সদস্য পৃথক হয়ে এসে 'ভ্রাতৃসংঘ' নামে নতুন একটি সংস্থা গঠন করে। আড়ালে থেকে প্রেরণা দেয় যুগান্তর দলের গুপ্ত সমিতির নেতারা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে তারা আগরতলায় এসে যুবকদের উৎসাহ দিতেন। অনুশীলন দলের ব্যক্তি হত্যার কার্যকলাপ এবং অস্ত্র কেনার জন্য ডাকাতি করার নীতির বিরোধী ছিলেন যুগান্তর দলের নেতারা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হেম ঘোষ এবং ললিত বর্মন ছিলেন প্রধান পরামর্শদাতা।

তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, সুখময় সেনগুপ্ত, ক্ষিরোদ সেন, মণিময় বিশ্বাস, বঙ্কিম চক্রবর্তী, সনৎ দত্ত, হররঞ্জন গাঙ্গুলী, অমূল্যভূষণ মজুমদার প্রমুখরা ছিলেন যুগান্তর দলের নেতা। শচীন্দ্র লাল সিংহ এবং উমেশ লাল সিংহও এই গ্রুপে যোগ দেন। গোপাল চক্রবর্তী নিজ বাড়ী থেকে চুরি করে ৫ হাজার টাকা বিপ্লবী ফাণ্ডে জমা দিয়েছিলেন।

বৃটিশ ভারতে অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সময়মত আশ্রয়দানের ব্যবস্থা করা এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ছিল গোপন কাজ। এই গোপন কাজে ধরা পড়ে গোপাল চক্রবর্তীর ভাই নেপাল চক্রবর্তী কারা বরণ করেন।

প্রকাশ্যে ছাত্র সংঘের মতই সমাজসেবা, লাঠি খেলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিকচর্চা ইত্যাদি কাজ চলতো। 'যুগান্তর' দল বিশ্বাস করতো ব্যক্তি হত্যার সন্ত্রাস নয়, সুসংগঠিত সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা বৃটিশ শক্তিকে হঠান সম্ভব।

মহারাজার বিরুদ্ধে যেহেতু কারো কোন বক্তব্য ছিল না সেজন্য এসব সংস্থার কার্যকলাপে মহারাজার প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতো না। যারা অপরাধমূলক কজে ধরা পড়তো তাদের ব্যক্তিগত কাজের জন্যই শাস্তি পেত। ক্লাবের সদস্য হিসেবে নয় নলিনী সেনগুপ্ত রিভলবার সংগ্রহ করতে গিয়ে ধরা পড়েন। পাঁচ বছর আন্দামানে জেল খেটে মুক্তি পান।

১৯৩০ সালে ভ্রাতৃসংঘের উদ্যোগে উমাকান্ত স্কুলে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে ২৬ শে জানুয়ারী দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করার উদ্দেশ্যে পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রশাসন সতর্ক হয়। কিছু ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয় এবং অনেক অভিভাবককে সাবধান করে দেওয়া হয়। বীনা দত্ত এবং পানু দত্ত নামে দশম শ্রেণীর দুই ছাত্রীকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল।

মাতৃসংঘ

১৯৩০ সালে গান্ধীবাদী আদর্শে 'মাতৃসংঘ' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। তাদেরও কাজ ছিল সমাজসেবা, চরকায় সুতা কাটা, ব্যায়াম, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতার নাম জানা যায়নি। সদস্যদেরও নাম জানা যায়নি। কুমিল্লা অভয় আশ্রম থেকে একজন সংগঠক এসে এই সংস্থা গঠন করেন। উমাকান্ত স্কুলের একজন ছাত্র অশ্বিনী কুমার কপালী এই সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব নেন।

মহিলাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। গান্ধীবাদ প্রচারের জন্য সক্রিয় কর্মীদল সংগ্রহ করা ছিল আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য। সারা ভারতে তখন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের তীব্র আক্রমণের পাশাপাশি গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। আগরতলা থেকে বেশ কিছু যুবক রাজ্যের বাইরে গিয়ে গান্ধীজীর আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় তাদের ছবি ছাপা হয়েছিল।

মিলন সংঘ

বনমালীপুরে কিছু যুবক- 'মিলন সংর্ঘ নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিল। এটি অনুশীলন দলেরই একটি শাখা ছিল। তিন সুকিয়া মেল ট্রেনে স্বদেশী ডাকাতির জন্য এই সংঘের কর্মীবা রাজ পরিবারের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বন্দুক চুরি করে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছিল বলে জানা যায়। এ ঘটনায় কেউ ধরা পড়েনি। প্রকাশ্যে এরাও অন্যান্য ক্লাবের মতই সমাজসেবা ও শরীবচর্চাব বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকতো।

সবুজ সমিতি

প্রভাত রায়ের উদ্যোগে ১৯৩৫ সালে রাজ পরিবারের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি ও ঠাকুর সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে সবুজ সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। রাজ্যের প্রজাগণকে তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করা এবং সমাধারে জন্য সাহায্য করাই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। প্রভাত রয়ের লক্ষ্য ছিল মহারাজার জ্ঞাতসারে গণআন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করা। কিন্তু সদস্যদের উৎসাহের অভাবে উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপুরায় গণআন্দোলনের সূত্রপাত

১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে 'ভাবত শাসন আইন'- পাশ হওযাব আগে ত্রিপবায গণআন্দোলনেব কোন সুযোগ ছিল না। সর্দাব বা বাজ কর্মচাবীদেব বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রজা বিদ্রোহেব ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে বা জনগণেব বিভিন্ন দাবীদাওযা নিয়ে কোন আন্দোলন হযনি।

বিংশ শতাব্দীব শুরুতে বাংলাব সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীবা ত্রিপুবাকে আশ্রযস্থল হিসেবে এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহাব কবেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পব ক্লাবেব আডালে বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহেব উদ্যোগ নেওযা হযেছে। কিন্তু কোন সমযেই বাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে কোন সমালোচনাও কবা হযনি।

কিছু গুপ্ত সমিতিব পবামর্শে গঠিত ক্লাবগুলো থেকে যেসব কর্মীকে বিপ্লবী দলে যুক্ত কবা হযেছিল তাঁবা প্রথম দিকে বৃটিশ বিতাডনেব লক্ষ্যে বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মে অংশগ্রহণ কবলেও বিভিন্ন সমযে জেলখানায গিযে অভিজ্ঞ বাজনৈতিক নেতাদেব কাছে বিভিন্ন দেশেব বিপ্লবী ইতিহাসেব পর্যালোচনা শুনে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ কবে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদেব দুর্বলতা উপলব্ধি কবেন। তাছাডা সাবা ভাবতে তখন গান্ধীজীব আইন অমান্য আন্দোলন এবং কমিউনিস্টদেব নেতৃত্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনেব ব্যাপক প্রভাবেব কথাও জানতে পাবেন।

ফলে জেলখানা থেকে ফিবে এসে অনুশীলন ও যুগান্তব দলেব নেতাবা গান্ধীবাদী এবং মার্কসবাদী এই দুই মতবাদে বিভক্ত হযে যান এবং সন্ত্রাসবাদেব পথ ত্যাগ কবেন।

গান্ধীবাদীবা গণতান্ত্রিক আন্দোলনেব মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে বিশ্বাসী হযে উঠেন। মার্কসবাদীবা তখনো সশস্ত্র বিপ্লবেব মাধ্যমে ক্ষমতা দখল কবে স্বাধীনতা অর্জনেব মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে সন্ত্রাসবাদীদেব সঙ্গে মূল পার্থক্য হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবী গোষ্ঠীব আক্রমণে ব্যক্তি হত্যাব মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি কবে ইংবেজ বিতাডনেব ধাবনায কমিউনিস্টবা বিশ্বাস কবত না।

শ্রমিক-কৃষকেব সংগঠিত গণশক্তিব আক্রমণে বৃটিশ সবকাবেব প্রশাসনকে বিধ্বস্ত কবে দিয়ে ক্ষমতা দখল কবে জনগণেব স্বার্থে সবকাব গঠন কবা এবং গণপ্রশাসন গঠন ও পবিচালনাব মাধ্যমে স্বাধীন বাষ্ট্র গঠন কবাই ছিল কমিউনিস্টদেব মূল লক্ষ্য। তাদেব ভাষায শোষণমুক্ত সমাজ গঠনেব লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক বাষ্ট্র গঠন হল মূল লক্ষ্য।

গান্ধীজী বিশ্বাস কবতেন স্বাধীনতা লাভেব জন্য সশস্ত্র ও হিংস্র আন্দোলনেব প্রযোজন নেই। জনগণকে সচেতন কবে এবং ভযমুক্ত কবে অহিংস গণআন্দোলন সৃষ্টি কবতে পাবলেই বিদেশী শাসন অচল হয়ে যাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপাযে মীমাংসাব মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ কবা যাবে।

ভাবতেব প্রকৃত গণআন্দোলনেব সূত্রপাত হযেছে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ'-আন্দোলনকে

কেন্দ্র করে, যা ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত হয়েছে। এই আন্দোলনেই সর্ব প্রথম সমাজের সর্বস্তরের মানুষ রাজপথে নেমে সমবেতভাবে নিজেদের দাবী ও অধিকার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। শহরে ও গ্রামে সমানভাবে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই স্বদেশী আন্দোলন।

এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিশিষ্ট আইনজীবীরা, সাংবাদিকরা, পত্রিকার সম্পাদকরা, স্কুল কলেজের শিক্ষকগণ, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীগণ, কবি, সাহিত্যিক, শহর ও গ্রামের অভিজাত নাগরিকগণ, ছাত্র এবং যুব সমাজ।

ভারতে এ ধরনের আন্দোলন আর কখনো হয়নি। এর আগে অসংখ্য প্রজা বিদ্রোহ, আদিবাসী বিদ্রোহ এবং সিপাহী বিদ্রোহের মত বড় ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সেগুলিকে গণআন্দোলন বলা যায় না।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সশস্ত্র বিপ্লবীরা এই সুযোগে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মনে আতংক ছড়িয়ে দিয়েছিল। পাঁচ বছর স্বদেশী আন্দোলন চলার পর বৃটিশ সরকার স্বদেশী আন্দোলনের কাছে নতিস্বীকার করে বঙ্গভঙ্গ রদ করেছিল । স্বদেশী আন্দোলনের এই জয় সারা ভারতে গণআন্দোলনের রাজপথ খুলে দিয়েছিল।

১৮৮৫ সালে ভারতে প্রথম রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার আগে ত্রিশ বছর ধরে জমিদার ও শিল্পপতিরা নানা ধরনের সমিতি গঠন করে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছিল। অন্যদিকে দেশের অর্থনীতি ক্রমশঃ দেশের জনগণের স্বার্থ বিরোধী হয়ে উঠেছিল। প্রজাদের মধ্যে নানা রকম অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

এই অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা মোকাবিলা করার জন্যই ভারতীয় জমিদার, বণিক ও শিল্পপতিদের ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ হিসেবে 'জাতীয় কংগ্রেস'-দলের সৃষ্টি হয়েছিল। একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী হিউম সাহেব জাতীয় কংগ্রেস গঠনে বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে লর্ড ডাফরিনের এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, জাতীয় কংগ্রেস যাতে শুধু সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এবং সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার চেষ্টা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য হিউম সাহেবকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

জাতীয় কংগ্রেস দীর্ঘ বিশ বছর যাবত বছরে একবার অধিবেশন করা এবং আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রস্তাবের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে একজন ইংরেজ অফিসার হিউম সাহেবকে কেন মেনে নেওয়া হয়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তীকালে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে ঃ—

"সে যুগে কোন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। এই ধরণের সর্বভারতীয় আন্দোলনে কোন ভারতীয় যদি অগ্রণী হতেন, তাহলে সরকার নিশ্চয়ই তার বিকাশের পথ বন্ধ করে দিতেন। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ এত তীব্র ছিল যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা যদি একজন বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রাজ কর্মচারী না হতেন, তাহলে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে যে কোন উপায়ে এই উদ্যোগ দমন করতেন।"

বাস্তব পরিস্থিতির এই অস্বাভাবিক পরিবেশ অস্বীকার করার উপায় নেই। জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক স্তরে নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে সংগঠন গড়ে তোলে জাতীয় কংগ্রেসই স্বাধীনতা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অধিনায়করূপে জাতীয় কর্তব্য পালন করেছে এবং স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশবাসীর সামনে এক নতুন ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছে।

পরাধীন ভারতে কৃষকদের অবস্থা ছিল আমেরিকার ক্রীতদাসদের চেয়েও খারাপ। ক্রীতদাসদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং সবল ও কর্মক্ষম বাখার জন্য খামার মালিকেরা প্রয়োজনীয় খাদ্য দিত এবং যত্ন নিত। কিন্তু ভারতীয় কৃষকদের চরম দুর্দশায় সামান্য সহানুভূতি দেখাবার জন্যও কেউ ছিল না। বৃটিশ সরকার ভারতীয় কৃষকদেব সব অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এবং জমিদাররা সর্ব রকমে শোষণ ও শাসন করার ক্ষমতা লাভ করেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাকাই তবে তফাৎ খুব সামান্যই দেখতে পাব। ভারতীয় কৃষকরা জমিদারের নায়েব ও কর্মচারীদের দ্বারা যেভাবে অত্যারিত হয়েছে স্বাধীন পার্বত্য ত্রিপুরার প্রজারাও মহারাজার কর্মচারীদের দ্বারা সেভাবেই বিভিন্ন সময়ে অত্যাচারিত ও লুণ্ঠিত হয়েছে। দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার দিক দিয়েও খুব পার্থক্য নেই। তবে ভারতীয় কৃষকরা আধুনিক দুনিয়ার পরিচয় কিছু পরিমাণে পেয়েছে যা থেকে ত্রিপুরার প্রজারা বঞ্চিত ছিল। অনাহার, অর্ধাহার, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চনার যন্ত্রণা ভারতীয় সমতলের কৃষকদের মতই ত্রিপুরার প্রজারাও ভোগ করেছে।

১৯০৫ সালে ভারতে গণআন্দোলনেব সূত্রপাতের ত্রিশ বছর পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলে ত্রিপুরায় প্রথম গণআন্দোলনের সূচনা হয়। কিন্তু যারা নেতৃত্ব দিতে পারতেন তাদের প্রায় সবাই তখন জেলে।

১৯৩৮ সালের বিভিন্ন সময়ে মুক্তি পেয়ে রাজ্যে এসে নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন বিপ্লবী নেতারা। সকলের রাজনৈতিক চিন্তা ধারায়ও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে শুরু হয়েছিল প্রজা আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ধারা। চারদিকে তখন ছড়িয়ে পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া।

মহারাজা বীর বিক্রম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগেই তিনবার ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশ ভ্রমণ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেশে ফিরেছেন। এই সময় প্রজা কল্যাণমূলক সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে উঠেন।

এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাতে উদ্যোগী হলেন প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা পরে জেল থেকে ফিরে এসে যোগ দিলেন বীরেন দত্ত।

কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সৃষ্টি হবার ফলে নেতাদের মধ্যে কোন ঐক্য ছিল না। যে সময় প্রজাদের সচেতন ও সংগঠিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস প্রয়োজন ছিল, তখনই দেখা দিয়েছিল তীব্র মতভেদ এবং নেতৃত্ব দখলের প্রতিযোগিতা। যার ফলে একই কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি হল দুটি ফ্রন্ট। একদিকে গান্ধীবাদীরা অন্যদিকে বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসীরা।

এই প্রতিযোগিতার ফলে দুই পক্ষই উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল। রাজ্য জুড়ে প্রজাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা এবং প্রকৃত গণআন্দোলন সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। দেড় বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় গণআন্দোলনের সব নেতারাই বন্দী হয়ে বিভিন্ন জেলে আটক হয়ে যান এবং সারা রাজ্যে সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সভা-মিছিল নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

এ রাজ্যে গণআন্দোলনের সূত্রপাতেই নেতাদের মধ্যে যে অনৈক্য এবং তীব্র মতভেদ লক্ষ্য করা গেছে তা সমগ্র ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে যেমন গণআন্দোলনের পদ্ধতি এবং কর্মসূচী নিয়ে তীব্র মতভেদ ছিল, তেমনি বামপন্থীদের মধ্যেও ছিল নানা রকম দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতে গণআন্দোলনেব পদ্ধতি এবং কর্মসূচী সম্পর্কে অধিকাংশ নেতারই বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না এবং মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল না। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা এবং জাত-পাতের সংস্কার থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেননি। সব দলের মধ্যেই এই দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেছে।

কমিউনিষ্টরাও শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রেণী বিদ্বেষের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। অন্যান্য বামপন্থীদের মধ্যেও বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাত ছিল। ফলে সামগ্রিকভাবে জাতীয় বা স্থানীয় স্তরেব গণআন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস সৃষ্টি হযনি। যার সুযোগে বৃটিশ সবকারেব দমননীতি ক্রমাগত বৃদ্ধি করে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ভারতের গণআন্দোলনের ধারাগুলো একের পর এক ত্রিপুরা রাজ্যেও প্রভাব ফেলেছে। শুধু সময়ের ব্যবধান ছিল মাঝখানে। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ ত্রিপুরায় এসেছে ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ এসেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বে। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ঢেউ এসেছে স্বাধীনতার পরে।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আর্বিভাব ঘটেছিল। কিন্তু তা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। ত্রিপুবার দুটি প্রধান বাজনৈতিক দল জাতীয কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শে বিশ্বাসী বলেই ত্রিপুরা বাজ্যে সাম্প্রদায়িক শক্তি শিকড় ছড়াতে পারেনি।

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারা নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এর জন্য দায়ী যথাসময়ে শত শত বছর ধরে বঞ্চিত উপজাতি জনগোষ্ঠীব মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধাবা সঞ্চাবিত কবার কাজে ব্যর্থতা।

দ্রুত শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থায়ী ধারা সৃষ্টি কবতে পাবলেই জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার বিকাশ ঘটবে এবং সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধাবার অবলুপ্তি ঘটবে। সাম্প্রতিককালে স্বাধীন ত্রিপুরার অবাস্তব দাবী বাতিল হয়েছে মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদীরা এক সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে আসবে এটা আশা কার যায়।

ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি

ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে নানা রকম মতভেদ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই সমিতির ঐতিহাসিক ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারেননি।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রভাত রায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় প্রধানত প্রভাত রায়ের উদ্যোগেই **জনমঙ্গল সমিতির** জন্ম হয়েছিল। কারণ তিনিই সকলের আগে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। বীরেন দত্ত আগষ্ট ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত জেলে ছিলেন। ১৮ই আগষ্ট মুক্তি পেয়েছিলেন। জেলে গিয়ে ছিলেন অনুশীলন সমিতির নেতা হিসেবে কিন্তু মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছিলেন একজন কমিউনিষ্ট হয়ে। অবশ্য তখন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এ রাজ্যের একমাত্র কমিউনিষ্ট। দেব প্রসাদ সেনগুপ্ত অনুশীলন সমিতির নেতা হিসেবে এক ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুক্তি পেয়ে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে যোগ দেন।

স্বাধীনতার আগে ত্রিপুরায় প্রকাশ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি করা সম্ভব ছিল না। কাজেই বীরেন দত্ত অত্যন্ত গোপনে উৎসাহী যুবকদের সঙ্গে মিশে সমাজ বদলের নানা কাহিনী শুনিয়ে কমিউনিষ্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৪৬ সলের আগে একটি গোপন কমিটি গঠন করাও সম্ভব হয়নি।

প্রভাত রায় কুমিল্লা কলেজে পড়াব সময় অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। মামার পিস্তল চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত হয়ে কারাবরণ করেন। জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সন্ত্রাসবাদী পথ ছেড়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হবার জন্য উদ্যোগী হন। সবুজ সমিতির মাধ্যমে গণভিত্তি তৈরী করার জন্য সমাজসেবামূলক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘরে চাঁদা ও চাউল সংগ্রহ করা, অসুস্থ রোগীর সেবা যত্ন করা, সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়ে জনসংযোগ রক্ষা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্দেশ অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার গঠন বিষয়ে দেশীয় রাজাদের সম্মেলনের এক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম রাজ্যে শাসন সংস্কারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য একটি সংবিধান রচনার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে প্রজামন্ডল গঠনের জন্য উদ্যোগী হন।

প্রভাত রায় এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে **জনমঙ্গল সমিতি** নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। শহরের সব স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই সংগঠনে যুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চালানো হয়। যে কোন উপায়ে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও নতুন শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যাতে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই কাজ শুরু হয়।

পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা ছিলেন উদার প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ। রাজ পরিবারেও তিনি ছিলেন জনপ্রিয় এবং বিশ্বস্ত। তাই পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে সামনে রেখে জনমঙ্গল সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কয়েক দফা আলোচনার পর ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে দুর্গা বাড়ীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে জমঙ্গল সমিতি গঠন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রজগোপাল ব্যানার্জী।

মহারাজার ইচ্ছাকে সফল রূপ দেবার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করা হচ্ছে বলে প্রচার করার ফলে উক্ত সভায় পুলিশ কমিশনার, চীপ জাজ এবং রেণু সাহেবের মত ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। শহরের ছাত্র-যুবক ও বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিরা অতি উৎসাহ নিয়ে এই সভায় যোগ দেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এই প্রথম প্রস্তুতি সভায় জনগণের উপস্থিতি লক্ষ্য করে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ এবং আশা সঞ্চারিত হয়।

এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে সভাপতি এবং প্রভাত রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। **ত্রিপুরা রাজ্যে এটাই হল প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মঞ্চ। ঐ সময় পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল গঠন সম্ভব ছিল না।**

আত্মরক্ষার আবরণ হিসেবে মহারাজার কর্তৃত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সভার শুরুতে এবং শেষে জয় মহারাজার জয় ধ্বনি দিতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত ঃ রাজা বা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা না করে রাজ কর্মচারীদের আচরণ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। তৃতীয়ত ঃ রাজ্যের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের উপর ব্যাখ্যা ও আলোচনা দাবী করা হয়েছিল। এসব দাবী নিয়ে গণ প্রচারে
যাওয়া এবং জনগণকে সংগঠিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই কৈলাসহর, ধর্মনগর, কমলপুর, উদয়পুর, বিলোনীয়া এবং সাব্রুম মহকুমায় জনমঙ্গল সমিতির শাখা সংগঠন গড়ে উঠল। কিন্তু নেতাদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, নেতৃত্ব দখলের আকাংক্ষা এবং নানা প্রকার মতাদর্শের নীতিগত জটিল প্রশ্ন তোলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথকে জটিল করে তোলা হল। রাজ্যের প্রথম সারির নেতারা যখন অনুশীলন সমিতির সদস্য হিসেবে একই লক্ষ্যে কাজ করেছেন, তখন পরস্পরের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক ছিল, জেল থেকে মুক্ত হবার পর নানা রকম মতাদর্শের সংঘাতে সেই সুসম্পর্ক নানা রকম মতভেদে রূপান্তরিত হল।

বীরেন দত্ত কমিউনিষ্ট হয়ে জেল থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু প্রভাত রায় বামপন্থী মনোভাবাপন্ন হলেও কমিউনিষ্ট মতবাদকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। অন্যদিকে শচীন্দ্র লাল সিংহ গান্ধীবাদী হয়ে জেল থেকে ফিরে আসার পর নিজস্ব অনুগামীদের নিয়ে পৃথক সংস্থা গড়তে উদ্যোগী হলেন।

প্রভাত রায়ের চেষ্টা ছিল সবাই মিলে যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচার ও সংগঠন গড়ে গণআন্দোলন সৃষ্টি করা যায় তার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ সৃষ্টি করা।

কিন্তু শচীন্দ্র লাল সিংহ জনমঙ্গল সমিতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে রাজী হলেন না। বরং জনমঙ্গল সমিতির নেতাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে প্রচার ও বিবৃতি দিতে থাকেন।

জনমঙ্গল সমিতির নেতারা ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় কমিটির এক অধিবেশন ডেকে নতুন কর্মসূচী এবং প্রচার পন্থা নির্ধারনের ব্যবস্থা করেন। শহরের নেতারা পাহাড়ী ভাষায় কথা বলতে বা বুঝতে অপারগ হওয়ায় গ্রামীণ সংগঠন গড়ার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেন বংশী ঠাকুর এবং প্রভাত রায়। মহকুমাগুলোর সঙ্গে তখন যোগাযোগের কোন রাস্তা ছিল না। কোন প্রকার যানবাহনও ছিল না। কাজেই দ্রুত গতিতে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হল।

এ সময় বীরেন দত্তের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রচারপত্র রচনায় এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে খুবই অগ্রণী ভূমিকা নিলেন। এসব কাজে খুবই দক্ষতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু বিভিন্ন মহকুমায় নেতাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না।

প্রাথমিক স্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা কারোরই ছিল না। বীরেন দত্ত জেলখানায় রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। 'প্রজার কথা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। জনমঙ্গল সমিতির উদ্দেশ্যে ও কার্যাবলী প্রচারের জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হয়। সাবা রাজ্যে সংগঠনের বিস্তার ও পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো সবই বীরেন দত্তের অবদান।

কিন্তু বীরেন দত্তের প্রধান দোষ ছিল শ্রেণী সংগ্রামের গোঁড়ামীর উপর অতিরিক্ত জোর দিতেন। বাস্তব পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে রাজী ছিলেন না। অসময়ে অগ্রিম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতেন। জরুরী প্রয়োজনের সময় কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ অন্তর্ধান করতেন।

বীরেন দত্তের বামপন্থী চিন্তাধারার সঙ্গে অনেকেই সহমত পোষণ করতেন না। ফলে গণসংযোগ রক্ষা করা ও বিস্তার ঘটানো অনেক সময় কঠিন হয়েছে। বীরেন দত্ত বাস্তববাদী হলে জনমঙ্গল সমিতি অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারতো।

বীরেন দত্তের সাংগঠনিক চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রখর। তিনি সর্বদাই বলতেন গণ উচ্ছ্বাসের উপর নির্ভর না করে ক্যাডার সৃষ্টির দিকে জোর দিতে হবে। অনভিজ্ঞতার কারণে এদিকটা অবহেলিত হয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাদের চিন্তা চেতনার স্তর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় দুইশ বছর পেছনে ছিল। নেতারা এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করেননি। ফলে গণআন্দোলনের সেই স্তরে যে সংযম দরকার ছিল তার অভাব দেখা দিয়েছিল।

এ কারণেই আন্দোলনের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা যথা সময়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি জনমঙ্গল সমিতির অস্তিত্ব রক্ষার মত কাজ করা যায় তবে সেটাই হবে ভবিষ্যতে গণআন্দোলন সৃষ্টি করার নৈতিক শক্তি।

কিন্তু নেতাদের ধৈর্যের অভাব এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে হঠকারী সিদ্ধান্ত ও জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলে মাত্র দেড় বছরের কার্যকালের মধ্যেই প্রায় সব নেতাই গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের সর্বত্র সভা ও মিছিলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল। কাজেই নতুন কোন নেতৃত্বের পক্ষে সংগঠন ধরে রাখা সম্ভব হল না।

গণআন্দোলনের উপব দমননীতি চললে সারা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা, অস্থিরতা এবং বিক্ষোভ দেখা দেবে বলে যেসব নেতারা আশা করেছিলেন, বাস্তবে তা ঘটল না।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজারা ছিলেন রাজভক্ত একথা অনেকের মাথায় ছিল না। তাছাড়া আন্দোলন পরিচালনাব জন্য বিকল্প কোন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হয়নি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীবা সর্বদাই এসব আন্দোলন থেকে দূরে থেকেছেন। ছাত্র-যুবকদের মধ্যেও কোন সংগঠন ছিল না।

ত্রিপুরায গণআন্দোলনের সূত্রপাতে জনজাগরণের একটা বিরাট ঢেউ সৃষ্টি করে ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি একটা ঐতিহাসিক দাযিত্ব পালন করেছিল। জঙ্গী আন্দোলনেব প্রচেষ্টায় রাজবোষে সব নেতাবা বন্দী হওযায এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাবণে এই আন্দোলনেব অবলুপ্তি ঘটেছিল। আন্দোলনের পুবোভোগে ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর, বীরেন দত্ত, সুকুমার ভৌমিক, কীর্তি সিংহ, নিমাই দেববর্মা।

প্রভাত বায়ের মতে অল্প সময়ের মধ্যে জনমঙ্গল সমিতি যা কবেছিল তাব গুরুত্ব কম নয়। যা কবা সম্ভব হযেছিল তা হল ১) জনগণেব ভয দূর করা, ২) জনগণেব দাবী দাওযা আদায়েব অধিকাব সম্পর্কে সচেতন করা, ৩) অন্যায অবিচাবের বিরুদ্ধে প্রতিবোধেব ভাব জাগিযে দেওযা, ৪) গ্রাম্য সালিশী বিচারের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসাব ব্যবস্থা কবা। সেই সময়ে শত শত বছর ধবে বঞ্চিত ও অসহায় উপজাতি সমাজে মহাবাজাব কাছে অভাব অভিযোগেব প্রতিকার দাবী করাব সাহস জুগিযে দেওযাই ছিল একটা বৈপ্লবিক কাজ।

বীরেন দত্ত

প্রভাত রায
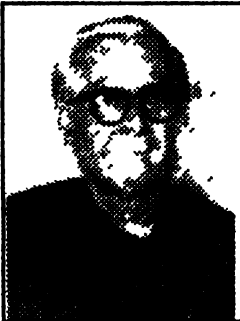
বংশী ঠাকুর

গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শচীন্দ্র লাল সিংহের নেতৃত্বে **'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ'**-নামে একটি আন্দোলন কমিটি গঠিত হয়। গান্ধীবাদ এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী নেতা ও কর্মীরা এই সংগঠনে যুক্ত হন। প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে ছিলেন - শচীন্দ্র লাল সিংহ, উমেশ লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, আশুতোষ মুখার্জী, নিরোদ ভট্টাচার্য, নীলু মুখার্জী, হরিগঙ্গা বসাক, ক্ষিরোদ সেন, ত্রিপুর সেন প্রমুখরা।

উমেশ লাল সিংহকে সভাপতি করে গণপরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তন, প্রজাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার প্রতিকার, দুর্নীতি দূরীকরণ, অন্যায় অবিচারের সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবী আদায়ের জন্য গণ সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

তাছাড়া গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে নৈশ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, পাঠাগার স্থাপন করা, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা যত্ন করা, মৃতের সৎকার করা ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে **'ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ' নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনীর** অনুমোদন লাভ করে। সর্বভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জহর লাল নেহেরু। সেই বছরই সর্বভারতীয় ষষ্ঠ সম্মেলনে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের পক্ষ থেকে দুইজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সম্মেলনে সারা ভারতের দেশীয় রাজ্য থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দেন এবং প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ দেন। এই সম্মেলন থেকেই দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে প্রজাগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এক কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ইতিপূর্বে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, দেশীয় রাজ্যগুলোতে কংগ্রেস দল গঠন করা হবে না, সমাজসেবামূলক এবং গঠনমুলক সংগঠন তৈরী করে জনগণের মধ্যে কাজ করা হবে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলোতে সমাজসেবামূলক কাজে নিযুক্ত কর্মীদের উপর দমননীতি চলার ফলে প্রচন্ড ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী নেতৃবৃন্দকে সংযত ও বৈধ উপায়ে প্রজা আন্দোলন চালিয়ে যাবার উপদেশ দেন।

গণপরিষদের অন্যতম নেতা তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন, সে যুগে আন্দোলনের কথা শুনলেই গ্রামের লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়ে যেত। গ্রামে ২৫টি বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে ঘরোয়া সভায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালে ৫জনকে উপস্থিত করাও কঠিন হতো। এসব ঘরোয়া মিটিংও করতে হতো গভীর রাতে গোপনীয়তা রক্ষা করে। সভায় উপস্থিতি কম হলেও যারা আসত তারা সব বাড়ীতে সভায় আলোচনায় বিষয় জানিয়ে দিত। এভাবে খুব ধীর গতিতে মানুষের ভয় ভঙ্গানোর কাজ চলতো। ক্রমে ক্রমে গণচেতনার বিকাশ ঘটতো।

কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে রাজ্যের অগণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং প্রজাদের সমস্যা ব্যাখ্যা

করে নিয়মিত স্মারকলিপি পেশ করা হতো এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচারের জন্য পাঠানো হতো। এসব কাজে হরিগঙ্গা বসাক ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং উৎসাহী। জহরলাল নেহের এবং গান্ধীজী এসব স্মারকলিপি মনোযোগ দিয়ে পড়তেন, তা তাদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তর এবং পরমার্শ থেকে জানা যেত। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি হতো।

অল্পদিনের মধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের অধিকাংশ নেতাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয় অথবা রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হয়। হরিগঙ্গা বসাক ঢাকায় গিয়ে বৃটিশ পুলিসের হাতে বন্দী হন। সেখানেই জেলখানায় মৃত্যুবরণ করেন। উমেশবাবু কলকাতায় গিয়ে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে যোগ দেন। শচীন্দ্র লাল সিংহ চাকলা রোশনাবাদে কংগ্রেস সংগঠন তৈরীর কাজে মনোযোগ দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর কোন রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই রাজ্যে থেকে কোন প্রকার আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। ১৯৪২ সালে আখাউড়া অঞ্চলে 'ভারতছাড়' আন্দোলন সংগঠিত করে ১০জন অনুগামীসহ শচীন্দ্র লাল সিংহ বৃটিশ পুলিশের হাতে বন্দী হন। প্রত্যেকের ২/৩ বছর করে জেল হয়।

গণপরিষদের উদ্যোগে প্রধান প্রকাশ্য আন্দোলন হয়েছিল আগরতলায় রামনগর অঞ্চলের ৫০০ মুসলিম প্রজার উচ্ছেদ নোটিশ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। ঐ সময় রাজার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা রীতিমত একটা বৈপ্লবিক কাজ। আজকের গণতান্ত্রিক পরিবেশে ঐ ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। রাজতন্ত্রে এরূপ কাজ রাজদ্রোহ বলে গণ্য হত। কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা ছিল এরকম অপরাধের জন্য। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এবং ভারতের গণআন্দোলনের পরিবেশ এমন স্তরে ছিল যে মহারাজার পক্ষে কঠিন শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। এজন্যই জেল ও বহিষ্কারের মধ্যেই শাস্তি সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৩৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ যে দাবীপত্র পেশ করেছিল তা ছাপিয়ে প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

রাজন্য শাসনের যুগে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার ও শাসনতন্ত্র গঠনের এটাই ছিল প্রথম দলিল। সেদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই দাবীপত্রে ২০টি দাবী ছিল। সংক্ষেপে দাবীগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ-

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ ঃ-

১) ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের সর্ব প্রকার অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতনের প্রতিকারের জন্য এবং অবর্ণনীয় দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবিলম্বে প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের দাবী করছে।

২) ত্রিপুরা রাজ্যবাসী প্রজাগণ সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচন প্রথা দাবী করছে।

৩) গ্রামে গ্রামে মহাজনী প্রথার উচ্ছেদ করে অল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য কৃষি ব্যাংক স্থাপনের দাবী করছে।

৪) নিরক্ষরতা দূর করার জন্য অবিলম্বে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনে দাবী করছে।

৫) উপযুক্ত পানীয় জলের অভাবে কঠিন রোগে সাধারণ প্রজার অকাল মৃত্যু রোধ করার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা দাবী করছে।

৬) উপযুক্ত রাস্তাঘাট না থাকায় কৃষকেরা কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে না। তাই প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্মাণের জন্য দাবী করছে।

৭) রাজ্যের কৃষিপণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করার ফলে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই কৃষিপণ্যের উপর শুল্ক রহিত করার দাবী করছে।

৮) রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসালয় স্থাপন ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের দাবী করছে।

৯) বনকর আইন সংশোধন করে প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করার এবং হিংস্র জন্তুর হত্যার অধিকার দাবী করেছে।

১০) তাইতুং প্রথা অবিলম্বে বাতিল করার দাবী করছে।

১১) বকেয়া খাজনা মকুব এবং নজরানা প্রথা বাতিলের দাবী জানাচ্ছে।

১২) খাজনার দায়ে কৃষকের হাল - গরু-জমি ক্রোক করার বিধি বাতিল করার দাবী করছে৭ .

১৩) মহাজনের ঋণ বা খাজনার দায়ে যেসব জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলো জমির মালিককে ফিরিয়ে দেবার দাবী জানাচ্ছে।

১৪) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি এবং আগরতলা-আখাউড়া রাস্তার একচেটিয়া ইজারাদানের প্রথা বাতিলের দাবী করছে।

১৫) সমগ্র রাজ্যে একটিও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় না থাকায় নারী শিক্ষার সুযোগ মিলছে না। অবিলম্বে বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী করছে।

১৬) শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে শ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য আইন তৈরী করার দাবী করছে।

১৭) বিপদাপন্ন প্রজাদের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের পথ বন্ধ করতে দুর্নীতি বিরোধী কমিটি গঠনের দাবী করছে।

১৮) বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্যে উপযুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে।

১৯) রাজ্যের মধ্যে সভা-সমিতি মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দাবী করছে।

২০) প্রেসের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি সকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্যও ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ দাবী করছে।

উপরোক্ত দাবীগুলো সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের একটি দলিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বলেই এরূপ দাবী উত্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া মহারাজা

নিজেই ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে ১৯৩৫ সালের আইনের ভিত্তিতে শাসন সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং ১৯৩৮ সালে গ্রাম মন্ডলী স্থাপনের কাজ শুরু করেন।

এই দাবীপত্র যারা পেশ করেছিলেন তারাই পরবর্তী কালে প্রায় ত্রিশ বছর ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভারত সরকারের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ দাবীই পূরণ করতে পারেননি।

বর্তমানে বিরোধী দলে থেকেও প্রধানত এসব দাবীর ভিত্তিতেই গণআন্দোলন করতে হচ্ছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, অবৈতনিক চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বেকার সমস্যার সমাধান ঋণ মকুব ইত্যাদি দাবীগুলো ৬৫ বছর পরেও সমান গুরুত্বপূর্ণ দাবী রূপেই গণ্য হচ্ছে।

শচীন্দ্র লাল সিংহ
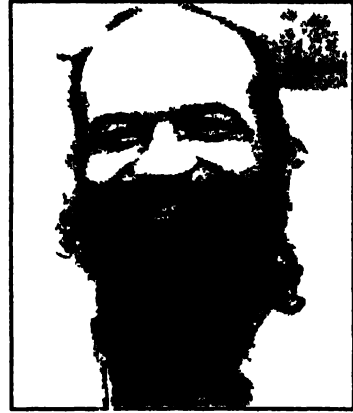
সুখময় সেনগুপ্ত

উমেশ লাল সিংহ

তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারত জুড়ে শুরু হয়েছিল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের শেষ অধ্যায়। গণআন্দোলনের বিচিত্র ধারায় বৃটিশ সরকার আতংকিত হয়ে উঠেছিল। দমননীতি চালিয়ে গণআন্দোলন স্তব্ধ করা যাবে কি না এ বিষয়ে বৃটিশ সরকার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে ইংলন্ডেও চলছিল পার্লামেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার এক বছর আগে ত্রিপুরায় গান্ধীবাদীরা এবং বামপন্থীরা জনমঙ্গল ও গণপরিষদ নামে পৃথক দুটি মঞ্চে বিভক্ত হয়ে গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে ছিলেন। ভারতের দেশীয় রাজাদের সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে ফিরে এসে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এর ফলেই রাজন্য যুগের ইতিহাসে প্রথম গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটানো সম্ভব হয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ আন্দোলনের যে কর্মসূচী তৈরী করেছিল তাতে রাজ্যের প্রজাদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী ছিল অন্যতম । তাদের আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হযনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার ফলে আন্দোলনের সব নেতারাই জেলে বন্দী অথবা রাজ্য থেকে নির্বাসিত হন। সারা রাজ্যে সব রকম সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ হয়।

ইতিমধ্যে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য তিনবার ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রজাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না ঘটালে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। ইংলন্ডের মত রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিলন ঘটিয়ে একটি উন্নত রাজ্য গঠনের স্বপ্ন মহারাজার মধ্যে ছিল, বিদ্যাপত্তনের পরিকল্পনায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

এই রকম পরিবেশে কয়েকজন কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন বিপ্লবী নেতা গণভিত্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী পি সি যোশী বীরেন দত্তকে এরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন। নিরক্ষর উপজাতি সমাজে রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না বলেও সতর্ক করে দেন। দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তের স্মৃতি কথা থেকে জানা যায়, সে সময় বীরেন দত্ত, অনন্ত দে এবং নন্দিনী সেনগুপ্ত, বঙ্কিম চক্রবর্তী, জিতু দত্ত, উষা দেববর্মা এবং নিমাই দেববর্মাকে নিয়ে একটি ছোট্ট কমিউনিষ্ট গ্রুপ গোপনে কাজ শুরু করেছিল। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে কানু সেনগুপ্ত, বেণু সেনগুপ্ত, রবি দত্ত ও গৌরাঙ্গ দেববর্মা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিল। আনুষ্ঠানিক কোন পার্টি সেল তখনও গঠন করা সম্ভব হয়নি।

শহরে লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। ঠাকুর-কর্তাদের দাপট ছিল প্রচন্ড। গ্রামীণ উপজাতি

সমাজে প্রবেশ করার প্রধান বাধা ছিল ভাষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। বীরেন দত্ত উমাকান্ত একাডেমীর ত্রিপুর বোর্ডিং-এ নিয়মিত যাতায়াত করে সোভিয়েত ইউনিয়নে নিরক্ষর উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে কয়েকজন উপজাতি যুবককে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলতে সক্ষম হন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অঘোর দেববর্মা এবং নীলমণি দেববর্মা। এই সময় বীরেন দত্তই ছিলেন একমাত্র সক্রিয় কর্মী। প্রতিদিন ঘুরে ঘুরে সমর্থক খুঁজে বেড়ানই ছিল বীরেন দত্তের প্রধান কাজ।

বিপ্লবী নেতারা কে কখন জেল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন তার কোন সঠিক তারিখ জানা যায়নি। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে এসব নিয়ে লেখালেখির কেউ চিন্তাভাবনা করেছিলেন বলেও মনে হয় না।

আগরতলা বইমেলাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকাশকের অনুরোধে অনেকে স্মৃতি নির্ভর আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। সকলেই স্বীকার করেছেন যে স্মৃতি নির্ভর ইতিহাসে সব তথ্য নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়। তবে ইতিহাসের কিছু উপাদান অবশ্যই পাওযা যাবে। ক্রমে ক্রমে অনেকের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়েছে। স্মৃতিনির্ভর বলেই বিভিন্ন জনের স্মৃতিকথায় কিছু কিছু বিভ্রান্তিকর তথ্যও যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ৪০/৫০ বছরেব ব্যবধানে নতুন পরিস্থিতি ও নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন কথাও যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ঘটে গেছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরাট পরিবর্তন।

এসব কারণেই দেখা যায় বামপন্থী নেতারা জনশিক্ষা আন্দোলনকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তড়িৎমোহন দাশগুপ্তের মত নেতারা ততটা গুরুত্ব দেননি। আবার বামপন্থী নেতাদের মধ্যেও প্রত্যেকে নিজের ভূমিকাকে অধিকতর উজ্জ্বল করে দেখাবার চেষ্টায় বেশী মনোযোগী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক তথ্যকে বিকৃত করেছেন বা চেপে গেছেন। সকলেব স্মৃতিকথা মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশেষ বিশেষ দিকগুলো অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে।

জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। সকলেই ১১ পৌষ ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ২৭ শে ডিসেম্বর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ তারিখটিকে জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে মেনে নিয়েছেন। বর্তমানে এই দিনে প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হচ্ছে। দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় হেমন্ত দেববর্মার বাড়ীতে জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল। এ বিষয়েও সকলে একমত হয়েছেন। আরও একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন যে বীরেন দত্তই ছিলেন জনশিক্ষা সমিতির মূল প্রেরণাদাতা। তিনিই আড়ালে থেকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে জনশিক্ষা সমিতির কাজকর্ম পবিচালনায সাহায্য করেছিলেন।

জনশিক্ষা সমিতি একটি অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত হয়েছিল এ বিষয়েও কোন দ্বিমত নেই। এই কারণেই বীরেন দত্ত সহ শহরের কোন বাঙ্গালী বা উপজাতি নেতাকেই জনশিক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। শুধুমাত্র গ্রামীণ উপজাতি শিক্ষিত যুবকদের নিয়েই জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল।

কিন্তু জনশিক্ষা সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা কে ছিলেন তা নিয়ে দশরথ দেবের সঙ্গে

অন্যান্য নেতাদের সুস্পষ্ট মতভেদ দেখা যায়। দশরথ দেব বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং স্মৃতিকথায় বলেছেন সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা এবং দশরথ দেব প্রমুখের নেতৃত্বে জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। অঘোর দেববর্মার নামটি তিনি উল্লেখই করেননি। খুব সম্ভবত এর মূল কারণ হল যখন এসব বিষয়ে লেখা-লেখি শুরু হয়েছে তখন অঘোর দেববর্মা অন্য দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাই অঘোর দেববর্মার নাম এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে ।

জনশিক্ষা সমিতি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত হলেও পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সব নেতারাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সি পি আই দলে যোগ দিয়েছিলেন। আবার ১৯৬৪ সালে রাজনৈতিক মতভেদের কারণে সি পি আই ভেঙ্গে যখন সি পি এম নামে নতুন দল গঠন করা হল তখন দশরথ দেবের অনুগামীরা সি পি এম দলে যোগ দিলেন এবং অঘোর দেববর্মার অনুগামীরা সি পি আই দলে থেকে গেলেন। দুই ব্যক্তিত্বের সংঘাত তখন থেকেই শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সুধন্বা দেববর্মা এবং ডাঃ নীলমণি দেববর্মা তাদেব বিভিন্ন প্রবন্ধে স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, অঘোর দেববর্মা বলিষ্ঠ উদ্যোগ না নিলে হয়তো জনশিক্ষা সমীতির জন্মই হতো না।

বীরেন দত্তের প্রেরণায় অঘোর দেববর্মা কমিউনিষ্ট মতাদর্শে সর্ব প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীব উন্নয়নের কাহিনী শুনে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অঘোব দেববর্মা তখন উমাকান্ত একাডেমীব দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ছিল ২৪ বছর। ডাঃ নীলমণি দেববর্মা ছিলেন অঘোর দেববর্মার সহ পাঠি। ক্লাশে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা দেখে অঘোর দেববর্মাকে ক্লাশ মনিটার কবা হয়েছিল।

তখনকার সময়ে ত্রিপুরা বোর্ডিং-এ ছাত্র সংখ্যা ছিল খুবই কম। গ্রামের ছেলেরা মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো। কাবণ একই ক্লাশে দুবার ফেল করলে বোর্ডিং থেকে বের করে দেওয়া হতো। তাছাড়া যুদ্ধের কারণে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায মাসিক পাঁচ টাকা স্টাইপেন্ড দিয়ে বোর্ডিং-এর খরচ চালানো সম্ভব হতো না।

শহরের ঠাকুব-কর্তা পবিবারের ছেলেদের সঙ্গে গ্রামের ছেলেদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠার সুযোগ ছিল না। বোর্ডিং-এর সুপার বংশীঠাকুর গ্রামের ছেলেদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জনমঙ্গল সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে প্রভাত রায়ের সঙ্গে বংশী ঠাকুরও গ্রেপ্তার হয়ে যান। তারপর তিনি আর চাকুরীতে যোগ দেননি।

গ্রামীণ ত্রিপুরীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে খোয়াই মহকুমার রামকুমাব ঠাকুর এবং সদর দক্ষিণ এলাকার ওয়াখিরায় ঠাকুর উমাকান্ত একাডেমীর পাশে দু'টি বোর্ডিং স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুটি বোর্ডিং এক হয়ে যায়। এ দু'জন সর্দারই মহারাজাব খুব ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় পাত্র ছিলেন। বোর্ডিং-এ নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে গ্রামীণ ত্রিপুরী ছাত্রদের বোর্ডিং-এ আনার চেষ্টা করতেন। ভাল ছাত্রদের জন্য নানা ধরনের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করতেন। তাদের লক্ষ্য ছিল ত্রিপুরার উপজাতি যুবকেরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে রাজ্যের রাজকর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

বোর্ডিং-এর সুপার হিসেবে বংশীঠাকুর সর্বদাই ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব

নিয়ে আলোচনা করতেন। বংশীঠাকুর বীরেন দত্তের খুব ঘনিষ্ট ছিলেন কিন্তু কমিউনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তখনকার ত্রিপুরায় বংশীঠাকুর এবং প্রভাত রায় ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। তারা দুজনেই কমিউনিষ্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন। এক সঙ্গে বহু আন্দোলন করেছেন। কিন্তু কমিউনিষ্টদের কর্মসূচী গ্রহণ করতে রাজী হননি।

এই রকম পরিবেশে উমাকান্ত একাডেমীতে একদিন জনশিক্ষা বিষয়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়। সেদিনই অঘোর দেববর্মা এবং নীলমণি দেববর্মা কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য একটা সমিতি গঠন করার উদ্দেশ্যে এক সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেন। ঐ সময় আগরতলা শহরে সভা করার মত সঙ্গতি এবং সুযোগ ছিল না। প্রাক্তন ছাত্রদের এক তালিকা তৈরী করে ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। পাশেই কৃষি দপ্তরে কর্মরত হেমন্ত দেববর্মার কাছে প্রস্তাবটি দেওয়া মাত্র তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে, দুর্গাচৌধুরী পাড়ার নিজ বাড়ীতে সভার স্থান নির্বাচন করার জন্য প্রস্তাব দেন। সভার যাবতীয় খরচ তিনি বহন করবেন বলে দায়িত্ব নেন।

ঐ সময় গ্রামীণ উপজাতি ছাত্রদের মধ্যে প্রথম দুইজন ছাত্র কলেজে পড়ার সুযোগ লাভ করেছেন। তারা হলেন সুধন্বা দেববর্মা এবং দশরথ দেববর্মা। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলে সবাই একমত হলেন। অঘোর দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মার সুতারমুড়া গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা জানালেন। সুধন্বা দেববর্মা তখন বি এ পরীক্ষায় ফেল করে মানসিক কষ্ট ভোগ করছিলেন। ভাল পরীক্ষা দিয়েও ফেল করায় হতাশায় ভুগছিলেন এবং উমাকান্ত একাডেমীতে অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতার চাকুরীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তুতি করছিলেন। অঘোর দেববর্মার প্রস্তাবে খুব খুশী হয়ে ছাত্রদের আয়োজিত সভায় কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এরপরই নীলমণি দেববর্মাকে সঙ্গে নিয়ে অঘোর দেববর্মা হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজে গিয়ে দশরথ দেববর্মাকে তাদের পরিকল্পনার কথা জানান। দশরথবাবু খুব খুশী হয়ে সভা অনুষ্ঠানের জন্য একটি সুবিধাজনক তারিখ ধার্য করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে অঘোর দেববর্মা এবং নীলমণি দেববর্মা জনশিক্ষা সমিতি গঠনের সভার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।

যথাসময়ে ১১ই পৌষ ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দ (২৭ শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫) তারিখে দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় হেমন্ত দেববর্মার বাড়ীতে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের এক সমাবেশে বিস্তারিত আলোচনার পর গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে 'জনশিক্ষা সমিতি'- নামে একটি সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কাজে সরকারী সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন বলে সকলেই একমত হওয়ায় সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই সভায় খোয়াই, কমলপুর এবং সদর এলাকার ৫৪জন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। দশরথ দেবের মতে ১১জন উপস্থিত ছাত্রকে নিয়েই সমিতি গঠন করা হয়েছিল। সুধন্বা দেববর্মার মতে ১৯জন সভায় উপস্থিত ছিল। হয়তো পাড়ার কিছু ছাত্র বিনা নিমন্ত্রণেই সভায় উপস্থিত হয়েছিল। অঘোর দেববর্মার মতে সেই যুগেও মেট্রিক পাশ করা বেশকিছু

উপজাতি যুবক বেকার ছিল। তারা শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাবকে খুব গুরুত্ব দেয়নি।

সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুধন্বা দেববর্মা । উপস্থিত সদস্যারা ছিলেন । - দশরথ দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, নীলমণি দেববর্মা, হরিচরণ দেববর্মা, রমেশ দেববর্মা, ধর্মরায় দেববর্মা, শশাংক দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা, রামচন্দ্র দেববর্মা, বগলা দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, খগেন্দ্র দেববর্মা, অমূল্য দেববর্মা এবং রাধামণি দেববর্মা।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সুধন্বা দেববর্মাকে সভাপতি এবং দশরথ দেববর্মাকে সহ সভাপতি, হেমন্ত দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক এবং অঘোর দেববর্মাকে কার্যকরী সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

তখনকার বাস্তব পরিস্থিতিতে সুধন্বা দেববর্মা উমাকান্ত একাডেমীর অস্থায়ী পদে শিক্ষক হিসেবে এবং হেমন্ত দেববর্মা কৃষি দপ্তরে কর্মরত থাকায় সংগঠনের কাজের জন্য অঘোর দেববর্মাকে কার্যকরী সম্পাদক হিসেবে সব দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। দশরথ দেববর্মা তখনো কলেজে অধ্যয়নরত থাকায় ছুটির সময় ছাড়া সংগঠনের কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার তখন পর্যন্ত দশরথ দেববর্মা নামটিই প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে ভোটার তালিকায় দশরথ দেব নাম উঠায় এবং তা নির্বাচনের আগে সংশোধনের সুযোগ না থাকায় তিনি দশরথ দেব নাম নিয়েই নির্বাচনে লড়েন এবং বিপুল ভোটে জয়ী হবার পর নাম আর সংশোধন করেননি। জনশিক্ষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে অঘোর দেববর্মা যে অবদান রেখেছিলেন তা কি কারণে দশরথ দেব কোথাও উল্লেখ করলেন না তা রহস্যজনকই থেকে গেল।

অন্যদিকে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মহরাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ভূমিকা সম্পর্কে দশরথ দেবের মূল্যায়ন সঠিক বলে মনে হয় না।

রাজন্য যুগে রাজার সম্মতি এবং সদিচ্ছা ছাড়াই একজন রাজকর্মচারী ব্রাউন সাহেব জনশিক্ষা সমিতির সব স্কুল স্বউদ্যোগে অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছিলেন এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এ সম্পর্কে সুধন্বা দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা এবং নীলমণি দেববর্মার বক্তব্য হল-তারা যখন বিদ্যালয়ের তালিকা নিয়ে মহারাজার সঙ্গে দেখা করে অনুমোদনের আবেদন জানান, মহারাজা বীর বিক্রম খুব মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শুনেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তালিকার সব স্কুলের অনুমোদন দিয়ে শিক্ষা দপ্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। মহারাজা মন্তব্য করেন- ইউ আর ট-লেট। আরো আগেই এই উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল। শহরের ঠাকুর কর্তাদের সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে মহারাজা মন্তব্য করেন তাদের পরামর্শ নিওনা। তারা প্রজাদের উন্নতি চায় না।

এই ঘটনায় মহারাজার চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে। দশরথ দেব ঐ সময় বৃন্দাবন কলেজে ব্যস্ত থাকায় স্কুল অনুমোদনের ডেপুটেশনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। এজন্যই মহারাজার দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের ধারাটি বুঝতে পারেননি।

দশরথ দেব স্মৃতিকথায় বলেছেন সর্বত্র মহারাজার মনোনিত সর্দাররা ব্যাপকভাবে জনশিক্ষা বিস্তারের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। সর্দারদের উদ্যোগে প্রতি পরিবার থেকে এক টাকা চাঁদা আদায় করে একটা ফান্ড তৈরী করা হয়েছিল। সে যুগে এক টাকার যথেষ্ট মূল্য ছিল। পাঁচ

টাকা, দশ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষক পাওয়া যেত। সর্দাররা উদ্যোগ নিয়ে প্রতি গ্রামে স্কুল ঘর নির্মাণে সাহায্য করেছিল।

মহারাজার মনোনীত সর্দারদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের এই বিপুল উৎসাহ কিসেব ইঙ্গিত বহন করে? শিক্ষা বিস্তারে মহারাজার সদিচ্ছারই ইঙ্গিত বহন করে এই ঘটনা। জনশিক্ষা আন্দোলনের উদ্যোক্তারা কল্পনাও করতে পারেননি যে শিক্ষা বিস্তারের এই আন্দোলন এত দ্রুত এমন ব্যাপকতা লাভ করতে পারে। মহারাজার সহানুভূতি লাভ করেছিল বলেই রাজার মনোনীত সর্দারদেব সহযোগিতায় দাবদাহের মতো জনশিক্ষা আন্দোলন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

যদি অবাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাণ হিসেবে জনশিক্ষা সমিতি টিকে থাকতে পাবতো তাহলে ভারতভুক্তির আগেই সারা বাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটে যেত।

সে রকম ঘটলে ভারতভুক্তির পর বহু উপজাতি যুবক বিভিন্ন ধরনের সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় স্কুলে এবং অফিসে হাজার হাজাব উপজাতি রিজার্ভ পদ খালি পড়ে ছিল উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা থাকলেও পুলিশ কনস্টেবল, দারোয়ান এবং বিভিন্ন দপ্তরের ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরী পাওয়া যেত।

এই পর্যালোচনা থেকে সহজেই বুঝা যায়, জনশিক্ষা আন্দোলন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপজাতিদেব একটা প্রজন্ম দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মহারাজার আকস্মিক মৃত্যু উপজাতি সমাজে আরেকটা বড় আঘাত সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাপতির অভাবে সেনাবাহিনী যেমন অবস্থা বোধ করে মহাবাজা বীর বিক্রমের আকস্মিক মৃত্যুতে ত্রিপরার উপজাতি প্রজারা তেমনি অসহায় বোধ করেছিল।

জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেস নেতাদেব আচবণ এবং দৃষ্টিভঙ্গী উপজাতি সমাজকে আরো বড় আঘাত দিয়েছিল। অসহায় উপজাতিরা রাজাব অভাবে দশরথ দেবকে রাজাব সম্মানে মান্যতা দিয়ে আত্মরক্ষার পথ খুঁজেছিল।

জনশিক্ষা সমিতির প্রধান দুটি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন - দশরথ দেব এবং অঘোব দেববর্মা। দু'জনেই সমান সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করে যথাসময়ে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে দশরথ দেব অসাধাবণ বিচক্ষনতার পরিচয দিয়েছেন যার কোন তুলনা নেই।

জনশিক্ষা সমিতিকে শহরের ঠাকুর-কর্তারা **'পুলাপানের সংগঠন'** বলে ঠাট্টা করেছিলেন বলেন সুধন্বা দেববর্মা নিজের স্মৃতিকথায় খেদ প্রকাশ করেছেন।

ক্রমে ক্রমে -'জনশিক্ষা সমিতি'-জনপ্রিয় হয়ে উঠায় ঠাকুর-কর্তারা পাহাড় অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারাবার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠেন। আগরতলায় জিতেন ঠাকুরের নেতৃত্বে **"পার্বত্য উপজাতি সেবা সমিতি"** নামে একটি সংগঠন তৈবী করে **"জনশিক্ষা সমিতিকে"** এই সেবাসমিতিতে যোগ দেবার জন্য আহ্বান রাখেন। কিন্তু মূল নেতৃত্ব শহরের শিক্ষিত ঠাকুর-কর্তাদের উপর ছেড়ে দেবার শর্ত আরোপ করায় জিতেন ঠাকুরের প্রস্তাব জনশিক্ষা সমিতির নেতারা অগ্রাহ্য করেন। এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। ঠাকুর-কর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে মহারাজা

নিজেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

মহারাজা বীর বিক্রম আশা করেছিলেন, গ্রামের উপজাতি ছেলেরা শিক্ষিত হয়ে 'ভারত শাসন আইনের'- নির্দেশ অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সংস্কাব পরিকল্পনায় মহারাজাকে সাহায্য করবে এবং রাজ্যের রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত হয়ে দায়িত্বশীল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করে রাজ্য পরিচালনায় মহারাজাকে সহযোগিতা করবে।

শহরেব ঠাকুর-কর্তাদের উপর মহারাজা আর নির্ভর করতে পারছিলেন না। রাজ্যের স্বার্থেই গ্রামীণ উপজাতি প্রজাদের কাছে টানার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কাবণ যে কোন ধবনের নির্বাচনেই প্রজাদেব সমর্থন একান্ত প্রযোজন। বাজ্যের গণ-আন্দোলনের নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙ্গালী। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল রাজতন্ত্রেব বিরুদ্ধে। এটা মহারাজা বুঝতে পেবেছিলেন।

কিন্তু দেখা গেল 'জনশিক্ষা সমিতির' সংগঠন যতই শক্তিশালী হল ততই মহারাজার বিবোধী রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে জনশিক্ষা সমিতিব যোগাযোগ বেড়ে গেল। ঠাকুর-কর্তারা পরামর্শ দিলেন "জনশিক্ষা সমিতি" ভেঙ্গে দেওয়া হোক। কারণ এটা আর সমাজসেবামূলক অবাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়। এব পেছনে বাজনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে। মহাবাজা বীব বিক্রম দমননীতির পথে না গিয়ে বিকল্প বাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলে জনশিক্ষা সমিতিব মোকাবিলা কবাব সিদ্ধান্ত নিলেন। এই উদ্দেশ্যে 'ত্রিপুব সংঘ' নামে নতুন একট সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি শুরু হয।

দশরথ দেব
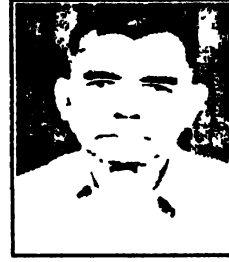
অঘোর দেববর্মা
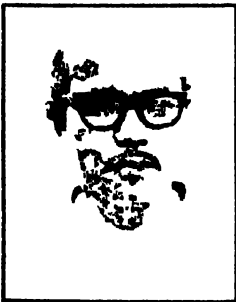
সুধন্বা দেববর্মা

হেমন্ত দেববর্মা

ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জনমঙ্গল সমিতির নেতারা জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর "দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের" স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত "সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনী" নামক কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুকরণে ১৯৪৬ সালের মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্য প্রজা মন্ডল নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। প্রধান উদ্যোক্তা ও নেতা ছিলেন প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুর। বীরেন দত্ত সহ জনমঙ্গল সমিতির অন্যান্য সদস্যরাও এই সংগঠনের সদস্য হন নতুন সদস্যদের মধ্যে বিশিষ্টরা ছিলেন বীরচন্দ্র দেববর্মা, যোগেশ ঠাকুর, কুঞ্জ লস্কর, গোপাল লস্কর প্রমুখরা।

জনশিক্ষা সমিতির সর্বসম্মত প্রতিনিধি হিসেবে অঘোর দেববর্মা প্রজামন্ডলেব কার্যকরী কমিটিতে যোগ দেন। যোগেশ ঠাকুর সভাপতি বীরচন্দ্র দেববর্মা সাধারণ সম্পাদক, অঘোর দেববর্মা সহ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। কমিউনিষ্ট পন্থী ছাত্র সংগঠনের নেতা অতিকূল ইসলামকেও একজন সহ সম্পাদক করা হয়। ১৯৪৬ সালের মে মাসে প্রজামন্ডল গঠিত হয।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন পন্ডিত জহরলাল নেহেরু। সব রকম রাজনৈতিক দলই এই সংগঠনে যুক্ত হয়েছিল।

১৯৪৬ সালে গোয়ালিয়রে সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনীব সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডলের পক্ষ থেকে এডভোকেট বীরচন্দ্র দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মা এ দু'জনকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়। সম্মেলন স্থলে গিয়ে দেখা যায় ত্রিপুবা রাজ্য গণপরিষদের পক্ষ থেকে তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত এবং সুখময় সেনগুপ্ত ত্রিপুরাব দু'জন প্রতিনিধি হিসেবে আগেই উপস্থিত হয়েছেন।

১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ সাবা ভাবত দেশীয রাজ্যেব অনুমোদন লাভ করেছিল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডলের পক্ষ থেকে এরূপ অনুমোদনের জন্য কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। অনেক আলোচনার পর স্থির হয় উভয় পক্ষই সম্মেলনে যোগ দিতে পারবে কিন্তু কেউ ভোট দিতে পারবে না।

অঘোর দেববর্মা অভিযোগ করেছেন এই সর্বভারতীয সম্মেলনে ত্রিপুবা রাজ্যের প্রজাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং দুর্দশার কথা তুলে ধরতে পারেননি ত্রিপুরার প্রতিনিধিবা। এরূপ সর্বভারতীয় সম্মেলনে বক্তৃতা দেবার অভিজ্ঞতাও তাদের ছিল না।

ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল রাজতন্ত্রের বিরোধী সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেওয়ায় মহারাজা বীর বিক্রম অঘোর দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মার উপর ক্ষেপে যান। জনশিক্ষা সমিতি যে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত হন। অবিলম্বে মহারাজার অনুগত সর্দারদের এক সম্মেলন আগরতলায় আহ্বান করেন। কমিউনিষ্ট কর্মীরা তখন প্রজামন্ডলের মধ্যে থেকেই কাজ করতো। আলাদা কোন সংগঠন ছিল না।

ত্রিপুর সংঘ

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে মহারাজা বীর বিক্রমের নির্দেশে বিশিষ্ট ঠাকুর কর্তাদের উপর মহারাজার অনুগত সমস্ত সর্দার এবং শহরের ঠাকুর কর্তাদেব নিয়ে এক সম্মেলন আহ্বান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মহারাজার পক্ষে সারা রাজ্যে প্রচার চালান ব্রজলাল কর্তা, দুর্জয় কর্তা, জীতেন ঠাকুর, ললিত ঠাকুর এবং আরো অনেকে। তারা উপজাতি প্রজা এবং সর্দারদের বুঝাতে থাকেন যে, মহারাজা বীর বিক্রম শহর ও পাহাড়ের সমস্ত উপজাতিদের এক সূত্রে বেঁধে দিতে চান। উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই শুধু উপজাতিদের একটি দল গঠন করা দরকার। রাজার শক্তি বৃদ্ধি পেলে উপজাতিদের মঙ্গল হবে।

মহারাজার আহ্বানে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আগরতলায় বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজা সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। বিভিন্ন এলাকার সর্দারদের পৃথক পৃথক ক্যাম্পে রাখা হয়। উপস্থিত সর্দার এবং ভলান্টিয়ারদের অধিকাংশই ছিল মহারাজার অত্যন্ত অনুগত। শহরের ঠাকুর কর্তারা সব ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে অনুগত সর্দারদের নামের তালিকা সংগ্রহ করছেন খবর পেয়ে জনশিক্ষা সমিতিএবং প্রজামন্ডলের নেতারা মিলিত হয়ে এক গোপন সভায় স্থির করেন যে, মহারাজার উদ্যোগে সংগঠন গড়ার কাজে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। মহারাজার কমিটিতে যতবেশী সম্ভব জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামন্ডলের সদস্য ও সমর্থকদের ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

সারাদিনের চেষ্টায় কমিটি গঠনের যে তালিকা তৈরী হল তাতে হেমন্ত, সুধন্বা এবং বংশী ঠাকুরের নাম দেখে মহারাজা খুব রেগে গেলেন । তিনজনকেই গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলেন। দশরথ এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। বৃন্দাবন কলেজে তখন পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল।

বংশী ঠাকুর শহরে এবং গ্রামে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। হেমন্ত দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মা জনশিক্ষা সমিতির নেতা হিসেবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনজনের গ্রেপ্তারের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্যাম্পে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বন্দীদের মুক্তি না দিলে পরদিনের মিছিলে এবং সম্মেলনে যোগ দেবে না বলে অনেকেই প্রকাশ্যে বলতে থাকে।

মহারাজা ভেবে ছিলেন গ্রেপ্তারের খবরে সবাই ভয় পেয়ে মহারাজার অনুমোদিত তালিকায় কমিটি গঠন করতে সর্দাররা রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু উল্টো ফল দেখে বিচলিত হলেন এবং বন্দীদের মুক্তি দিলেন। বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে রাজবাড়ীর দালানের সামনে সমবেত হয়। মহারাজার একটি ছাপান বিবৃতি পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মা।

অঘোর দেববর্মার স্মৃতিকথা অনুযায়ী এই সমাবেশে বিবৃতি পাঠ শেষ হবার পর সমবেত জনতা বন্দীদের মুক্তি দেবার প্রার্থনা জানায়। ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মার অনুরোধে এবং প্রধানমন্ত্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্মার পরামর্শে এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মহারাজা জনতার আবেদন মঞ্জুর করে বন্দীদের মুক্তি দেন।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ৮১জনকে নিয়ে "ত্রিপুর সংঘ" নামে একটি উপজাতি সংগঠন গঠন করা হয়। জনশিক্ষা সমিতি ও প্রজামন্ডলের বহু সমর্থক কমিটিতে

স্থান পেয়ে যায়।

ত্রিপুর সংঘকে সরকারী মর্যাদা দেবার জন্য কিছু কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয় যেমন ঃ-

১) নতুন বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া।

২) পুরাতন লাইসেন্স নবীকরণ করা।

৩) উপজাতিদের জমি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করা।

৪) নারী সংক্রান্ত বিরোধের সালেসী করা ইত্যাদি।

এসব পদক্ষেপের ফলে শহরের ঠাকুর-কর্তাদের কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ এবং কোন্দল দেখা দেয়। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তা ধারার প্রভাবে উপজাতি সমাজের স্বার্থে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত মহারাজার 'ত্রিপুরা সংঘ'- অল্পদিনের মধ্যেই দুর্বল হয়ে যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যত সম্পর্কে তীব্র হতাশায় মাহারাজা মাদকাসক্ত হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করেন। ফলে 'ত্রিপুর সংঘ' বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পরবর্তী কালে মহারাজার ভ্রাতা দুর্জয় কিশোর দেববর্মা "বীর বিক্রম-ত্রিপুর সংঘ"- নাম দিয়ে নতুন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংঘের সম্পাদক বিদুবকর্তাব বাড়ীতে প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু রাজকীয় সমর্থনের অভাবে অল্পদিনের মধ্যেই এই সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটে।

এই সংগঠনের প্রধান দাবী হল- পাকিস্তান থেকে শরণার্থী আগমন নিয়ন্ত্রণ করা এবং পুরানো বাসিন্দাদেব জমির অধিকার রক্ষা করা। ইতিমধ্যে রাজ্যের রাজনৈতিক পবিবেশে ঘটে চলেছিল দ্রুত পরিবর্তন। আগামীকাল কি ঘটবে তাও তখন অগ্রিম, বলা যেত্র না।

'বীর বিক্রম ত্রিপুর' সংঘের সহযোগী রূপে কুঞ্জেশ্বর দেববর্মার নেতৃত্বে ' সেংক্রাক'- নামে একটি জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। রক্ষী বাহিনীর প্রাক্তন কিছু ব্যাক্তির চেষ্টায় এই জঙ্গী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। চীপ কমিশনার এ বি চ্যাটার্জীর চেষ্টায় এই জঙ্গী সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটে।

ধর্মনগর হিত সাধনী সমিতি

মহারাজার 'গ্রাম মন্ডল' গঠনের উদ্যোগ এবং শাসন সংস্কারের ঘোষণায় উৎসাহী হয়ে ধর্মনগরে কালাচন্দ্র নাথ চৌধুরী এবং মকবুল আলী ভূঁইয়ার উদ্যোগে ধর্মনগর হিতসাধনী সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। জনমঙ্গল সমিতির নেতারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গণআন্দোলনে যুক্ত হবার চেষ্টা করেন। জ্যোতির্ময় গুপ্ত এবং গয়া প্রসাদ ত্রিবেদী জনমঙ্গলের উদ্যোগকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেন। গয়া প্রসাদ ত্রিবেদীকে জনমঙ্গল সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়। ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় অধিবেশন ডাকা হয়। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে ধর্মনগরের কেন্দ্রীয় অধিবেশনে রাজ্যের পরিস্থিতি আলোচনা করে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

হিতসাধনী সমিতির অন্যান্য সদস্যরা বিভিন্ন বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন এবং

পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। হিতসাধনী সমিতি জাতীয় কংগ্রেসের একটি শাখায় রূপান্তরিত হয়।

কৈলাসহর মিলন সমিতি

কুমিল্লা কলেজে পাঠরত কৈলাসহরের কিছু ছাত্র যুদ্ধ শুরু হবাব পূর্ব মুহূর্তে মিলন সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। কিন্তু উদ্যোক্তাদেব নাম জানা যায়নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা অম্বিকা চক্রবর্তী কয়েকবার কৈলাসহরে এসে এই সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হন। আসামের কমিউনিষ্টভাবাপন্ন বিপ্লবীদের সঙ্গে এই সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। যুদ্ধের সময় তদের কোন কার্যকলাপের সুযোগ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সমিতির সদস্যরা রাজ্যের কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। ফলে এই সমিতির বিলুপ্তি ঘটে।

আঞ্জুমান ইসলামিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সারা ভারতে জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম -লীগ পৃথক পৃথকভাবে গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে ।

ত্রিপুরা রাজ্যে ঐ সময় বাঙ্গালীদের মধ্যে মুসলিম প্রজারাই ছিল সংখ্যায় বেশী। বাঙ্গালী হিন্দুদের তুলনায় বাঙ্গালী মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বেশী ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল জিরাতিয়া প্রজা। কৃষি কাজের জন্য অস্থায়ীভাবে ত্রিপুরায় বসবাস করতো। সেই সময সম্পূর্ণ বাংলা প্রদেশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মুসলিম লীগ জোবদাব আন্দোলন শুরু করেছিল। কাজেই ত্রিপুরাকেও বাংলার সঙ্গে যুক্ত করে পাকিস্তানভুক্ত করার চিন্তা তখন থেকেই মুসলিম নেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

এই উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের অনুকরণে আগরতলায় 'আঞ্জুমান ইসলামিয়া' নামে একটি সংগঠন তৈরী হয়। প্রধান নেতা ছিলেন আব্দুল বারিক নামে শহরের বিখ্যাত ঠিকাদার। গেঁদু মিয়া নামেই বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন রাজার হাতির মাহুত ছিলেন। যুদ্ধের সময় রাজার প্রধানমন্ত্রীর গাড়ীর ড্রাইভাব হন। রাজপরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ থাকায় সিঙ্গারবিল বিমানঘাটি নির্মাণের ঠিকেদারী পেয়ে যান। ঐ মাঠে তখন সটি গাছের বন ছিল। আদা, হলুদ জাতীয় সটি গাছ তুলে মাঠ পরিস্কার করতে বড় বড় গাছ কাটার খরচ দাবী করে বিল আদায় করেন। গেঁদু মিয়া হঠাৎ করে শহরের সেরা ধনী ব্যক্তি হয়ে গেলেন। ঢাকার মুসলিম লীগের নেতারা গেঁদু মিয়াকে সম্মানিত সামাজিক মর্যাদা দিয়ে আঞ্জুমান ইসলামিয়ার নেতা বানিয়ে দিলেন।

রাজ্যের সমস্ত মুসলিম প্রধান গ্রামে মসজিদ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে অল্প সময়ের মধ্যেই গেঁদু মিয়া মুসলিমদের মধ্যে জনপ্রিয় নেতা হয়ে গেলেন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে রাজপরিবারের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গেঁদু মিয়াকে আড়ালে থেকে মদত দিয়েছেন। গেঁদু মিয়ার নেতৃত্বে— আগরতলা শহরে মুসলিম লীগের পতাকা নিয়ে শত শত মুসলমান ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার দাবীতে বহু জঙ্গী মিছিল ও সভা-সমিতি করেছেন। এসব দৃশ্য দেখে হিন্দুদের

চৈতন্য হয়। বাঙ্গালী এবং উপজাতি হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। হিন্দু যুবকেরাও সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলে।

শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে মহারাজার ইচ্ছা ঘোষিত হওয়ার পর, আঞ্জুমান ইসমালিযা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ এর অবলুপ্তি ঘটে।

ত্রিপুরা রাজ্যে গেঁদু মিয়ার আঞ্জুমান ইসমালিয়া ছিল প্রথম সাম্প্রদায়িক সংগঠন। প্রথমদিকে তাদেব দাবী ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করা। ক্রমে তা সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। এর ফলে হিন্দু-মুসমিল সম্প্রীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য মুসলিম প্রজা মজলিশ

গেদু মিয়ার সাম্প্রদায়িক সংগঠনেব প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আহনজীবী আবমান আলী মুন্সী এবং উদয়পুরে ফরিদ মিযার নেতৃত্বে "ত্রিপুরা রাজ্য মুসলিম প্রজা মজলিস" নামে একটি সংগঠন তৈরী হয়। মুসলিম কৃষকদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা সৃষ্টি কবা এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বক্ষা কবাব কাজে এই সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবে। আগবতলাব ধলেশ্বব এলাকাব সিবাজুল ইসলাম এই সংগঠনেব সম্পাদক ছিলেন। **'ফরিয়াদ'** নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ কবে মুসলিম জনগণকে গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী কবে তুলবাব জন্য সচেষ্ট হন। দেশ বিভাগেব পব নেতাদেব অনেকেই পাকিস্তানে চলে যাওযায এই সংগঠনেব বিলুপ্তি ঘটে। পত্রিকাব প্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়। এই সংগঠন ক্ষুদ্র পবিসবে হলেও সাম্প্রদাযিকতাব বিরুদ্ধে একটা অবদান বেখেছে।

জামায়েত উলেমা হিন্দ

১৯৪৯ সালে দিল্লীর জমায়েত উল হিন্দেব একটি শাখা অগবতলায গঠন করা হয। উকীল আমেদ হুসেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হন। এই সংগঠন কোন বাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল না। মুসলিম সমাজেব ধর্মীয় আচাব-আচরণ সম্পর্কিত কাজেই তারা সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম ঐক্যই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। ষাটেব দশকের শুরুতেই এই সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটে।

হিন্দু মহাসভা এবং ত্রিপুরা হিন্দু সম্মেলনী

মুসলিম লীগ প্রভাবিত আঞ্জুমান ইসলামিযার প্রচার আন্দোলন শুরু হবার পর আগরতলায় হিন্দু মহাসভার একটি শাখা সংগঠন গড়ে উঠে। কিন্তু শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় হিন্দু মহাসভা শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি।

অন্যদিকে বিশিষ্ট আইনজীবী প্রিয়নাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ত্রিপুরা হিন্দু সম্মেলনী নামে আরেকটি সংগঠন গড়ে উঠে। হিন্দু আবেগের দ্বারা পরিচালিত কিছু ঘরোয়া বৈঠকেই তাদের কাজ

সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তাদের অনুগামীরা গণতান্ত্রিক গণআন্দোলনের মিছিল-মিটিংএ সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু উপজাতিরা সাম্প্রদায়িক আবেগের দ্বারা কখনোই প্রভাবিত হয়নি। এক্ষেত্রে তাদের নিরপেক্ষতা ছিল লক্ষ্যণীয়। ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রধানতঃ বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে শান্তি ও সম্প্রীতির মিছিলে উপজাতিরাও সামিল হয়েছিল।

ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ

জনশিক্ষা সমিতি প্রায় তিন বছর অবাধে প্রচার চালিয়ে সদর, খোয়াই ও কমলপুরের তিনটি বিভাগে চারশতাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সদর দক্ষিণ অঞ্চলেও বেশ কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মহারাজা বীর বিক্রম শিক্ষা বিস্তারের কাজে কোথাও বাধা দিয়েছেন এমন কোন ঘটনার কথা কেউ উল্লেখ করেননি। কাজেই "জনশিক্ষা সমিতির" প্রতি মহারাজার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে স্মৃতিকথায় দশরথ দেব যেসব কথা বলেছেন তা পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন বলে মনে হয় না। **জনশিক্ষা সমিতির পাল্টা সংগঠন হিসেবে মহারাজা "ত্রিপুর সংঘ" গঠন করেছিলেন তাও সঠিক বলে প্রমাণ করা যাবে না।**

১৯৪৬ সালে 'ত্রিপুর সংঘ' গঠিত হবার পর মহারাজা পুরো এক বছর জীবিত ছিলেন। এই এক বছরের মধ্যে 'ত্রিপুর সংঘ'- কোথাও জনশিক্ষা সমিতির কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই।

মহারাজার মৃত্যুর পরেও আরো ছয় মাস রাজ্যে দেওয়ানী শাসন থাকা সত্ত্বেও জনশিক্ষা সমিতির কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করা হয়নি।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে ভারতের স্বাধীনতাকে ঝুটা ঘোষণা দিয়ে ছয় মাস বয়স্ক স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারকে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত নেবার পরই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়।

ত্রিপুরাতেও এ সময় কমিউনিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। যাদের পাওয়া যায়নি তাদের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হয়। কলকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বীরেন দত্তের সঙ্গে অঘোর দেববর্মাও ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

কাজেই জনশিক্ষা সমিতির নেতারা কমিউনিষ্ট বা কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন একরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অঘোর দেববর্মা স্মৃতিকথায় লিখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত দশরথ দেবের সঙ্গেও পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছিল।

এক্ষেত্রে স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে সঠিক ভূমিকা নিতে পারেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত দেওয়ানও সঠিক খবর না জেনে প্রশাসনের কমিউনিষ্ট বিদ্বেষী রাজকর্মচারীদের রিপোর্টের ভিত্তিতে জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য

বাড়াবাড়ি ভূমিকা নিয়েছেন। তখন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ নিতে জনশিক্ষা সমিতির কোন নেতাই রাজী হননি।

বংশীঠাকুর এবং প্রভাত রায় কোন সময়েই কমিউনিষ্ট ছিলেন না। বীরেন দত্তের সঙ্গে ঘনিষ্টতা ছিল বলেই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এটা ছিল অত্যন্ত ভুল পদক্ষেপ।

সেই সময় পাহাড় অঞ্চলে বংশীঠাকুর এবং প্রভাত রায় ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। রাজার অকাল মৃত্যুতে রাজাহীন প্রজা এবং সর্দাররা যখন অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলেন ঠিক তখনই তাদের নির্ভরযোগ্য দুইজন নেতাকে অকারণে গ্রেপ্তার করায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল।

অন্যদিকে জনশিক্ষা সমিতির কোন নেতাই তখন কমিউনিষ্ট ছিলেন না। কলকাতা পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দশরথ দেব সহ অন্য কোন নেতাই মেনে নিতে পারেননি। শুধু তাই নয় জনশিক্ষা সমিতির নেতারা যৌথভাবে লিখিত স্মারকলিপি পাঠিয়ে প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহেরুকে কয়েকবার জানিয়ে ছিলেন যে জনশিক্ষা সমিতি একটি অরাজনৈতিক সমাজ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান। কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জনশিক্ষা সমিতি যুক্ত নয়।

দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সময় অন্ধ কমিউনিষ্ট বিদ্বেষ কংগ্রেসের সব নেতাদেরই গ্রাস করেছিল। স্থানীয় কংগ্রেস নেতারাও পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে যেসব পুলিশ অফিসার পাহাড় অঞ্চলে গিয়েছেন তারা নেতাদের খবরা খবর না দেবার অপরাধে বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রাম ঘেরাও করে কাউকে গ্রেপ্তার করতে না পেরে গ্রামের সমস্ত ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছেন।

রাজন্য যুগে প্রজা বিদ্রোহ দমনে যেভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা হতো ঠিক সেভাবেই পাহাড়ীদের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল।

বীরেন দত্ত এবং অঘোর দেববর্মা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেছিলেন। তারা দু'জনে মিলে সদর উত্তরের রাজঘাট গ্রামে লক্ষ্মীকান্ত দেববর্মার বাড়ীতে এক গোপন সভার আয়োজন করেন। বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দশরথ দেব এবং হেমন্ত দেববর্মাকে সভায় ডেকে আনা হয়। সুধন্বা দেববর্মা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।

এই গোপন বৈঠকে বীরেন দত্ত দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে পুলিশী জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। উপস্থিত চারজন নেতাই একমত হন যে পুলিশের নির্মম নির্যাতন নীরবে মেনে নেওয়া হবে না। উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতেই হবে।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের মে মাসে দশরথ দেবকে সভাপতি এবং অঘোর দেববর্মাকে সাধারণ সম্পাদক করে "মুক্তি পরিষদ" নামে একটি জঙ্গী সংগঠন গঠন করা হয়। সুধন্বা দেববর্মা সভায় উপস্থিত না থাকলেও তাকে সহ সভাপতি এবং হেমন্ত দেববর্মাকে কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত ও সাহসী যুবককে এই গুপ্ত সংগঠনের সদস্য রূপে গ্রহণ করা হয়।

ত্রিপুরায় এটাই হল সর্বপ্রথম শিক্ষিত উপজাতি যুবকদের সশস্ত্র সংগঠন। যুবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্যের পুলিশী নির্যাতন এবং কংগ্রেস নেতাদের চরম উদাসীনতা একটি সশস্ত্র সংঘাতের পথে রাজ্যকে ঠেলে দিয়েছিল।

এই অপ্রত্যাশিত সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করা সহজ হয়েছিল এবং পরবর্তী ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত করে দিয়েছিল। কলকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার পর দুই মাসের মধ্যেই ত্রিপুরায় সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যাওয়ায় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতারা দারুণ উৎসাহিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের কমিউনিষ্ট নেতারা যাতে সক্রিয় সহযোগিতা করে তার জন্য নির্দেশ পাঠিয়ে ছিলেন।

রাজঘাটের গোপন সভায় 'মুক্তি পরিষদ' গঠিত হবার পর সেদিনই বীরেন দত্ত এবং দশরথ দেব মুক্তি পরিষদের নীতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে একটি ইস্তেহার তৈরী করেন। চারজন নেতার অনুমোদন নিয়ে বীরেন দত্ত পাকিস্তানের একটি প্রেস থেকে গোপনে ছাপিয়ে আনার দায়িত্ব নেন। ইস্তেহার ছাপিয়ে ফিরে অসার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যান। তখন বীরেন দত্তের সঙ্গে ছাপানো ইস্তেহার ছিল না। অন্য লোকের উপর দায়িত্ব দিয়ে তিনি খলি হাতেই ফিরেছিলেন। জেলে আটক থাকায় মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় বীরেন দত্ত আর কোন সাহায্য করতে পারেননি। পরবর্তী সময়ে আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের নেতারা এসে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। বীরেন দত্ত যখন মুক্তি পান তখন মুক্তি পরিষদের আন্দোলন সমাপ্তির পথে এবং সারা রাজ্যে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল।

বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার হবার এক মাস পর দশরথ দেবের হাতে ছাপানো ইস্তেহার গোপনে পৌঁছে গেল। বিভিন্ন এলাকায় ছাপানো ইস্তেহার ছড়িয়ে দেওয়া হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ছাঁটাই হওয়া প্রাক্তন সৈনিকেরা নিজেদের বন্দুক নিয়ে মুক্তিপরিষদে যোগ দিতে থাকে। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর অগ্রিম কোন নোটিশ না দিয়েই সব সৈনিককেই ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। বকেয়া বেতনও দেওয়া হয়নি। কাজেই সেনারা বন্দুক নিয়েই গ্রামে ফিরে যায়। তাদের কাছ থেকে বন্দুকগুলো বুঝে নেবার মতো অফিসারও ছিল না। বিভিন্ন দপ্তরে যুদ্ধের প্রয়োজনে যেসব কর্মচারী নিয়োগ করা হয়ছিল তাদেরও ছাঁটাই করা হয়। ফলে ঐ সময় একটা অস্থিরতা এবং অসন্তোষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

'মুক্তি পরিষদের' সাংগঠনিক দায়িত্ব চারজন নেতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। দশরথ দেব খোয়াই মহকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় খোয়াই এলাকায় বেশ কিছু শিক্ষিত যুবক মুক্তি পরিষদে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রবীন্দ্র দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, রাজেন্দ্র দেববর্মা, বিদ্যা দেববর্মা। এরা সবাই পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা হয়েছিলেন। কমলপুর বিভাগেও সংগঠনের মূল দায়িত্বে ছিলেন দশরথ দেব। সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন দীনেশ দেববর্মা ও বারীন দেববর্মাকে।

সদর উত্তরে দায়িত্ব নেন হেমন্ত দেববর্মা, সহযোগী হিসেবে পেয়ে যান - বগলা দেববর্মা, ভীম দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্মা, চিত্ত দেববর্মা ও অক্ষিরায় দেববর্মার মত উৎসাহী যুবকদের। সবাচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য সহযোগী হয়ে উঠেন হেমন্ত দেববর্মার বড় ভাই হিরণ্য দেববর্মা।

সদর দক্ষিণ অঞ্চলে অঘোর দেববর্মা এবং সুধন্বা দেববর্মা যৌথভাবে সংগঠন গড়ার দায়িত্ব নেন।

রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এই চারজন নেতা সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য যেভাবে শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করে সরকারী প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তা ত্রিপুরার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

শুধু তাই নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরৎ সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ গাদা বন্দুক, আর তীব ধনুক নিয়ে গেরিলা কায়দায় লড়াই করে সরকারী বাহিনীকে তাদের ক্যাম্পগুলোতে অবরুদ্ধ করে বিশাল অঞ্চল জুড়ে মুক্তাঞ্চল গঠন করে দুই বছরের বেশী সময় ধরে পাল্টা সরকার পরিচালনা করেছেন।

গোলাঘাটিতে ক্ষুধার্ত কৃষকদের উপর গুলি বর্ষণের ঘটনায় সাতজন নিরীহ কৃষকের মৃত্যু এবং অনেকের আহত হবার ঘটনায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুলিশী জুলুমের প্রতিশোধ নেবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ ফেরৎ সেনারা তাদের রাইফেল সহ 'মুক্তি পরিষদে' যোগ দেয়। পদ্মবিলে গুলী বর্ষণে তিনজন মহিলা-কুমারী, মধুতি ও রূপশ্রী দেববর্মার মৃত্যুতে উত্তেজনা চরম রূপ ধারণ করে।

এরপরেই চম্পাহাওরে স্বতঃস্ফূর্ত জনতা পুলিশের উপর পাল্টা আক্রমণের জন্য জমায়েত হয়। এভাবে মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে বহু লোকের প্রাণ যাবে। দশরথ দেবের পরামর্শে গেরিলা কায়দায় দশজনের একেকটি গ্রুপ তৈরী করে প্রতি ইউনিটে একজন করে কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক গ্রামের লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুকগুলো মুক্তি পরিষদ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সরকার পরিস্থিতির জটিলতা লক্ষ্য করে সমস্ত বন্দুক সরকারী দপ্তরে জমা দেবার নির্দেশ পাঠায়। অনেকে ভয় পেয়ে বন্দুক জমা দিয়ে দেয়। আবার অনেকে বন্দুকসহ মুক্তি পরিষদে যোগ দিয়ে গেরিলা লড়াই-এ অংশগ্রহণ করতে থাকে। 'মুক্তি পরিষদ'— গঠন করার সময় আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু গোলাঘাটির ঘটনার পর সশস্ত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের মে মাসে মুক্তি পরিষদ গঠিত হয়। তিন মাস পরেই ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট রাজধানী আগরতলায় বিশাল জমায়েত করে ১৪৪ ধারা অমান্য করেই উমাকান্ত মাঠে সংক্ষিপ্ত সভা করে দাবী দিবস পালন করা হয়। অঘোর দেববর্মা আধা ঘন্টা বক্তৃতা দেন। পুলিশ কিছু বুঝে উঠার আগেই সভা শেষ করে বিশাল জনতা অঘোর দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মাকে মিছিলের মাঝখানে রেখে ফিরে যায়।

যাদের গ্রেপ্তার করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে পুলিশ হয়রান হচ্ছে এবং নিরীহ মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে মনের রাগ মেটাচ্ছে, তারাই পুলিশের ঘাড়ের উপর দিয়ে মিছিল ও সভা করে চলে গেল। দশরথ দেব এবং সুধন্বা দেববর্মা এই মিছিলে আসেননি। কারণ সব নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেলে সংগঠন অচল হয়ে যাবে।

এই মিছিল এবং সংক্ষিপ্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে বুঝিয়ে দেওয়া যে পাহাড়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নেমেছে। পুলিশী জুলুমের দ্বারা দমন করা যাবে না। এই সভার মূল দাবীগুলো ছিল ঃ-

১) প্রজার ভোটে দায়িত্বশীল সরকার চাই।

২) দেওয়ানী শাসন দূর হটো।

৩) বিনা শর্তে রাজবন্দীদের মুক্তি চাই।

৪) সমস্ত গ্রেপ্তারীপরোয়ানা বাতিল করো।

৫) অবিলম্বে পুলিশী জুলুম বন্ধ করো।

৬) বিনা বিচারে আটক করা চলবে না।

এই দাবীগুলো পর্যালোচনা করলেই বুঝা যায় 'মুক্তি পরিষদ' জন্মলগ্ন থেকেই একটি রাজনৈতিক সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সময় থেকেই সমাজসেবামূলক অরাজনৈতিক সংগঠন-জনশিক্ষা সমিতির-অবলুপ্তি ঘটেছে।

গোলাঘাটির ঘটনার পরই সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতি জোরদার করা হয়। প্রাক্তন সৈনিকদের সাহায্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়। চারদিকে পাহাড়ঘেরা কয়েকটি দুর্গম গ্রাম নিয়ে মুক্তাঞ্চল গড়া হয়। এই গ্রামগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- মগলান বাড়ী, নক্ষত্রবাড়ী, আখাউড়াবাড়ী, তুইহাচিংবাড়ী, দংগরবাড়ী, পাগলাবাড়ী, নলুংবাড়ী, তিনঘরিয়া, হাজারীবাড়ী প্রভৃতি গ্রামের প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও যুবক-যুবতীদের নানা বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রতিটি গ্রামে ২৪ ঘন্টা প্রস্তুত থাকতো ৪জন পত্রবাহক যাতে যে কোন জরুরী খবর যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছে দেওয়া যায়। পাগলাবাড়ীর বিশিষ্ট সর্দার ছিলেন নিশান দেববর্মা। মুক্তি পরিষদের ইস্তেহার পড়ে খুব উৎসাহী হন। সমস্ত সর্দারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তিনি দশরথ দেবকে পরামর্শ দেন। কেউ যদি প্রকাশ্যে সাহায্য করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় তিনি যাতে বিরোধীতা না করেন সে বিষয়ে কথা বলারও জরুরী পরামর্শ দেন।

ঠিক এই সময় ত্রিপুর ক্ষত্রিয়মন্ডলী ঐক্যবদ্ধভাবে খোয়াই নদীর ধারে গঙ্গা পূজার আয়োজন করে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু সর্দার এখানে সমবেত হন । নিশান সর্দার এই জমায়েতে দশরথ দেবকে সর্দারদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন। দশরথের বক্তব্যে সর্দাররা খুশী হয়ে সার্বতোভাবে মুক্তি পরিষদকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। **এখানে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।**

১) অবিলম্বে প্রতি ঘর থেকে এক টাকা চাঁদা। আদায় করে মন্ডল সম্পাদক 'মুক্তি পরিষদের' কাছে জমা দিবে।

২) আত্মগোপনকারী নেতাদের কথা কেউ যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে সেভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩) মন্ডলের অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রামে কোন নেতা গ্রেপ্তার হলে মন্ডল সম্পাদক এবং সর্দার দায়ী হবে।

সর্দারদের এই তিনটি সিদ্ধান্ত মুক্তি পরিষদের সংগঠনকে খুব মজবুত করে তোলে এবং সর্ব স্তরের গ্রামবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা সহজ করে দেয়। রাজভক্ত সমস্ত সর্দারদের এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুক্তি পরিষদের কল্পনার বাইরে ছিল। রাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতি এরূপ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। মহারাজা জীবিত থাকলে সর্দারদের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হতো না।

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে কুমারী বিলে রাজ্যভিত্তিক সংগঠনের নেতাদের প্রথম মিটিং হয়। তখনো কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়নি। সংক্ষিপ্ত মিটিংয়ে ১৫ই আগষ্ট দাবী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট জঙ্গী মিছিল করে-দাবী-দিবস পালন করার সিদ্ধান্তটি কমিউনিষ্ট পার্টির-কালো-দিবস পালনের ডাকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল মনে হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি ঐ বছর সারা দেশে স্বাধীনতা দিবসকে কালো দিবস হিসেবে পালন করে।

বীরেন দত্তের অভাব পূরণ করার জন্য আগরতলা থেকে বঙ্কিম চক্রবর্তী দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় হেমন্ত দেববর্মার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন। একটি গোপন মিটিংয়ে 'মুক্তি পরিষদের' নেতা ও কর্মীদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্লাশ নেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজনৈতিক চেতনা ছাড়া গেরিলাদের উদ্যম ও সাহস বেশীদিন ধরে রাখা যাবে না বলে সবাই একমত হয়। মুক্তি পরিষদের সংগ্রাম বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে নয়। কংগ্রেস পরিচালিত দেওয়ানী শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি পরিষদ সংগ্রাম করছে একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়।

গোলাঘাটির পুলিশ এবং দারোগা ছিলো বাঙ্গালী। রাজ কর্মচারীদের অধিকাংশ ছিল বাঙ্গালী, ব্যবসায়ী, মহাজন এবং দাদনদাবরাও ছিল বাঙ্গালী। কাজেই সাধারণভাবে বাঙ্গালী বিরোধী একটা ক্ষোভ উপজাতিদের মধ্যে ছিল। দশরথ দেব তাদের বুঝিয়ে বলেন, গোলাঘাটির আহতদেব চিকিৎসা করতে কলকাতা থেকে যে চিকিৎসক এসেছেন তিনিও বাঙ্গালী। বীরেন দত্ত এবং বঙ্কিম চক্রবর্তীর মত নেতারা প্রজাদেব স্বার্থে লড়াই করে জেল খাটছেন এরাও বাঙ্গালী। কাজেই একটি জাতি আরেকটি জাতির শত্রু হতে পাবে না। গরীব এবং শ্রমজীবী মানুষের কোন জাত নেই। সকলকেই বাঁচার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

প্রাক্তন সৈনিকেরা গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু তাদেব কোন রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল না। মুক্তি পরিষদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং কর্মসূচী নিয়ে নিয়মিত ক্লাশ নিতে হয়েছে। লড়াই করে প্রাণ দেবার জন্য একটা আদর্শগত ভিত্তি জরুরী হয়ে পড়েছিল। কারণ মুক্তি পরিষদের গেরিলাবা বেতনভূক কর্মচারী ছিল না। **এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সর্বপ্রথম উপজাতি সমাজে জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।**

কাজেই মুক্তি পরিষদের দায়িত্ব শুধু আক্রমণ এবং আত্মরক্ষার সংগ্রামে সীমাবদ্ধ রইলো না, সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন কাজে উদ্যোগ নেওয়া জরুরী হয়ে উঠলো। মুক্তি পরিষদ যতই শক্তিশালী এবং সক্রিয় হল পুলিশের জুলুম ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বাজার হাট করা এবং অফিস আদালতে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠলো। বিনা কারণে উপজাতি পুরুষদের ধরে নিয়ে জেরা করা, গ্রেপ্তার করা, নির্যাতন করা শুরু হয়।

ইতিমধ্যে মুক্তি পরিষদেও ভাঙ্গন দেখা দেয়। অঘোর দেববর্মা গোপনে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি নির্দেশ পাঠায় মুক্তি পরিষদকে অবিলম্বে কমিউনিষ্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করতে হবে। অঘোর দেববর্মা মুক্তি পরিষদে এই প্রস্তাব পেশ করার পর সকলেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে কমিউনিষ্ট পার্টির সাহায্য নিতে কারো কোনো আপত্তি ছিল না।

অঘোর দেববর্মা বাধ্য হয়ে মুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। নিজস্ব উদ্যোগে সদর জয়েজয়নগরে গিয়ে এক জনসভার আয়োজন করে লাল ঝান্ডা তুলে রাজ্যে প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। গ্রামাঞ্চলে কিছু নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে নিয়ে তহশীল অফিস দখল করতে উদ্যোগ নেন। বেশ কিছু নিরীহ মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় এই সশস্ত্র আন্দোলনের আবেগ থেমে যায়।

অঘোর দেববর্মা নিজের স্মৃতি কথায় লিখেছেন-অন্ধ আবেগে এবং রোমান্টিকতায় আকৃষ্ট হয়ে সেদিন যে ভুল করা হয়েছিল তাতে অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ খোয়াই মহকুমায় সামরিক আইন জারি করা হয়। বহু মিলিটারী ক্যাম্প খোলা হয়। গ্রামে গ্রামে নির্যাতন শুরু হয়। শত শত ঘর বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়। মুক্তি বাহিনীর পক্ষে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত মিলিটারী বাহিনীর মুখোমুখি হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই নতুন কৌশল নেওয়া হল। প্রতিটি মিলিটারী ক্যাম্পের চারদিকে উপযুক্ত জায়গা বাছাই করে গেরিলা বাহিনীকে এমনভাবে মোতায়েন করা হল যাতে কোন মিলিটারী বাহিনী ক্যাম্পের বাইরে ঘুরাফেরা করতে সাহস না পায়।

গেরিল্লাদের এই কৌশল সফল হল। মিলিটারী বাহিনী নিজ নিজ ক্যাম্পে অবরুদ্ধ হয়ে রইল। গ্রামবাসীরা মিলিটারী নির্যাতন থেকে কিছুটা রেহাই পেল।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল। কমিউনিষ্ট পার্টির উগ্র হঠকারী বামপন্থী নেতৃত্বের সবাইকে হটিয়ে রাজেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে নতুন কমিটি গঠন করা হল। রণদিভের হঠকারী সিদ্ধান্ত বাতিল হল। কিন্তু ভারতের গণতান্ত্রিক স্রোতে প্রবেশ করার মত নীতি গৃহীত হল না। রাজেশ্বর রাও মুক্তাঞ্চল গঠনের ডাক দিয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করলেন । অল্পদিন পরেই অজয় ঘোষের নেতৃত্বে কমিউনিষ্টরা গণতান্ত্রিক পথে প্রবেশ করেছিল।

কলকাতা কংগ্রেসে রণদিভের নেতৃত্বে গঠিত হঠকারী বামপন্থীরা নেতৃত্ব থেকে সরে যাবার পর আসামের রাজ্য সম্পাদক প্রাণেশ বিশ্বাস কয়েকজন সংগঠক নিয়ে ত্রিপুরায় আসেন। কাছাড় থেকে রঞ্জন রায়, রাখাল রাজকুমার আসেন, কলকাতা থেকে আসেন ডাঃ বিজয় বসু, নৃপেন চক্রবর্তী এবং মোহন চৌধুরী এবং একজন বন্দুকের কারিগর ।

মুক্তি পরিষদ রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দিক থেকে এই সময় শক্তিশালী হয়ে উঠে। সুযোগ বুঝে আক্রমণ কর এবং আঘাত করেই দ্রুত সরে পড় এই নীতি অনুসরণ করে গেরিলারা সাফল্য লাভ করতে থাকে। মোহন চৌধুরী ছিলেন খুবই সাহসী এবং বুদ্ধিমান। সামরিক বিভাগের প্রাক্তন হাবিলদার হিসেবে আক্রমণের কৌশলেও দক্ষ ছিলেন। কিন্তু তিনি ত্রিপুরার পাহাড় এলাকা সম্পর্কে ভাল করে না জেনেই বেশ কিছু অবাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এর ফলে কিছু ক্ষতি হয়েছিল।

নৃপেন চক্রবর্তী ছিলেন বড় মাপের রাজনৈতিক নেতা। মুক্তি পরিষদের নাম বদল করে-ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ নামাকরণ করেন। সারা রাজ্য জুড়ে বিপ্লবী কাজকর্ম ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন।

কমিউনিষ্ট পার্টির সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচী অনুযায়ী তিনটি রাজ্যে বিপ্লবী কার্যকলাপ

জোরদার হয়েছিল। ১) হায়দ্রাবাদের নিজামের বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল। প্রথমদিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল কংগ্রেস নেতারা। নিজাম কংগ্রেস দলকে বেআইনী ঘোষণা করে কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করে। এরপর এক বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করে।

কমিউনিষ্টরা বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব গ্রহন করে। অন্ধ্র-মহাসভা নামে নতুন সংগঠন গড়ে তোলে কয়েকজন বামপন্থী কংগ্রেস নেতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কমিউনিষ্টরাও এই সংগঠনে ঢুকে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। কংগ্রেস নেতা নারায়ণ রেড্ডী এবং ইয়েলো রেড্ডী ছিলেন এই সংগঠনের প্রধান নেতা। তারাই পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন করেন।

তেলেঙ্গানার সঙ্গে ত্রিপুরার পরিস্থিতির কোন মিল নেই। তেলেঙ্গানা সমতল কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু কৃষকের হাতে জমি ছিল না। হায়দ্রাবাদের নিজামের অধীনে এগারশ জমিদার কৃষকদের উপর নির্মম শোষণ চালাতো। ৮৩ রকমের কর আদায় করা হতো কৃষকদের উপর থেকে। এইসব জমিদারদের বিরুদ্ধেই শুরু হয়েছিল কৃষক বিদ্রোহ।

কৃষকদের প্রধান দাবী ছিল - ১) চাষীর হাতে জমি চাই। ২) অন্যায় কর বাতিল কর। ৩) বেগার খাটা বন্ধ কর। ৪) উচ্ছেদ হওয়া জমি দখল কর। পরে যোগ হয় ৫) প্রজার ভোটে সরকার চাই।

তেলেঙ্গানা ত্রিপুরার তুলনায় বহুগুণ বড় এলাকা। ৮টি জেলায় মুক্তাঞ্চল গঠন করে মাদ্রাজের তেলেগুভাষীদের যুক্ত করে গঠন করা হয় বিশাল অন্ধ্র। মুক্তাঞ্চলে সোভিয়েত কায়দায় 'গ্রাম সরকার' গঠন করা হয়। জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়া কৃষকদের জমি উদ্ধার করে অর্দ্ধেক অংশ জমির মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বাকী অর্দ্ধেকাংশ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

ত্রিপুরার মতই নিরস্ত্র কৃষকেরা গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে পুলিশ-মিলিটারী এবং নিজামের ভাড়া করা রেজাকার গুন্ডাবাহিনীর বন্দুক কেড়ে নিয়ে বিশাল গেরিলা বাহিনী গঠন করে, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ চালিয়ে মুক্তাঞ্চল গঠন করে এবং রক্ষা করে। নিজামের ২০ হাজার সশস্ত্র সেনা নিয়োগ করেও মুক্তাঞ্চল উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস সরকারের ঘোষিত সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবার ফলে গেরিলা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই সংগ্রামে পাঁচ হাজার কৃষক হিনত হয়েছিল। ২০ হাজারের বেশী আহত হয়েছিল। ২৫ হাজার ঘরবাড়ী আগুণে পুড়ে ধ্বংস হয়েছিল। লুণ্ঠিত হয়েছিল বহু কৃষকের সঞ্চিত সম্পদ, খাদ্যশস্য এবং নারীর ইজ্জত।

ভারতের কৃষক আন্দোলনে তেলেঙ্গানা চিহ্নিত হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনারূপে। তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত হলেও পরে তা রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন কৃষকদের পরিকল্পিত সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং কৃষকদের মূল সমস্যা সমাধানের জন্য কিরূপ সরকার গঠন করা দরকার তারও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। এটাই হল ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও বিশেষত্ব।

পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপেও কৃষকরা প্রথমে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ করেছিল পরে কমিউনিষ্টরা গিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এখানেও মুক্তাঞ্চল গঠন করে কৃষকের মুল চাহিদা জমি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গেরিলা কায়দায় অস্ত্র সংগ্রহ করে মুক্তাঞ্চল রক্ষা করার কাজে কৃষকরা বীরত্ব ও

সাহসের পরিচয় দিয়েছিল। কাকদ্বীপ হল সুন্দর বনের একটি অংশ।

ত্রিপুরারায়ও একই ঘটনা ঘটেছে। তবে ত্রিপুরার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। ত্রিপুরায় কোন জমিদার ছিল না। উপজাতি কৃষকদের মধ্যে জমির অভাব বোধও ছিল না। ত্রিপুরায় সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মহারাজার মৃত্যুর পর দেওয়ানী শাসনে পুলিশী জুলুমের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে। এখানেও যথা সময়ে কমিউনিষ্টরা প্রত্যক্ষভাবে এই সংগ্রামে যুক্ত হয়ে নেতৃত্ব দেবার ফলে রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্তার লাভ করেছে এবং একটি মতাদর্শ গত সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে মুক্তাঞ্চলে বিকল্প সরকার গঠন করে নতুন সমাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় এই সংগ্রামে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক বিবরণ জানা যায়নি। সরকারী নথিপত্র সবই উধাও হয়ে গেছে।

ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের উদ্যোগে যেসব সমাজ সংস্কারমূলক কাজ হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ—

১) ত্রিপুরী সমাজের কোন পুরুষ এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারবে না। তবে দীর্ঘদিন কোন সন্তান না হলে প্রথম স্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা যাবে।

২) বয়স্ক বিপত্নীক কোন যুবতী মেয়েকে বিবাহ করতে পাববে না। তিনি কোন বিধবা নারীকে বিবাহ করতে পারবেন।

৩) কোন রকম নারী নির্যাতন করা চলবে না। গ্রামীণ সালিশী কমিটিব সাহায্যে মীমাংসা করতে হবে।

৪) তিন পুরুষ পর্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়।

৫) বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়।

৬) উপজাতি সমাজে পণপ্রথা এবং জামাই খাটা নিয়ন্ত্রণের নিয়ম চালু করা হয়।

৭) মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ডাইনী প্রথা নিষিদ্ধ হয়।

৮) কিছু পরিমাণে জাতিভেদ প্রথা সমাজে দেখা দিয়েছিল। মুক্তি পরিষদ এ বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করে।

৯) জমি সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করা, জমি বন্টন করা ও বন্দোবস্ত দেওয়ার দায়িত্ব একটি কমিটির উপর দেওয়া হয়।

১০) বেগার খাটা নিষিদ্ধ হয়। দাদনের হার এবং সুদের হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

তখনকার সমাজে এসব পদক্ষেপ ছিল বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল। এর ফলে ত্রিপুরায় উপজাতি সমাজে জেগে উঠেছিল জাতীয়তাবাদী মর্যাদাবোধ, গভীর আত্ম বিশ্বাস, যুক্তিবাদী চেতনা এবং আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে-অভিজ্ঞতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বোধ।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতীয় গণআন্দোলনের মূল স্রোতে ত্রিপুরা

১৯৩৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথম গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি এবং ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ রাজ্যের এ দু'টি গণআন্দোলনের মঞ্চ তৈরী হয়েছিল প্রায় একই সময়ে। মহারাজা বীর বিক্রম ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার করবেন বলে ঘোষণা দেবার ফলেই গণআন্দোলনের মঞ্চ তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল।

এই সময় দুই মঞ্চেরই প্রধান দাবী ছিল – "রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার -চাই।"

ত্রিপুরায় বৃটিশ সরকারের সরাসরি শাসন ছিল না, কাজেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রশ্ন উঠেনি।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যদিও মাত্র দুই বছরের মধ্যেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে তা তখনো বুঝা যায়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দুই বছর বৃটিশ শক্তি ক্রমাগত পরাজয় বরণ করে প্রতিটি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পিছু হটেছে। এশিয়ায় - জাপান এবং ইউরোপে জার্মান বাহিনী তাদের ঘরের মত বৃটিশ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এগিয়েছে। জার্মান বাহিনী ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ঝড়ের বেগে আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। ফ্রান্স কোন প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি। দেশের এক কোণে আশ্রয় নিয়ে একটি পুতুল সরকার কোন রকমে টিকে ছিল ফ্রান্সে।

দাম্ভিক হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৪১ সালের ২২ শে জুন হঠাৎ করে প্রবল বেগে ৫০ লক্ষ ইউরোপীয় সেনাবাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সুসজ্জিত করে রাশিয়ার উপর আক্রমণ শুরু করে। অপ্রস্তুত রুশবাহিনী প্রথম দিকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। ইউরোপে তখন যুদ্ধ নেই। সর্বত্র জার্মান বাহিনীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হিটলারের সমস্ত বাহিনী এক সঙ্গে নিয়োজিত হয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে। বৃটেন বুঝতে পারল পরবর্তী ভয়াবহ আক্রমণ হবে বৃটেনের উপর। তাই দ্রুত সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হল। অথচ সোভিয়েত সরকার যুদ্ধশুরু হবার আগে থেকেই ফ্যাসীবাদ বিরোধী ফ্রন্ট করার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে বার বার প্রস্তাব দিয়েছিল। ফ্রান্স রাজী ছিল। কিন্তু বৃটেনের দাম্ভিকতার ফলে তা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের আগেই ফ্রন্ট তৈরী হলে হিটলার যুদ্ধ বাঁধাতেই সাহস পেত না। হয়তো ভয়াবহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করা যেত।

অন্যদিকে হিটলারের দুর্বার জয়ের অভিযান দেখে জাপানও ঝড়ের বেগে বৃটিশ শক্তিকে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে অত্যন্ত সাহসী হয়ে উঠে। আমেরিকা যুদ্ধে না জড়িয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও জাপান হঠাৎ করে আমেরিকার পার্ল হারবার বন্দর আক্রমণ করে বসে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ঠিক তিনদিন পরই প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ

নৌবাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে জাপান।

এই ঘটনার পরই প্রকৃত পক্ষে সারা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্র শক্তি রূপে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং বিশ্বের ২৬টি দেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে ঘোষণা করে যে তারা কোন অবস্থাতেই এককভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে না। অর্থাৎ অসংখ্য ফ্রন্টে শত্রু পক্ষকে যুদ্ধে আবদ্ধ রেখে ধ্বংস করার কৌশল নেওয়া হয়।

এই রকম জটিল এক পরিস্থিতিতে আমেরিকা বৃটেনকে চাপ দিতে থাকে যে, ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটা মীমাংসা করতে হবে যাতে যুদ্ধে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যায়।

চার্চিলের মত গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী এবং ভারত বিদ্বেষী ব্যক্তি ঐ সময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী না হয়ে যদি কোন উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যক্তি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে ভারতের সহযোগিতা লাভের জন্য তখনই ভারতে একটি স্বাধীন সরকার গঠন করতে আপত্তি করতেন না। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতারা তখন একমত ছিলেন যে, যুদ্ধ চলাকালে অন্তর্বর্তী ভারতীয় সরকার গঠন করে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব ভারত সরকারের উপর দিতে হবে এবং যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত একটি স্বাধীন দেশ হবে বলে চুক্তি করতে হবে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং আমেরিকার অনুরোধে চার্চিল স্যার স্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠিয়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বৃটিশ সরকারের একটি প্রস্তাব পাশ করাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এই মিশন ক্রিপশ মিশন নামে পরিচিত হয়েছে। বৃটিশ মন্ত্রীসভার প্রস্তাবে ভারতীয় নেতাদের প্রথম শর্তটি মেনে নিয়ে বৃটিশ মন্ত্রীদের সরিয়ে শুধুমাত্র ভারতীয়দের দিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে বৃটিশ সরকার রাজী হয়। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব সামরিক বিভাগের প্রধানের হাতেই থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়। মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে বড়লাট ভারতীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে বাঁধা দেবেন না এবং যুদ্ধের পর সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে চুক্তি করা সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে চার্চিলের যে মতামত জানা গেছে তাতে চার্চিলকে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধে বৃটিশ সরকার পরাজিত হবে এমন একটি ধারণাও অনেক নেতার মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছিল। কাজেই একমাত্র স্বাধীন ভারত সরকারই ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে সামিল হতে পারে বলে অধিকাংশ নেতা মত প্রকাশ করেন ।

জাপান এশিয়ার পরাধীন দেশগুলোকে স্বাধীন করে দেবে বলে জাপানীরা যে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিল তাও অনেককে প্রভাবিত করেছিল। ফলে স্বাধীনতা পেলেই ভারত গণতন্ত্র রক্ষার জন্য মিত্র শক্তিকে সাহায্য করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় কংগ্রেস। ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

ক্রিপস মিশন পাকিস্তানের দাবীকে অবাস্তব মনে করে এবং দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করে। ভারত স্বাধীন হবার পর দেশীয় রাজ্যগুলোতে

প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিলে বৃটিশ সরকার সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না বলেও মন্তব্য করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ক্রিপস মিশন ভারতে আসে। এই মিশনের দুটি লক্ষ্য ছিল - ১) আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতার দাবীর মীমাংসা করা। ২) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে ভারতের পূর্ণ সহযোগিতা দান নি শ্চিত করা।

ভারতীয় নেতারা বৃটিশ সরকারের দুটি দাবীই পূরণ করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু ক্রিপস মিশনের মৌখিক প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। বৃটিশ সরকার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিলেই শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়ে যেত। এই মীমাংসা সম্ভব হলে দেশ বিভাগের প্রশ্নটিও আসতো না। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত স্বাধীন দেশ বলে গণ্য হতো এবং বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হতো না।

জহর লাল নেহেরু মৌখিক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই অন্তর্বর্তী ভারত সবকার গঠনের পক্ষে ছিলেন। কারণ এরূপ সরকার গঠন হলেও বৃটিশ সরকারের পক্ষে পরবর্তী সময়ে হস্তক্ষেপ করা কঠিন হত। দেশ বিভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এড়ানো যেত। রাজা গোপালাচারী প্রকাশ্যে এরূপ মত প্রকাশ করেছিলেন।

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হবার কিছুদিন পরই জাপান বার্মা দখল করে ভারতে আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। বৃটিশ সবকার তখন ইউরোপেব যুদ্ধে ব্যস্ত। ভাবতে নতুন বাহিনী গঠন করতে না পারলে জাপানকে ঠেকানো যাবে না। বৃটিশ সবকারেব গোপন রিপোর্ট থেকে জানা গেছে ঐ সময় বাংলা-আসাম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল জাপান দখল করে নেবে এটা ধরে নিয়েই আত্মরক্ষার যুদ্ধ কৌশল স্থির করা হয়েছিল। পোড়া মাটি নীতি গ্রহণ করে বড় বড় ব্রিজ - টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস করে দেবার একটা পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গিয়েছিল।

গান্ধীজী ভাবলেন, এই সময় বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আলোচনায় বসতে বাধ্য হবে। তাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ডেকে নতুন প্রস্তাব তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং জহর লাল নেহেরু বললেন, আলোচনা যে স্তরে শেষ হয়েছে তা মনে রেখে এখন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকেই একমাত্র শর্ত হিসেবে সামনে নিয়ে আসতে হবে।

ভারতের জনগণ পূর্ণ স্বাধীনতা পেলেই বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নতুবা সারা দেশব্যাপী ভারতছাড় আন্দোলন শুরু করবে জাতীয় কংগ্রেস, এরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাপান ভারত আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় জাতীয় কংগ্রেসের ভারতছাড় আন্দোলনের ডাক বৃটিশ সরকারকে ভীষণভাবে উত্তেজিত করল। আলাপ আলোচনাব পরিবর্তে এক রাতের মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেসের সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল।

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি জেলে জাতীয় কংগ্রেসের সব নেতাদের স্থানান্তর করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করল ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বৃটিশ সরকার তা অনুমোদন করল না। কারণ সেরূপ ব্যবস্থা নিলে ভারতীয় জনগণের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পডার আশংকা ছিল।

নেতৃত্ব-হারা জনগণ সারা দেশ জুড়ে হিংস্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। গান্ধীজীর অহিংস নীতি গণআন্দোলনের চাপে অগ্রাহ্য হয়ে যায়। রেলপথ তুলে নিয়ে এবং টেলিগ্রাফ-টেলিফোন

অফিস, থানা ইত্যাদি পুড়িয়ে দিয়ে, সামরিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে জনগণ এক অপরিকল্পিত বিপ্লব সৃষ্টি করে।

কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে এটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। জনযুদ্ধের স্লোগান দিয়ে সব কমিউনিষ্ট নেতারাই এই সময় জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তারা যদি ভারতছাড় আন্দোলনে একটি পরিকল্পিত কর্মসূচীর ভিত্তিতে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতেন তাহলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় নেতৃত্বে কমিউনিষ্টরাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন।

ভারতছাড় আন্দোলন ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বশেষ স্তর। এর পরবর্তী কোন আন্দোলনেই গান্ধীজীর অহিংস নীতি কার্যকর হয়নি। বৃটিশ সরকারের দমন নীতি যেমন তীব্রতর হয়েছে তেমনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও ক্রমাগত হিংস্র রূপ নিয়েছে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি হঠাৎ বদলে যায়। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মিলিত শক্তির আক্রমণে জার্মান, জাপান এবং ইতালীর বাহিনী সর্বত্র পিছু হঠতে বাধ্য হল। বিশ্বের নানাদিকে বহু ফ্রন্টে যুদ্ধ করার মত সামরিক শক্তি জাপান, জার্মান বা ইতালীর ছিল না।

এই যুদ্ধে রাশিয়ার লাল ফৌজ এবং কৃষক-শ্রমিক স্বেচ্ছাবাহিনী অকাতরে জীবন দিয়ে দেশ রক্ষার সংগ্রামে যে সাহস এবং বীরত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। কোন ভাড়াটিয়া সেনবাহিনীর পক্ষে এ ধরনের আত্মত্যাগ অসম্ভব। স্বদেশ প্রেম এবং মানবতাবাদী মতাদর্শের প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ৫টি পর্ব শেষ হয়েছে।

ভারতে প্রকৃত গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এর আগে ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সংগঠনের সঙ্গে জনগণের কোন যোগাযোগ ছিল না। দেশের জমিদার এবং বণিক শ্রেণী আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করেছে। বছরে একবার অধিবেশন করে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং এসব প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছে আবেদন করা এটাই ছিল এই পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

স্বাধীনতা আন্দোলনের এই প্রথম পর্বটিকে বলা হয় আবেদন নিবেদনের পর্ব।১৮৮৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত ছিল এই পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন - বিশিষ্ট আইনজীবী এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যবিত্তরা। স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জেগে উঠে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম। সংগীত, সাহিত্যে, নাটকে ফুটে উঠে স্বদেশ প্রেমের গভীর আবেগ। অন্যদিকে সৃষ্টি হয় সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন এক আন্দোলনের ধারা। জন্ম হয় মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক ধারা। দ্বিতীয় পর্বের আন্দোলন চলতে থাকে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্বের গণআন্দোলন শুরু হয় ১৯২০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে। রুশ বিপ্লবের প্রভাবও এই সময় এসে যায় জাতীয় গণআন্দোলনের নতুন প্রেরণারূপে। ছোট ছোট গ্রুপে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। ক্রমে একটি ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হয় শ্রমিক শ্রেণী। এটিই হল ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন এ. আই টি ইউ. সি। কৃষকদের মধ্যেও সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। **এভাবেই এই পর্বে সৃষ্টি হয়েছে জাতীয় গণআন্দোলনের মূল স্রোত।**

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তৃতীয় পর্বে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। ১৯২৫ সালে কানপুর সম্মেলনে ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিউনিষ্ট গ্রুপগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম দেয়। জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিষ্টরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে পৃথক একটি ধারা অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাবাদী শ্রমিক আন্দোলনের ধারা সৃষ্টির দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়। ভারতের জাতীয় পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হওয়ায় কমিউনিষ্টরা শুরু থেকেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। **জাতীয় গণআন্দোলনের মূল স্রোতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম।**

লেনিন বলেছেন – পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্তরে জাতির সমস্ত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। কমিউনিষ্টদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জাতীয় নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে। এই স্তরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। লেনিনের মৃত্যুর পরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি অবহেলিত হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনে নানা ভুল ভ্রান্তিও ঘটেছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চতুর্থ পর্বটি শুরু হয়েছে ১৯৩০-৩১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। ১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস গণআন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসেবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে প্রস্তাব পাশ করেছে। ফলে গণআন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছে নবজোয়ার। সারা দেশের সমস্ত শহর ও গ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সামিল হয়েছে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী। বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর দমননীতিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের বিস্তার এক অভাবনীয় প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় জনজীবনে। ভারত জেগে উঠেছিল একটি দেশ রূপে এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ একটি শক্তি রূপে।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়'- আন্দোলনটি ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় গণআন্দোলনের পঞ্চম পর্ব। এই পর্বে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা কারাগারে বন্দী থাকা সত্ত্বেও সারা দেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তাতেই বুঝা গিয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্বে পৌঁছে গেছে। গান্ধীজীও এই পর্বে অহিংসনীতি আঁকড়ে না থেকে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর আন্দোলনের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সময়ের স্লোগান ছিল **"লড়েঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"।** অর্থাৎ লড়ব অথবা মরব। এর আগে অহিংসনীতির বাইরে এক পা এগুতেও রাজী ছিলেন না গান্ধীজী। এর জন্য অনেক সমালোচনাও শুনতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুধুমাত্র গণআন্দোলনেই সীমাবদ্ধ

ছিল না। আজাদহিন্দ ফৌজের বিচার এবং নৌবাহিনীর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে ভারতের গণআন্দোলন ক্রমশঃ গণবিদ্রোহের রূপ নিয়েছিল। বৃটিশ সরকার এই সময় নিশ্চিত হয়েছিল যে, অবিলম্বে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে সসম্মানে স্বদেশে ফিরে না গেলে ভারতে ইংরেজদের পিঠ বাঁচানো দায় হবে। ভারতীয় জনগণ গলা ধাক্কা দিয়েই বৃটিশ সরকারকে ভারতের মাটি থেকে সরিয়ে দেবে।

ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা জরুরী হয়ে উঠেছিল। জাতীয় দল ছাড়া জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের নেতারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৪৬ সালের ২৬ শে জানুয়ারী জাতীয় কংগ্রেস দলের ঘোষিত স্বাধীনতা দিবসে **ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠিত করেন** এবং রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকারের স্লোগানের পরিবর্তে প্রজার ভোটে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে ত্রিপুরায় ভারতীয় জাতীয় গণআন্দোলনের মূল স্রোতে মিশে যাবার পথ সৃষ্টি করেন।

এই ঘটনার দেড় বছর পরই ভারতের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং ত্রিপুরার মহারাজা স্বাধীন ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে ত্রিপুরায় বেশ কয়েকটি জাতীয় চেতনা সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু কোন দলেরই শক্তিশালী সংগঠন বা জনসমর্থন ছিল না।

ভারতের জাতীয় গণআন্দোলনের পাঁচটি প্রধান পর্বের সঙ্গে ত্রিপুরার জনগণ যুক্ত ছিল না। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতাও ছিল না।

ত্রিশের দশক থেকে সমাজ সংস্কারমূলক যে সব সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছে অল্পসংখ্যক ছাত্র ও যুবক। রাজধানী আগরতলা এবং কৈলাসহর, ধর্মনগর, উদয়পুর, বিলোনীয়া এই কয়টি মহকুমা শহরে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল।

১৯৩৮ সালের গণআন্দোলনের দুটি মঞ্চ মাত্র দেড় বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। তখনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত নেতা ও কর্মী সংখ্যা ছিল নগণ্য। উপজাতি প্রজাদের মধ্যে তার কোন প্রভাবও পড়েনি।

১৯৪৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবার পর জনশিক্ষা সমিতির ১১জন শিক্ষিত যুবক গ্রামের মানুষকে প্রথম আধুনিক শিক্ষার আলোয় দীক্ষা দিয়ে ঘুমন্ত জনগোষ্ঠীগুলোকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তখনো রাজনীতির কোন প্রভাব ছিল না।

রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের লক্ষ্য সামনে রেখে মহারাজা বীর বিক্রম 'ত্রিপুরা সংঘ' গঠন করে বিশ্বস্ত অনুগামীদের সংঘবদ্ধ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজার অকাল মৃত্যু না হলে এটাই হত ত্রিপুরায় উপজাতিদের প্রধান জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন।

মহারাজা জীবিত থাকলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতো এবং ত্রিপুরার রাজনীতির জাতীয়তাবাদী ধারা দ্রুত বিকাশের সুযোগ লাভ করতো। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় এবং কাশ্মীর ছাড়া বাকী সব দেশীয় রাজ্য ১৫ই আগষ্ট স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

কমিউনিষ্ট পার্টি এই সময় অতি ক্ষুদ্র একটি সেল মাত্র ছিল। ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর

এস পি-র জন্ম হয়েছিল উদ্বাস্তু আগমনেব পবে। আঞ্জুমান ইসলামিযা একটি সাম্প্রদাযিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। ত্রিপুবায এব অস্তিত্ব বক্ষা কবা সম্ভব ছিল না। ভাবতের জাতীয় গণআন্দোলনের স্রোতে প্রবেশ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না ত্রিপুবায।

ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় কংগ্রেস

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয ১৯৩৯ সালেব ১লা সেপ্টেম্বর এবং যুদ্ধ শেষ হয ১৯৪৫ সালেব ২রা সেপ্টেম্বর। এই তাবিখে জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ কবে। এব আগেই ৮ই মে জার্মান বাহিনী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছিল। ইতালীব জনসাধাবণ মুসোলিনীকে সপবিবাবে হত্যা কবে শাসনভাব জনগণেব হাতে তুলে নিয়েছিল। এপ্রিল মাসে সোভিয়েত লাল ফৌজ জার্মানীব বাজধানী বার্লিন শহব ঘেবাও কবাব পব হিটলাব সপবিবাবে আত্মহত্যা কবে। কিন্তু জাপান তখনো এশিযাব বিশাল অংশ দখল কবে বাখে। মিত্র শক্তিব আক্রমণ প্রধানত ইউরোপে সীমাবদ্ধ থাকায জাপানেব মাটিতে কোন যুদ্ধ হযনি।

ইউবোপেব যুদ্ধ শেষ হবাব পব আমেবিকা মিত্র শক্তিব কোন নেতাব সঙ্গে আলোচনা না কবেই জাপানেব নাগাসাকি ও হিরোসীমায দুটি এটম বোমা ছুঁড়ে দিযে দুটি শহবকে ধ্বংস কবে দেয। দুই লক্ষ নিবীহ নাগবিক নিহত হয এবং অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হয। যুদ্ধ যখন শেষ পর্যাযে এসেছে তখন বিনা প্রযোজনে এই ধ্বংস কার্য চালাবাব একটাই লক্ষ্য ছিল যে, আমেবিকাব হাতে এমন অস্ত্র আছে যা আব কাবো কাছে নেই এবং দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব পব সাবা বিশ্বেব সব দেশকেই আমেবিকাব কথা মত চলতে হবে এ কথা বিশ্ববাসীকে জনিয়ে দেওযা ।

এই ঘটনা বিশ্বকে আতংকিত কবে তোলে। জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ কবতে বাধ্য হয।

দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবাব পব ভাবতেব বাজনৈতিক পবিস্থিতিব আমূল পবিবর্তন ঘটে যায। বৃটেনেব সাধাবণ নির্বাচনে চার্চিলেব দল পবাজিত হয এবং শ্রমিক শ্রেণীব সবকাব প্রতিষ্ঠিত হয। ভাবতে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র যুবক-ব্যবসাযী-শিল্পপতি-সবকাবী কর্মচাবী এবং পুলিশ ও সামবিক বাহিনীব মধ্যেও স্বাধীনতাব দাবী প্রবল আকাব ধাবণ কবে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী একটি সমীক্ষকদল পাঠিযে ভাবতীয জনগণেব উত্তেজিত মনোভাবেব কথা জেনে নেন।

১৯৪৬ সালেব মার্চ মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে এক বিবৃতি দিযে ঘোষণা করেন যে ইতিপূর্বে বিভিন্ন আলোচনায দুই পক্ষই অনেক ভুল কবেছেন। বর্তমানে একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসা জরুবী প্রযোজন। ভাবতীয বাজনৈতিক নেতাদেব মধ্যে নানা মতভেদ থাকলেও হিন্দু মুসলমান শিখ-মাবাঠি ইত্যাদি সব ভাবতীয জনগণেব অন্তবেব একমাত্র দাবী হল স্বাধীনতা। ভাবতীয সেনাবাহিনী দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধে অসাধাবণ ভূমিকা পালন কবেছে। কাজেই জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভাবতীযদেব স্বাধীনতাব দাবী শান্তিপূর্ণভাবে মিটিযে ফেলাব জন্য ভাবতে একটি ক্যাবিনট মিশন পাঠাবাব সিদ্ধান্ত নেয বৃটিশ পার্লামেন্ট।

এই বকম একটি অনুকূল পবিস্থিতিতে ত্রিপুবায সদ্য জেল থেকে মুক্ত হযে আসা নেতাবা

নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় ত্রিপুরায় সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। ১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যেই অধিকাংশ নেতা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যান।

শচীন্দ্র লাল সিংহকে সভাপতি এবং উমেশ লাল সিংহকে সাধারণ সম্পাদক এবং হরিগঙ্গা বসাককে সম্পাদক করে-ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় কংগ্রেস-কমিটি গঠন করা হয়। অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা হলেন, সুখময় সেনগুপ্ত, তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত, আশু মুখার্জী, ত্রিপুর সেন, নীলু মুখার্জী, নীরোদ ভট্টাচার্য ও চিত্ত চন্দ প্রমুখরা।

১৯৩৮-৩৯ সালে গণপরিষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে যারা ভয় পেতেন তারা কংগ্রেস ভবনে আসতে শুরু করলেন। শহরের ছাত্র-যুবকদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন দ্রুত বাড়তে লাগল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের ভয় তখনো কাটেনি। তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন, চার আনা চাঁদা দিয়ে কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হতে অনেকেই রাজী ছিল না।

অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তারা প্রকাশ্যে যোগাযোগ না রাখলেও গোপনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার উৎসাহ দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সব ক্লাব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো ক্রমে ক্রমে পুনর্গঠিত হল। ক্লাবগুলোর সহযোগিতায় শহর এলাকায় গড়ে উঠল ছাত্র-কংগ্রেস। সুখময় সেনগুপ্তেব নেতৃত্বে যুব সংগঠন গড়ে উঠে। শহবেব সীমা অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলে সংগঠন গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয। প্রথমেই মহকুমা শহরগুলোতে জাতীয় কংগ্রেস কমিটি গঠন করার কাজ শুরু হয।

জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেবার দক্ষতা ছিল শচীন্দ্র লাল সিংহের। তিনি সহজেই মানুষকে আপন করে নিতে পারতেন। তাই কংগ্রেস সংগঠন গড়ার কাজে তিনিই সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে তিনি সংগঠন তৈরী করেছেন। যে কোন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতেন তিনি।

সুখময় সেনগুপ্ত ছাত্র যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন। সঙ্গে সহযোগিতা করেন তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত। সমস্ত মহকুমা শহরে অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয কংগ্রেস সংগঠন গড়ে উঠে। সঙ্গে ছাত্র যুব সংগঠনও গঠন করা হয়।

উমেশ লাল সিং অফিস পরিচালনা এবং চিঠি পত্রে যোগাযোগ রক্ষার কাজে খুবই দক্ষ ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার কাজে খুবই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন উমাকান্ত একাডেমীর বয়েজ স্কাউটের অধিনাযক। শারীরিক ব্যায়াম ও ড্রিলে খুবই পারদর্শীতা থাকায় ছাত্রদের মধ্যে সহজেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দিল্লীতে দরবার করা এবং ডেপুটেশনের কাজেও উমেশবাবু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

হরিগঙ্গা বসাক ছিলেন নীরব কর্মী। বিভিন্ন পত্রিকায় কংগ্রেসের কার্যকলাপের রিপোর্ট তৈরী করে নিয়মিত পাঠাতেন। পরে যুগান্তর পত্রিকার স ম্পাদদাতার কাজও করেন। তখন এসব কাজের জন্য কোন পত্রিকাই পারিশ্রমিক দিত না।

এই সময় ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য যে সব ষড়যন্ত্র হয় তার বিবরণ

দিয়ে হরিগঙ্গা বসাক নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠান। পাকিস্তান হবার পর শেষবার নিজের পিতৃভিটা পরিদর্শনের জন্য ঢাকায় যান। পাক পুলিশ মিথ্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশী নির্যাতনে জেলখানায় তাঁর মৃত্যু হয়। হরিগঙ্গা বসাকের ছোট ভাই হরিদাস বসাকও যুদ্ধের সময় রাজবন্দী হয়ে কারাবাস করেন। এক ছোট বোন তুলসীবতী স্কুলে হরতাল করতে গিয়ে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। এমনিভাবে বহু মধ্যবিত্ত পরিবার স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এবং শাস্তি ভোগ করেন।

ক্রমে ক্রমে কংগ্রেস দলে যোগ দেন ক্ষীরোদ সেন, শান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত, ভূবণমোহন চক্রবর্তী এবং অনিল চক্রবর্তীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

খোয়াই মহকমায় যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার ফলে সংগঠন গড়ার কাজে যাতায়াত করা খুবই কষ্টদায়ক ছিল। যদুবাবু উপজাতিদের মধ্যেও বেশ কয়েকটি সংগঠন তৈরী করেছিলেন।

শহরাঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখা গেলেও গ্রামাঞ্চলে ছিল বিপরীত চিত্র। সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রায় ছিলই না। সংবাদপত্র ছিল শহর এলাকায় শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নিরক্ষর মানুষের মধ্যে সংবাদপত্রের কোন প্রভাব ছিল না। কোন গ্রামেই তখন রেডিও ছিল না। শহরেও কম লোকের ঘরেই রেডিও ছিল।

গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সংগঠন গড়ার মত কর্মী দলও তখন সৃষ্টি হয়নি। তড়িৎবাবুর তথ্যমূলক বক্তব্য সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারত না। সুখময় সেনগুপ্তও ছিলেন ঘরোয়া সভার বক্তা। উমেশবাবু ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন না।

শচীনবাবু জেলে থাকার সময় রতনমণির বিদ্রোহী দলের কিছু বন্দীর সঙ্গে পরিচয় হয়। বিভিন্ন এলাকার নারী সংক্রান্ত ও জমি সংক্রান্ত অপরাধীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। শচীনবাবু তাদের ঠিকানা ধরে ধরে পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলে উপজাতি এলাকায় কিছু স্থায়ী সংগঠন গড়ে উঠে। এই সব সংগঠনের কর্মীরা কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে উঠে।

টাকারজলা এলাকায় অনন্ত আচার্য নামে একজন গ্রাম্য ডাক্তার নিজস্ব উদ্যোগে কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন সূর্য সেনের বিপ্লবী দলের একজন কর্মী। পুলিশের আক্রমণ এড়াবার জন্য ত্রিপুরায় এসে টাকারজলায় গ্রাম্য চিকিৎসায় জীবিকা অর্জন শুরু করেন। অনন্ত আচার্য দীর্ঘদিন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার ফলে ককবরক ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। উপজাতিদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার ফলে অল্প সময়েই ভাল সংগঠন গড়ে তোলেন। দরিদ্র উপজাতিদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবীতেই অনন্তবাবু কাজ শুরু করেন।

এই সময় দ্বিতীয় যুদ্ধ ফেরত ছাঁটাই হওয়া সৈনিকরা গ্রামাঞ্চলে নানা ধরনের অত্যাচার শুরু করে। নারীঘটিত সমস্যা বাড়তে থাকে। উপজাতি সর্দারদের নির্দেশ তারা অগ্রাহ্য করতে থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অনন্তবাবু কংগ্রেস নেতাদের সাহায্য চান। কিছুসংখ্যক ছাত্র যুবক অনন্তবাবুকে সাহায্য করার জন্য টাকারজলায় গিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসটি টাকারজলায় পালন করা হয়। তখন ঐ

এলাকায় বাঙ্গালী বসতি প্রায় ছিলই না। উপজাতি মহিলারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জাতীয় পতাকার প্রতি অভিবাদন জানিয়ে ছিল। এক বছর পরই অনন্ত আচার্য মুক্তি পরিষদের আক্রমণে নিহত হন। কংগ্রেস দলের সংগঠন কবার জন্যই এরূপ শাস্তি দেওযা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হযেছিল। এরকম আরো অনেক কংগ্রেস কর্মী বিনা দোষে মুক্তিপরিষদের কর্মীদের দ্বারা নিহত হয়েছিল।

ধর্মনগরে হিতসাধনী সভার সঙ্গে শচীন্দ্র লাল সিংহের আগেই যোগাযোগ হযেছিল। গয়াপ্রসাদ ত্রিবেদী এবং করুণাময় নাথ চৌধুরীর নেতৃত্বে ভাল সংগঠন গড়ে উঠেছিল। তারা সবাই এক যোগে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে নতুন উদ্যমে গণসংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন। শচীন্দ্রলাল সিংহ ধর্মনগরে অবস্থান করে সংগঠনাকে শক্তিশালী করার কাজে সাহায্য করেন।

সর্বত্র আশ্রয় এবং খাদ্য পাওয়া যেত না। নতুন এলাকায় সংগঠন করতে গিয়ে অনেক সময় অনাহারে দিন কাটাতে হতো। দেশের পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যাওয়ার ফলে কংগ্রেসের প্রতি অনেকের আগ্রহ বাড়তে থাকে।

অনেক জায়গায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কংগ্রেস কমিটি গঠন করার পর নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপাবার কাজ আগরতলায় সম্ভব হযনি। বাধ্য হয়ে কুমিল্লায় লোক পাঠিয়ে প্রচারপত্র ছাপিয়ে আনতে হয়েছে।

কংগ্রেস দলের কোন পত্রিকা ছিল না। কিছু কিছু সমর্থক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু খুব সংযত ভাষায় সংবাদ পরিবেষন করতে হয়।

বিলোনীয়া এবং উদযপুর মহকুমায় সক্রিয় কর্মী সংগ্রহ করে খুবই কঠিন হযেছিল। নানা রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকায় এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব দেবার মত অভিজ্ঞ লোকের অভাবে কংগ্রেস কমিটির কাজকর্ম অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ মহকুমা শহরেই এরকম অবস্থা ছিল। রাজনৈতিক চেতনার অভাবেই এমন অবস্থা দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তরা উদ্বাস্তু হয়ে আসার পর কংগ্রেসের কর্মী দলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। দেশ বিভাগের পর ক্রমাগত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে কংগ্রেস সংগঠন দ্রুত প্রসার লাভ করে রাজ্যের শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের রূপ নিতে থাকে।

আন্দোলনের প্রথম স্তরে সংগঠন গড়ে তোলাই ছিল মূল লক্ষ্য। দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার পর রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জরুরী কোন প্রয়োজন ছিল না। স্থানীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আন্দোলনের বিভিন্ন পদ্ধতি নেওয়া হয়েছিল।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা এবং ত্রিপুরাকে পাকিস্তানভুক্ত করার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করাই সে সময়ের জরুরী কাজ ছিল। এছাড়াও ছিল খাদ্য সমস্যা, যোগাযোগের সমস্যা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সমস্যা, জমি ও আবাসনের সমস্যা, সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সমস্যা। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে জনগণকে সচেতন করে তোলা ইত্যাদি।

ইতিহাসের গতিপথে অনুকূল পরিস্থিতিতে সঠিক উদ্যোগ নিতে পারলে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে ইতিহাসের গতি

থেমে যায়।

ত্রিপুরায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ যখন গঠিত হয় তখন মহারাজার প্রভাব ছিল সীমাহীন। প্রজারা ছিলেন প্রচন্ডভাবে রাজভক্ত। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রভাব খুব সামান্যই জনমনকে আলোড়িত করেছে।

গণপরিষদের উল্লেখযোগ্য আন্দোলন ছিল আগরতলায় রামনগরের মুসলিম আধিবাসীদের উচ্ছেদ বন্ধ করা। কিন্তু গেঁদু মিয়ার আঞ্জুমান ইসলামিয়ার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাবে গণপরিষদের অনুগত অধিকাংশ মুসলমান এক লহমায় পরিষদের কথা ভুলে গিয়ে গেঁদু মিয়ার দলে ভীড়ে যায়।

একইভাবে পাহাড় অঞ্চলে উপজাতি স্বার্থে গণপরিষদের ২০ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন ও প্রচার শুরু হবার পর উপজাতি এলাকায় যেসব সংগঠন গড়ে উঠেছিল ১৯৪৮ সালের মুক্তি পরিষদের কংগ্রেস বিরোধী সশস্ত্র আক্রমণের ধাক্কায় কংগ্রেসের উপজাতি সংগঠনগুলো দলবদল করতে বাধ্য হয়। বল প্রয়োগ করে মত ও বিশ্বাস বদল করার অসংখ্য উদাহরণ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায়।

কংগ্রেস সভাপতি শচীন্দ্র লাল সিংহ-রিয়াং বিদ্রোহের নেতা রতনমণির শিষ্যদের নিদারুণ দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারের দাবীতে বিলোনীয়া ও অমরপুর থেকে বনপথে হেঁটে কয়েকশ দরিদ্র রিয়াং পরিবারদের নিয়ে আগরতলায় এক অভিযান পরিচালনা করেন আগরতলা থেকে বেশ কিছু যুবক এই অভিযানে অংশ নিয়েছিল। এই সময় রাজপরিবারের সদস্য হরিকর্তা শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে রিয়াং অভিযানে যোগ দেন। এই আন্দোলনের চাপে গরীব রিয়াং পরিবারগুলোকে আর্থিক সাহায্য সহ, ঋণ মকুব এবং বনজ সম্পদ ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা দিতে রাজ্য সরকার বাধ্য হয়।

কংগ্রেস দল সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ব্যবসায়ী বা ঠিকেদাররা কংগ্রেস দলকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দিত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় করা বড়লোক হয়েছিল তারা রাজার অনুগ্রহেই ধনলাভ করেছিল। তাদের রাজভক্তি এবং কংগ্রেসভীতি দুটিই কেটে গেছে ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর।

তবুও অনেকের ধারণা ছিল কংগ্রেস দল দিল্লী থেকে অনেক টাকা পায় কাজেই কংগ্রেস দলের চাঁদা আদায়ের ব্যাপারটা হল লোক দেখানো কাজ। অথচ প্রকৃতপক্ষে দিল্লী থেকে তখন কোন আর্থিক সাহায্য পাওয়া যেত না।

১৯৪৬ সালের শেষ দিকে নোয়াখালির ভয়াবহ দাঙ্গায় শত শত রিক্ত মানুষের দল যখন উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করল তখন কেউ ভাবতেও পারেননি যে তারা আর কখনো স্বগৃহে ফিরে যেতে পারবেন না। উদ্বাস্তুদের প্রতি রাজ্য সরকারের গভীর সহানুভূতি ছিল । কিন্তু রাজ্যের অর্থভান্ডার ছিল অত্যন্ত সীমিত। রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক উমেশ লাল সিংহকে দিল্লীতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন কেন্দ্রীয় সাহায্যের আবেদন নিয়ে।

অন্তবর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে অতিদ্রুত সাহায্য পাঠাবার

ব্যবস্থা করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিও একটি চিকিৎসক দল পাঠিয়ে সাহায্য করেন। ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় কংগ্রেস প্রথম দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে একটি জেলা কমিটি হিসেবে কাজ শুরু করে। দেশ বিভাগের পর আসাম প্রদেশ কমিটির একটি জেলা হিসেবে গণ্য হয়। ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাবার পর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি রূপে কাজ শুরু করে। এভাবেই ত্রিপুরা ভারতের গণআন্দোলনের মূলস্রোতে মিশে যায়।

ফরওয়ার্ড ব্লক

গান্ধীজীর সঙ্গে তীব্র মতভেদের ফলে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সময় বিশ্বযুদ্ধেব সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুভাষচন্দ্র দাবী করেন বিশ্বযুদ্ধেব সুযোগ নিয়ে ভারতকে স্বাধীন কবতে হবে। দেশের জনগণ কংগ্রেসেব পাশে রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধেব ডাক দিলে ভাবতীয় সেনাবাহিনী জনগণের পাশে এসে দাঁড়াবে। বৃটিশ সরকার ভাবতেব স্বাধীনতা স্বীকার কবে নিতে বাধ্য হবে।

গান্ধীজীব বক্তব্য হল অহিংস নীতিব বাইরে কংগ্রেস কোন কর্মসূচীতেই যোগ দেবে না। জহরলাল নেহেরু এবং সর্দাব প্যাটেল প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন কবলেও গান্ধীজীব স্থিব সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সুভাষচন্দ্রেব পাশ থেকে সরে দাঁড়ান।

সুভাষচন্দ্রের একমাত্র স্বপ্ন ছিল ভারতের স্বাধীনতা। ভিক্ষারূপে নয় ভারতবাসীর অধিকার রূপে স্বাধীনতা তিনি ছিনিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশ বাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। এই সুযোগে ভাবতীয় সেনাবাহিনীর একাংশেব সাহায্য নিয়ে ভারত স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে।

স্বাধীন ভারতের অর্থনীতি কেমন হবে তাও এই সময় সুভাষচন্দ্র ঠিক কবে ফেলেন। জহরলালকে সঙ্গে নিয়ে স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনার রূপরেখা তিনি তৈবি কবেন। এটাই ছিল ভারতের প্রথম অর্থনৈতিক পরিকল্পনা।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অভ্যন্তবে সমস্ত বামপন্থীদের জোটবদ্ধ কবার উদ্যোগ নিলেন। গান্ধীজী তখন জেদ ধবলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি করা হবে না।

১৯৩৯ সনেব বার্ষিক অধিবেশনে গান্ধীজীর বিরোধীতা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসেব সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভী-সীতা-রামিয়া পরাজিত হলেন। গান্ধীজীর অনুগামীরা ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে অসহযোগিতা করাব সিদ্ধান্ত নিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে সভাপতির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হল। সুভাষচন্দ্র ভাবলেন কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে হলে আপোষ মীমাংসা প্রয়োজন। তিনি সব নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন রকম আপোষ প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হল না।

কংগ্রেস সংগঠনে অচল অবস্থা দেখা দেওয়ায় বাধ্য হয়ে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ

থেকে পদত্যাগ করলেন কিন্তু কংগ্রেস ছেড়ে গেলেন না। "ফরওয়ার্ড ব্লক নামে নতুন গ্রুপ গঠন করে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করলেন।

এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই বহু দল নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রচার ও সংগঠন তৈরী করার সুযোগ পেত। গান্ধীজী এ বিষয়ে কোন বাধা দিতেন না। বিপ্লবী সূর্য সেন ছিলেন কংগ্রেসেব চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সম্পাদক। তিনিই আবার গোপনে নিজস্ব বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। জহরলাল নেহেরুর পিতা মতিলাল নেহেরু এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার কংগ্রেসের নেতা ছিলেন আবার নিজস্ব উদ্যোগে-স্বরাজ্য দল-গঠন করে নির্বাচনে লড়াই করে বিপুল জনসমর্থন লাভ করেছিলেন।

কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দল গঠন করে জহরলাল নেহেরু কংগ্রেস দলের মধ্যেই সমজাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি শক্তিশালী গ্রুপ তৈরী করেন। কমিউনিষ্ট পার্টি ও বেআইনী কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকেই নিজস্ব গণসংগঠন গড়ার সুযোগ পেয়েছিল। এরকম আরো অনেক ছোট ছোট দল কংগ্রেরে মধ্যে থেকেই কাজ করতো।

কংগ্রেস দল গঠনের পর ১৮৮৫ সাল থেকে বিগত ১২০ বছরে কংগ্রেস দল বহুবাব ভেঙ্গেছে। নতুন নতুন দল তৈরী হয়েছে। বহুদল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার বহুদল কোন না কোন দলে মিশে গেছে।

কংগ্রেস দল গঠিত হবার পর প্রথম ২০ বছর নেতৃত্ব ছিল সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণপন্থীদেব হাতে। তখন কংগ্রেসদলকে জমিদারসভা বলা হত।

দ্বিতীয় পর্বে স্বদেশী আন্দোলনের সময কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল প্রগতিশীল ব্যারিষ্টার ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীবা।

তৃতীয় পর্বে শুরু হয় গান্ধীজীর নেতৃত্বে মধ্যপন্থীদের আধিপত্য। গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগে কংগ্রেস দলে নরমপন্থী এবং চরমপন্থী নামে দুটি গ্রুপ ছিল। চরমপন্থীদের লক্ষ্য ছিল জনগণের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলনকে অগ্রসর করে নেওয়া। এই মতের নেতাদের মধ্যে বিশিষ্টরা হলেন- পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়, লোকমান্য তিলক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, দাদাভাই নৌরজী প্রমুখরা।

নরমপন্থীদের সংখ্যাই ছিল বেশী। জমিদার ও বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধিরা আলাপ আলোচনাব ভিত্তিতে সুযোগ সুবিধা আদায়ের মধ্যেই কংগ্রেসের আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে লালা লাজপত রায় বলেছেন — কুড়ি বছর ধরে সুযোগ সুবিধা ও সুবিচার আদাযের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বরং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের এই দুর্বলতা দেখে উদারতার পরিবর্তে আরো কঠোর হয়েছে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের মধ্যে তিনটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে। ১) দক্ষিণপন্থী ২) মধ্যপন্থী ৩) বামপন্থী। দক্ষিণপন্থীরা স্বাধীনতা দূরের কথা স্বায়ত্ব শাসনের দাবীরও বিরোধীতা করতো। মধ্যপন্থীরা আপোষ নীতির মাধ্যমে সকলের গ্রহণযোগ্য নীতি অনুসরণের পক্ষপাতি ছিল। বামপন্থীরা সরাসরি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

জহরলাল নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে বামপন্থীরা শক্তিশালী হবার পরই

কংগ্রেস দল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পাশ করতে বাধ্য হয়।

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবার পর সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে সংগ্রাম শুরু করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। কিন্তু কংগ্রেস দলের বামপন্থী নেতারা এবং কমিউনিষ্টরা সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে একমত হতে না পারায় সুভাষচন্দ্র ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এক বছর যাবত ইউরোপের সর্বত্র বৃটিশ শক্তির পরাজয় ঘটতে থাকায় সুভাষচন্দ্র ভাবলেন দেশের বাইরে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য নিয়ে বৃটিশ সরকারকে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। যুদ্ধের পরে এরকম সুযোগ সহসা পাওয়া যাবে না।

এই সংকল্প নিয়েই সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে ছদ্মবেশ নিয়ে দেশত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র বসু আশা করেছিলেন তিনি বাশিয়ায় আশ্রয় পাবেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পাবেন। এই আশায় কাবুলে এক মাস বসে থেকে বাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মারফতে স্টালিনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য বার বার চেষ্টা করেন। রাশিয়া তখনো বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি তখন সুভাষচন্দ্রকে ফ্যাসিবাদের দালাল রূপে প্রচার করতে থাকে। ফলে স্টালিন সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন।

সুভাষ চন্দ্র বাধ্য হয়ে জার্মানীর রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। হিটলার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় এবং সাহায্যেব আশ্বাস দেন। বার্লিনে পৌছার পব হিটলাব জাপানেব সাহায্যে ভারত উদ্ধারের পরামর্শ দেন। ডুবো জাহাজে বহু কষ্টে জাপানে পৌছে বাসবিহারী বসুর সাহায্যে জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

তারপব আজাদ হিন্দ বাহিনীর ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়। হিন্দু-মুসলমান-শিখ ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভাবতীয় সেনারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিল্লী চলো অভিযান শুরু কবে। মহিলারা গড়ে তুলে ঝাঁন্সী বাহিনী। যুদ্ধে জাপানের হাতে বন্দী সমস্ত ভারতীয় সেনারা আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেয় তাছাড়াও প্রবাসী ভারতীয় যুবকেরা সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ব্যাপকভাবে অর্থ সাহায্য করে। আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে জাপানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অর্থ ও অস্ত্র ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। মণিপুরে প্রবেশ করে আজাদ হিন্দ বাহিনী স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করে।

ভারতের মাটিতে প্রবেশ করার পরও কোন রাজনৈতিক দল আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়নি। যুদ্ধের সেন্সার ব্যবস্থার জন্য ভারতবাসীও এই গৌরবময় অভিযানের কথা জানতে পারেনি। জাপান সরকার কি কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ করতে পারেনি তাও জানা যায়নি। অধিকাংশ আজাদহিন্দ সেনা দুর্গম পাহাড়ে খাদ্যের অভাবে অনাহারে মৃত্যু বরণ করেছে। এটা হল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অতি করুণ এক বেদনাদায়ক স্মৃতি।

সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ বাহিনীর কাছে নেতাজী রূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ভারতের জনগণ নেতাজীকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ বীরের আসনে স্থান দিয়েছে।

বিশ্ববাসী একটা পরাধীন জাতির অসীম সাহসী মহানায়ক রূপে সুভাষচন্দ্র বসুকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারতের যেসব রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দল নেতাজীকে ফ্যাসীবাদের দালাল রূপে চিহ্নিত করেছিল, তারা আজ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বার বার দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু নেতাজীর অন্তর্ধানের ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল, বিশ লক্ষাধিক মানুষকে দাঙ্গায় প্রাণ দিতে হয়েছিল, দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল, পরিণামে তিন কোটি মানুষ বাস্তুহারা হয়েছিল ইতিহাসের সেই ক্ষতিপূরণ কি কেউ করতে পারবেন?

নেতাজীব প্রস্তাব মেনে নিলে ১৯৪১ সালেই বৃটিশ সরকাব ভাবতেব স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বাধীন ভাবত সরকারকে মিত্র শক্তির অংশীদাব করে নিতে বাধ্য হতো। সেই মুহূর্তে বৃটিশ সরকারের সামনে আর কোন বিকল্প ছিল না।

জাতীয় কংগ্রেস নেতাজীকে সমর্থন করতে পারেনি গান্ধীজীর অহিংস নীতির অপমৃত্যু হবে বলে। কমিউনিষ্টরা সমর্থন করতে পারেনি কমিউনিষ্ট রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ছিল বলে। এ দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের বিরোধীতা নেতাজীর সপ্নকে ব্যার্থ করে দিয়েছে । ভারতের ভাগ্যও বদলে গেছে ।

প্রকৃত পক্ষে গান্ধীবাদের অপমৃত্যু ঘটেছে গান্ধীজীর জীবিত কালেই। কমিউনিষ্টদেব স্বপ্ন ভেঙ্গেছে স্বাধীন ভারতেব প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান ঘোষণাব সঙ্গে সঙ্গেই।

এই ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুভাষচন্দ্র ফবওয়ার্ড ব্লকেব একক প্রতিষ্ঠাতা হলেও তিনি ফবওয়ার্ড ব্লককে আলাদা একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে তোলাব উদ্যোগ নেননি। কারন সেই সময় কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে শক্তিশালী দল গঠন কবাব সুযোগ ছিলনা ।

১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দলের সব নেতাদেব গ্রেপ্তাব করার পব সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরা নেতাহীন জনগণের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। 'ভারতছাড়' আন্দোলন শেষ হবার পরই ফরওয়ার্ড ব্লক একটি আলাদা দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী সময়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের মধ্যে নেতাজীর দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীর ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। দুবার দলে ভাঙ্গণ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লকের একটি অংশ সমাজবাদী পার্টিব সঙ্গে মিলে প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টি গঠন করে। পরবর্তী সময়ে নেতাজীপন্থী এবং মার্কসবাদী এই দুই ভাগে বিভাজন ঘটে।

ত্রিপুরায় ১৯৪৭ সালে প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লক পার্টি হিসাবে আবির্ভূত হয়। নেতৃত্ব দেন, দ্বিজেন দে, শৈলেশ সেন, গোপী বল্লভ সাহা, হীরেণ নন্দী, অনিল দাশগুপ্ত, সতীভরদ্বাজ, কমলা রঞ্জন তলাপত্র, হৃষিকেশ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। বীর বল্লভ সাহা ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্র নেতা।

প্রথম দিকে আগরতলা শহরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল পরে ক্রমশঃ বিভিন্ন মহকুমায় শাখা সংগঠন গড়ে উঠে। উদ্বাস্তু আন্দোলনে ফরওয়ার্ড ব্লক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। উদ্বাস্তুদের জন্য বেসরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাদের

বিশেষ অবদান রয়েছে।

ত্রিপুরায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন নেতাজী পন্থী। এখানে মার্কসবাদী গ্রুপ তৈরী হয়নি।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী ছিলেন, ১) অনিল দাশগুপ্ত (আগরতলা-১), ২) দ্বিজেন দে (আগরতলা-২), সুরেন্দ্র কুমার শীল (সাব্রুম) এই নির্বাচনে কেউ জিততে পারেননি।

দ্বিতীয় নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা পি এস পি দলে মিশে গিযে নির্বাচনে ১২জন প্রার্থী দেন। সকলেই পবাজিত হন। দ্বিজেন দে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও ত্রিপুরায় পি এস পি দলের ১০জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন ৪র্থ নির্বাচনে ফবওয়ার্ড ব্লক বা পি এস পি'র কোন প্রার্থী ছিল না। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক নাম নিয়ে নতুনভাবে দল গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা শরু করে ফরওয়ার্ডে ব্লক নেতারা। পি এস পি দল বিলুপ্ত হয়ে যায়। ২জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে এবাবও পরাজিত হয়। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টে যোগ দিযে অল ইন্ডিযা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রথম জযের মুখ দেখতে পায় । তারপর থেকে বামফ্রন্টের শরিক হিসেবে গণআন্দোলনেব নতুন ধারায় সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক ।

আর এস.পি

ত্রিপুরায় জাতীয় রাজনীতির মুখপাত্র রূপে যে দলগুলো টিকে রয়েছে আর এস পি তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৭ সালে উদ্বাস্তু আগমনের পর ত্রিপুরায় এই দল গড়ে উঠেছে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, খাদ্য আন্দোলন এবং ছাত্র আন্দোলনে কিছু অবদান থাকলেও ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্টের শরিক হওয়ার আগে এই দলের কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না।

১৯৭৭ সাল থেকে বামফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে উদয়পুরের দুটি আসনে (রাধা কিশোরপুর এবং শালগড়া) আর এস পি প্রার্থীরা জয়ী হয়ে আসছেন। পাঁচটি বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় আর এস পি'র একজন করে মন্ত্রী স্থান পেয়েছেন। ১ম ও ২য় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী ছিলেন যোগেশ চক্রবর্তী, ৩য়,৪র্থ ও ৫ম বামফ্রন্ট মন্ত্রী সভায় গোপাল দাস আর.এস.পি দলের মন্ত্রী হয়েছেন ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচন হল গণআন্দোলনের সর্বোচ্চ রূপ। নির্বাচন উপলক্ষে সব দলের নীতি, আদর্শ, নেতা ও কর্মসূচীর সঙ্গে পরিচিত হয় জনগণ। কোন রাজনৈতিক দল বা জোটের সামগ্রিক কাজকর্মের বিচার বিশ্লেষণ করে জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটে নির্বাচিত হলে পরবর্তী নির্বাচনে তার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেন ভোটাররা। সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় আর এস পি দলের নেতা ও কর্মীরা সততার সঙ্গে জনগণের পাশে থেকে কাজ করে চলেছেন এবং জনগণের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। নতুবা ২৫ বছর ধরে একা ধারে প্রতিটি নির্বাচনে জয়লাভ করা সম্ভব হত না।

আর এস পি দল ছোট হলেও আদর্শগত নিষ্ঠা এবং দলীয় শৃঙ্খলা এই দলের অস্তিত্ব রক্ষায় পক্ষে সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় দলের নেতৃত্ব রয়েছেন- মোবারী সাহা, চিত্ত সাহা, পান্নালাল ঘোষ, জয়গোবিন্দ দেবরায়, কালিপদ চক্রবর্তী, দীপক দেব,মানিক বায়, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রমুখরা । তাদেরই নেতৃত্বে পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর. এস.পি দল ।

১৯৩০-এর দশকে বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির একদল নেতা জেলখানায় মার্কসবাদে দীক্ষা নিলেও জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার পর কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের বাধ্যবাধকতায় ভারতের শ্রমিক আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা মনে করেন।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়েছে ১৯২৫ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত ভারতের বিভিন্ন এলাকার ছোট ছোট কমিউনিষ্ট গ্রুপগুলোর ঐক্যবদ্ধ সম্মেলনে।

জন্মলগ্ন থেকেই কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হয। দলের প্রথম সারির নেতাদের গ্রেপ্তার করে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দেওয়া হয।

১৯৪২ সালে 'ভারতছাড়' আন্দোলনের এক মাস আগে জুলাই মাসে কমিউনিষ্ট পার্টি প্রথম প্রকাশ্যে কাজকর্ম শুরু করে। বেআইনী অবস্থায় কংগ্রেস দলের মধ্যে থেকেই পার্টি বিভিন্ন সংগঠন ও গণআন্দোলন পরিচালনা করেছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের নানা বিভ্রান্তির প্রভাবে ভারতের কমিউনিষ্ট নেতারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বার বার ভুল পদক্ষেপ নিয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোত ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা। লেনিনের নির্দেশ মত এই আন্দোলনে জাতীয় জীবনের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণআন্দোলনে সামিল করাই ছিল কমিউনিষ্টদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে স্টালিন সিদ্ধান্ত করেন যে ভারতের বুর্জোয়ারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প বাণিজ্য পরিচালনা করছে। কাজেই তাদের স্বার্থ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ অভিন্ন। অতএব স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশীয় বুর্জোয়াদের কোন প্রকার প্রগতিশীল ভূমিকা থাকতে পারে না।

তাই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কংগ্রেস দল হল বুর্জোয়াদের পার্টি। কাজেই এই পার্টির সঙ্গে কমিউনিষ্টদের কোন প্রকার মিত্রতা চলতে পারে না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই কমিউনিষ্ট নেতারা গান্ধী, নেহেরু এবং সুভাষচন্দ্রকে বুর্জোয়াদের দালাল বলে ঘোষণা দিয়ে দেশবাসীর আস্থা হারিয়েছে।

অথচ গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস লেনিনের নির্দেশিত পথেই চলছিল। দেশের সমস্ত স্তরের মানুষেরা কংগ্রেসের মঞ্চকে ব্যবহার করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সামিল হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রথম পর্বে বহু উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিজিবী মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, এমনকি জমিদার ও শিল্পপতি পরিবারের যুবকেরা কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ

দিয়েছিলেন। লন্ডন-প্যারিস ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে দেশে ফিরে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন বহু যুবক।

অন্যদিকে অনুশীলন, যুগান্তর ও অন্যান্য বিপ্লবী দলের সাহসী-আত্মত্যাগী ও মানবতাবাদী যুবকেরা রুশ বিপ্লবের ইতিহাস শুনে মার্কসবাদী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দলে দলে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন।

এ জন্যই নীতিগত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে কমিউনিষ্ট সংগঠন শক্তিশালী হয়ে উঠে।

১৯২৫ সালে কানপুরে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের সময় পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। শুরুতে কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের শহরাঞ্চলে কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করে। কানপুর এবং পাটনায় ও সংগঠন গড়ে উঠে।

শ্রমিক আন্দোলনের চেহারা দেখেই বৃটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা-মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ও পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান কমিউনিষ্ট নেতাদের বন্দী করে কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করে।

কমিউনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়ে মিত্র শক্তির পক্ষে কাজ শুরু করে। এই সময় শুরু হয় জাতীয় কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলন।

বৃটিশ সরকার যুদ্ধের এই জটিল মুহূর্তে কমিউনিষ্টদের সমর্থন অত্যন্ত জরুরী বিবেচনা করে সমস্ত কমিউনিষ্ট বন্দীদের মুক্ত করে দেয়।

কমিউনিষ্ট পার্টি 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়। দেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের ব্যাপকতাকে উপেক্ষা করে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গান্ধীজী সহ সমস্ত কংগ্রেস নেতারাই তখন জেলে। এই সময় গণআন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে কমিউনিষ্টরা অনায়াসে জাতীয় আন্দোলনের পুরো ভাগে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন।

১৯৪৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি বোম্বে শহরে সংগঠিতভাবে প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত করে। এই উপলক্ষে প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশ করা হয়। এই সময় সারা ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫,৫৬৩জন।

তখন কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচী রূপায়ণের পক্ষ্যে বহু সংগ্রামী পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সদস্য পদ দেওয়া হত। পার্টির প্রতিটি সদস্যই ছিলেন একেক জন নেতা। কোন না কোন সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে পারে এমন লোকদেরই পার্টি সদস্য করা হতো।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ লগ্নে কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে অনুশীলন দলের বীরেন দত্ত, অনন্ত দে, নলিনী সেগুপ্ত কমিউনিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে জেল থেকে মুক্ত হয়ে আগরতলায় কমিউনিষ্ট সংগঠন তৈরী করতে উদ্যোগী হন। প্রকাশ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি করার মত সুযোগ তখনো সৃষ্টি হয়নি। বীরেন দত্তের স্মৃতি কথা থেকে জানা যায় কুমিল্লাতেও তখনো অনুমোদিত কোন জেলা কমিটি ছিল না। জেল ফেরত অনুশীলন দলের নেতারা নিজেদের কমিউনিষ্ট পরিচয় দিয়ে সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন। সারা ভারতেই কমিউনিষ্ট

পার্টি তখন বেআইনী ঘোষিত।

বীরেন দত্ত কিছুসংখ্যক ছাত্র ও যুবকের মধ্যে কমিউনিষ্ট চিন্তা ধারা প্রচার শুরু করেন। কুমিল্লায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে এক প্রতিনিধি দল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন জেলখানায় থাকাকালেই। ১৯৩৮ সালের মে মাসে কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বীরেন দত্তের ভাই জিতু দত্ত উদ্যোগ নিয়ে প্রতিনিধি দল নিয়ে কৃষক সম্মেলনে যোগ দেন।

১৯৩৩ সালের ১০ই আগষ্ট থেকে ১৯৩৮ সালের ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত বীরেন দত্ত জেলে বন্দী ছিলেন। ১৮ই আগষ্ট মুক্তি পেয়ে পার্টি সংগঠন গড়ার চিন্তা ভাবনা করেন। এই সময় কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারী পি সি যোশীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। যোশী ত্রিপুরার পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনেই এখানে প্রকাশ্যে পার্টি গড়ার পরিবর্তে সমাজ সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে জনমত সংগঠিত করার পরামর্শ দেন।

এ বছরই আগষ্ট মাসে বংশীঠাকুর এবং প্রভাত রায়ের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্য জনমঙ্গল সমিতি গঠিত হয়। বীরেন দত্ত অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে এই সমিতির সদস্য হয়ে যান। বংশীঠাকুর ও প্রভাত রায়ে সঙ্গে থেকে পাহাড় অঞ্চলে জনসংযোগ এবং সংগঠন গড়ার সুযোগ লাভ করেন বীরেন দত্ত। মাত্র এক বছর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বীরেন দত্ত, প্রভাত রায়, বংশী ঠাকুর সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বীরেন দত্ত সহ অন্যান্য নেতারা মুক্তি পেয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তখন ত্রিপুরায় সব রকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং প্রচার সমাবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এই সময় বীরেন দত্ত উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্রদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর-'জনশিক্ষা সমিতি' - গঠন বীরেন দত্তের এই পরিশ্রমেরই ফল।

১৯৪৬ সালের ২৬ শে জানুয়ারী জাতীয় কংগ্রেস দল গঠিত হবার পর ত্রিপুরায় একট কমিউনিষ্ট সেল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিউনিষ্ট পার্টির অনুমোদিত কুমিল্লা জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল।

অনুশীলন দলের আরেক নেতা দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত আট বছর জেল খেটে কমিউনিষ্ট হয়ে ফিরে আসেন। ১৯৩৭ সাল থেকে এক ষড়যন্ত্র মামলায় ৮ বছরের সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন।

১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে সম্পাদক করে কুমিল্লা জেলা কমিটির অধীনে আগরতলায় একটি কমিউনিষ্ট সেল গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন বীরেন দত্ত, জীতেন দত্ত, শান্তি দত্ত, অনন্ত দে, নলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত, গোপাল দত্ত, সুশীল দেববর্মা, কান্তি দেববর্মা। ছাত্র-যুবকদের মধ্য থেকে এই সেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কানু সেনগুপ্ত, বেনু সেনগুপ্ত, রবি দত্ত, নীলু চৌধুরী, মহেন্দ্র দেববর্মা,বঙ্কিম চক্রবর্তী আন্দামান জেল থেকে ফিরে এসে কমিটিতে যোগ দেন।

১৯৪৮ সালে কলকাতায় কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশীকে হটিয়ে বি. টি. রণদিভের নেতৃত্বে অতি বামপন্থী, হঠকারী ও অতি সংকীর্ণতাবাদী কর্মসূচী গ্রহণ করে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়'- শ্লোগান দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক

দেয় কমিউনিষ্ট পার্টি। এর ফলে কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়। নেতারা বন্দী হন। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পার্টি নিষিদ্ধ থাকে।

ত্রিপুরায় গণমুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার ফলে ১৯৫০ সালে গণমুক্তি পরিষদের সদস্যারা একযোগে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয় ফলে ত্রিপুরায় এক শক্তিশালী কমিউষ্টি পার্টির জন্ম হয়। অল্পদিনের মধ্যেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক গোপন সভায় মিলিত হয়ে রণদিভেকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। পলিটব্যুরোর সদস্যদের সাসপেন্ড করা হয় এবং রাজেশ্বর রাওকে সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

কিন্তু রাজেশ্বর রাওয়ের কর্মসূচীও ছিল আরেক রকম বিচ্যুতি। তিনি বললেন, চীনের পথই হবে ভারতের পথ। পার্টিতে আবার প্রচন্ড বিতর্ক শুরু হয়। রাজেশ্বর রাও, এস এ ডাঙ্গে এবং ঘাটে তিন কেন্দ্রীয় শীর্ষনেতাকে মস্কোতে গিয়ে স্টালিনেব সঙ্গে পরামর্শ করতে পাঠানো হয়। গোপনে মস্কোতে গিয়ে তিন নেতা স্টালিনের সঙ্গে দেখা করেন। স্টালিন সব কিছু শোনার পর বললেন, জনযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা ত্যাগ করা খবই ভুল কাজ হয়েছে। বিশেষত স্টালিনগ্রাডে হিটলার বাহিনীর পরাজয়েব পব লাল ফৌজ যখন তীব্র গতিতে ইউরোপে প্রবেশ করেছে তখনই ভারতের পার্টি পবিস্থিতির মূল্যায়ন করে বলিষ্ঠভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা নিতে পারতো।

রাজেশ্বর রাও জবাব দেন তখন পূর্ব সীমান্তে জাপানী বাহিনী ভারত আক্রমণের জন্যা প্রস্তুত হয়েছিল।

এক্ষেত্রে স্টালিনের জবাব হল, তাহলে আপনারা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। খবর নিলেই জানতে পাবতেন যে বৃটিশ বা আমেরিকার সরকার সোভিয়েতকে কোন সাহায্যই দেয়নি। সোভিয়েত দেশ এককভাবে আক্রান্ত হবার সময় বর বার যুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য সোভিয়েত সরকারের অনুবোধে তাবা সারা দেয়নি। লাল ফৌজ যখন ইউরোপে প্রবেশ করছে তখন সোভিয়েত প্রভাব ক্ষুন্ন কবার লক্ষ্যেই মিত্র বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছে।

'চীনের পথ ভারতের পথ'— এই স্লোগান প্রসঙ্গে স্টালিন বলেন, চীনের পথ ভারতের পথ হতে পারে না। চীনের সঙ্গে ভারতের কোন মিল নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু অত্যন্ত জনপ্রিয়। চীনের তুলনায় ভারতের রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক উন্নত। ভারত সরকারের হাতে আছে অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং অতি আধুনিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত সামরিক বাহিনী। চীনা পার্টির শক্তিশালী কৃষক সংগঠন ছিল যা ভারতের পার্টির নেই। চীনের সেনা বাহিনীর একটা অংশ পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। তাছাড়া সোভিয়েতের সঙ্গে চীনের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে যার ফলে সোভিয়েত সাহায্য পাঠানো সহজ হয়েছে। ভারতের সেবকম সুযোগ নেই।

মস্কো থেকে তিন নেতা ফিরে এসে কলকাতায় এক গোপন সম্মেলন আহ্বান করেন। রাজেশ্বর রাওকে সরিয়ে অজয় ঘোষকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক করা হয়। ভারতের সংবিধান

মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী অবস্থা থেকে মুক্ত হয় । অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য পার্টি প্রস্তুতি চালায়।

ত্রিপুরায় নির্বাচনী প্রস্তুতি চলাকালেও দশরথ দেবের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি থাকে এবং ধরিয়ে দিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার ঘোষণাও অক্ষুণ্ণ থাকে। নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে পার্লামেন্টে যোগদানের পরই গ্রেপ্তারী পরোয়না এবং পুরস্কার ঘোষণা তুলে নেওয়া হয়।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেলেও পার্টি ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

" এ আজাদি ঝুটা হ্যায়" স্লোগান যারা দিয়েছিলেন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ভারতবাসী সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। তখন পর্যন্ত সব কমিউনিষ্টরাই বিশ্বাস করতো যে, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং সমাজতন্ত্র ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতা আসে না।

১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্ট পার্টি কেরালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে নাম্বুত্রিপাদের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করল।

১৯৫৯ সালে অমৃতসর পার্টি কংগ্রেসের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়েও পার্টি ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কমিউনিষ্ট সরকারকে বুর্জোয়ারা কর্মসূচী রূপায়ণের সুযোগ দিবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

আসলে এসব নির্ভর করে পার্টির কর্মসূচী এবং রণকৌশল নির্মাণে বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন, গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন এবং শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করার ক্ষমতার উপর।

ত্রিপুরায় নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি অগ্রসর হয়েছে। ১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর পার্টি তিনবার ভেঙ্গেছে। ১৯৬৪ সালে সি পি আই এবং সি পি আই (এম) নামে দুটি দলে পার্টি বিভক্ত হয়েছে। আবার ১৯৬৯ সালে সি পি এম ভেঙ্গে সি পি আই (এম এল) নামে আরেকটি ছোট দল সৃষ্টি হয়েছে। সারা ভারতে কমিউনিষ্টরা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে নতুন নতুন দল গড়েছে। পার্টির এই ভাঙ্গনের ফলে গণসংগঠন এবং গণআন্দোলনেও ভাঙ্গন এসেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতের গণআন্দোলনের মূল স্রোত কোনটি তা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গণআন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা।

স্বাধীনতার পর ভারতের গণআন্দোলনের মূল লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে উপনিবেশিক অর্থনীতির পুনর্গঠন। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি অর্থনীতির উন্নয়ন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য,বাসস্থান ও কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এক কথায় বলতে গেলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হল ভারতীয় সংবিধানের মূল লক্ষ্য।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতার ৫৫ বছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটেছে। কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট এই দুটি জাতীয় রাজনৈতিক শক্তি ত্রিপুরার উন্নয়নে বিরাট অবদান রেখেছে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য ও সৃষ্টি হচ্ছে সমান তালে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র, মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অসাম্য দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে। সামাজিক ন্যায়বিচার অবহেলিত হচ্ছে। সমাজ জীবনে অপরাধীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। বেকার সমস্যাও বাড়ছে দ্রুত গতিতে।

মোট কথায় নতুন একটি গণআন্দোলনের পরিস্থিতি পরিপক্ক হয়ে উঠছে যা সমাধানেব জন্য ব্যাপক একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলা প্রয়োজন। শুধু বামফ্রন্ট নয় বাম-গণতান্ত্রিক জোট গঠন করেই নতুন পরিস্থিতিব মোকাবেলা করা সম্ভব বলে সি পি আই মনে করে।

ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘ

১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুবা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার পর তিন মাসের মধ্যেই স্বাধীন ভারতেব প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান গৃহীত ও ঘোষিত হয়। ১৯৫০ সালেব ২৬ শে জানুয়ারী সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুবায়ও প্রজাতান্ত্রিক দিবস পালিত হয়।

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫২ সালেব প্রথম দিকে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ত্রিপুরায় কোন দায়িত্বশীল সরকাব না থাকায গ- শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে গণ্য হয়। লোকসভায় সরাসরি ভোটে ২টি আসনে এবং বাজ্যসভায একজন প্রতিনিধি নির্বাচন কবার জন্য ৩০ সদস্য বিশিষ্ট ইলেকটোবেল কলেজ গঠনের সিদ্ধান্ত হয।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনেব সময জাতীয কংগ্রেস ছাড়া বাকী সব দলই ছিল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপ মাত্র। কোন দলেরই কোন গণসংগঠন গড়ে উঠেনি। দেশেব ক্ষমতা কংগ্রেস দলের কাছে হস্তান্তর হবার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যেও স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস দলেব প্রতি সাধাবণ মানুষের সমর্থন সৃষ্টি হয়।

সমতলে কমিউনিষ্টদেব বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষমূলক প্রচার চলতে থাকায় কমিউনিষ্টদের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালনোই কঠিন হয়ে উঠে। কাজেই কংগ্রেস বিরোধী একটি গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর জেলবন্দী নেতাদের মুক্তি দেওয়া শুরু হয়।

এই সময় ভারতের অন্তবর্তী সরকারের ডেপুটি স্পীকার অনন্ত শয়নম আয়েঙ্গার গ-শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোতে বিধানসভার দাবীতে ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ তারিখটিকে দাবী দিবস হিসেবে পালন করার আহ্বান জানান। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবীই ছিল এই দাবী দিবসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বীরেন দত্ত বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জীতেন পালকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন। জীতেন পাল কমিউনিষ্টদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন না করলে ও রাজ্যের শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এক জোট হয়ে কাজ করতে রাজী

হয়ে যান। ত্রিপুরায় বিধানসভা এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে সারা রাজ্যে দাবী দিবস পালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এক সভায় আহ্বান জানান।

বিভিন্ন মহল থেকে দারুণ সাড়া পাওয়া যায়। এমন কি জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতা সুখময় সেনগুপ্তও এই সভায় যোগ দেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে আসেন বীরবল্লভ সাহা। বিশিষ্ট আইনজীবীরাও এই সভায় যোগ দেন।

এই সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ তারিখে দরবার মাঠে – বর্তমান শিশু উদ্যানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দাবী দিবসের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত হয়ে উদ্যোক্তারা পরবর্তী একটি সভায় মিলিত হয়ে **ত্রিপুরা গণতান্ত্রিক সংঘ** নামে একটি স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি হন এডভোকেট নিবারণ ঘোষ এবং সম্পাদক হন- জীতেন পাল। অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা ছিলেন - সুখময় সেনগুপ্ত, বীরবল্লভ সাহা, বীরচন্দ্র দেববর্মা, প্রভাত রায়, বংশীঠাকুর, বীরেন দত্ত, সরোজ চন্দ, হাসি রায়, অনুরূপা মুখার্জী প্রমূখরা।

গণআন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়।

কিন্তু নির্বাচন যতই কাছে এল গণতান্ত্রিক সংঘের নেতাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ ততই তীব্র রূপ নিল। এটা একটা রাজনৈতিক দল নাকি একটা সাধারণ মোর্চা হিসেবে কাজ করবে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গণতান্ত্রিক সংঘ ভেঙ্গে যায়।

বীরচন্দ্র দেববর্মা, বংশী ঠাকুর, প্রভাত রায় – বীরেন দত্ত – গণতান্ত্রিক সংঘকে বিলুপ্ত হতে দেননি। নতুন কমিটি গঠন করে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান সহযোগী মোর্চা হিসেবে-গণতান্ত্রিক-সংঘকে নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করে সাফল্য অর্জন করা সহজ হয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণতান্ত্রিক সংঘের জোট প্রার্থী হিসেবে বংশী ঠাকুর, বীরচন্দ্র দেববর্মা, নন্দলাল চক্রবর্তী, এবসাদ আলী চৌধুরী এবং মণীন্দ্র চৌধুরী নির্বাচনে জয়ী হন।

ত্রিপুরায় বিধানসভা থাকলে ত্রিপুরাতেই প্রথম অকংগ্রেসী বাম-গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হত। এই পরিস্থিতি প্রভাত রায় অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। এ জন্যই তিনি যে কোন ভাবেই হোকপ্রভাত রায় প্রজামন্ডল গঠন প্রক্রিয়ার সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের এক প্রবন্ধে লিখেছেন "দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন করা যে কত বিপজ্জনক এবং আবরণ ছাড়া যে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যাইবে না তাহা কেহই বুঝিতে চাহিল না"। রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে গণতান্ত্রিক সংঘ সারা রাজ্যে মহারাজার প্রভাত রায় প্রজামন্ডল গঠন প্রক্রিয়ার সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের এক প্রবন্ধে লিখেছেন "দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন করা যে কত বিপজ্জনক এবং আবরণ ছাড়া যে ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হওয়া যাইবে না তাহা কেহই বুঝিতে চাহিল না"। রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে গণতান্ত্রিক সংঘ সারা রাজ্যে

সি পি আই এম

ভারতের রাজনীতিতে সি পি আই এম দলের জন্ম হয়েছে ১৯৬৪ সালে। সি পি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন ভাগের এক অংশ আলাদা হয়ে গিয়ে নতুন দল গঠন করেছিল। কিন্তু সি পি এম দল দাবী করে এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯২০ সালে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ইতিহাসে সি পি এম দলের প্রতিষ্ঠা বছর হিসেবে ১৯৬৪ সালকেই স্বীকৃতি দেওযা হয়েছে।

১৯৫৮ সালের অমৃতসহ পার্টি কংগ্রেসে অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯২৫ সালের ২৬ শে ডিসেম্বরকে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আন্তর্জাতিক দলিলে সেটাই গৃহীত হয়েছে।

১৯২০ সালে তাসখন্দে সাতজন প্রবাসী ভারতীয়কে নিয়ে এম এন রায় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল মস্কোতে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকের সভায় ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এম এন বায় ঐ কমিটি থেকে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকে যোগ দেন। এই কমিটির কোন সদস্যই ভারতে ফিরে আসেননি। পরবর্তী সময়ে এই কমিটির কোন সভা হয়েছিল কিনা তাও জানা যাযনি। এম. এন.রায় দেশে ফিরে এলেও কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকে সরে যান ।

কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিকেব সভায় এম এন রায ভাবতের পরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন লেনিন তা প্রত্যাখ্যান কবেন। জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করে কমিউনিষ্টদের কর্তব্য সম্পর্কে লেনি যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা বিপুল ভোটে গৃহীত হয়। এম এন রায় ভারতে এসে দেশের প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। কমিউনিষ্ট আন্দোলন থেকেই সবে যান। লেনিনের মৃত্যুর পর ভারতের প্রকৃত অবস্থা না জেনেই স্টালিন এম এন রায়ের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে ভারতের আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের কর্তব্য সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

রুশ বিপ্লবের পরেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলো জন্ম নিতে থাকে। সব দেশের কমিউনিষ্টরা যাতে একই দৃষ্টিভঙ্গীতে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জনাই, ১৯১৯ সালে মস্কোতে 'কমিউনিষ্ট আন্তর্জাতিক' নামে সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত সব দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষে এই সংগঠনের সিদ্ধান্ত অনুসরণ কবা ছিল বাধ্যতামূলক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র শক্তির চাপের ফলে স্টালিন এই সংগঠন ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন। তখন থেকে প্রতিটি দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি নিজস্ব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে স্বাধীনভাবে কর্মসূচী ও রণকৌশল তৈরী করতে শুরু করে। এই সময় থেকেই ভারতেব কমিউনিষ্ট পার্টিতে তীব্র মতভেদ ও বিভাজন পর্ব শুরু হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় মাওবাদী বিভ্রান্তি। এর ফলেই পার্টি বিভক্ত হয়।

মূল মতভেদ দেখা দেয় স্বাধীন ভারতের শাসকদল কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে।

উগ্রবামপন্থীদের মত হল কংগ্রেস হবে কমিউনিষ্টদের এক নম্বর শত্রু। কংগ্রেসদলকে

ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করাই হবে গণআন্দোলনের মূল লক্ষ্য। কারণ কংগ্রেস দল হল সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া জমিদারদের পার্টি।

ডাঙ্গের নেতৃত্বে অন্য গ্রুপটির বক্তব্য হল সারা ভারতে কমিউনিষ্টদের শক্তি অতি নগণ্য। সমস্ত বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হলেও ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। মিত্রশক্তি হিসেবে কংগ্রেসের সঙ্গে কর্মসূচী ভিত্তিক সমঝোতা করা সম্ভব। গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই তিনটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের সঙ্গে মিত্রতা করা সম্ভব। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতার ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষতার নীতিও সমর্থন যোগ্য। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যেসব সংকট সৃষ্টি হবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ঐক্য এবং সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করে কংগ্রেস প্রভাবিত জনগণকে সংগ্রামে সামিল করতে হবে। এটাই হবে বর্তমান বিপ্লবের স্তরে সঠিক পথ।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কেরালায় কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হবার পর কমিউনিষ্টদের দীর্ঘকালের ধারনা সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ক্ষমতা দখল করা যাবে না—এই বিশ্বস দ্রুত বদলাতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীটা বদলে গেছে তার বিশ্লেষণ করার জরুরী প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬০ সালে মস্কোতে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের ৮১টি কমিউনিষ্ট পার্টির এক সম্মেলনে বিশ্ব পরিস্থিতির বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর সর্বসম্মত এক দলিল গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে ভারতেব প্রতিনিধি ছিলেন ১) অজয় ঘোষ, ২) এস এ ডাঙ্গে, ৩) ভূপেশ গুপ্ত, ৪) নাম্বুদ্রপাদ, ৫) রামমূর্তি, ৬) বাসবপুন্নায়া, ৭) সুন্দরাইয়া।

এই দলিলের মূল কথা ছিল - বিশ্বে দুই বিপরীত সমাজ ব্যবস্থা বাস্তব রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিরোধ প্রধান হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য ও বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী কমিউনিষ্টদের কর্মসূচী ও রণকৌশল স্থির করতে হবে। সব পুঁজিবাদী দেশেরই বুর্জোয়াদের একটা বড় অংশ বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা নিচ্ছে। কমিউনিষ্টরা যুদ্ধের বিপদ থেকে পৃথিবীকে চিরতরে মুক্ত করতে চায় এই বিশ্বাস বাড়ছে। বিশ্ব পরিস্থিতির এই নতুন বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুই শিবিরে বিভক্ত পৃথিবীতে মানব কল্যাণের স্বার্থে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সম্ভব। কমিউনিষ্ট পার্টিগুলোকে অবিরাম শ্রেণী সংগ্রাম চালাবার উপযোগী শক্তিশালী গণসংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ঐক্য এবং সংগ্রামই হবে গণআন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য।

নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বদেশী অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা হবে কমিউনিষ্টদের কর্তব্য। জাতীয় বুর্জোয়ারা দোদুল্যমানতা কাটিয়ে যাতে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটের শরিক হতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। এরূপ জোটে সদ্য স্বাধীন পিছিয়ে পড়া দেশগুলোতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কম। গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে কমিউনিষ্টদের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পুরাতন ব্যবস্থা থেকে নতুন পথ সোজা পথে চলে না। আঁকা বাঁকা পথ ধরে নতুনের আবির্ভাবকে

এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটাই ছিল ৮১ পার্টি দলিলের মূল কথা।

১৯৬০ সালে মস্কোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের যেসব প্রতিনিধিরা ৮১ পার্টির দলিলে স্বাক্ষর করেছেন, তারাই ১৯৬১ সালে ভারতের পার্টি কংগ্রেসের তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। বিজয়ওয়ারায় পার্টির ৬ষ্ঠ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে। পার্টির ৬ষ্ঠ সম্মেলনে তিটি দলিল পেশ করা হয়।

১) ভূপেশ গুপ্ত এবং রামমূর্ত্তি, ২) ডাঙ্গে, যোশী এবং অধিকারী, ৩) রণদিভের নেতৃত্বে ২১জনের স্বাক্ষর যুক্ত দলিল।

মূল বিতর্কের বিষয় দাঁড়ায় ভারতের বর্তমান বিপ্লবের স্তরে কি ধরনের ফ্রন্ট হবে, জনগণতান্ত্রিক না জাতীয় গণতান্ত্রিক, নেতৃত্ব দেবে কোন শ্রেণী এবং রণকৌশল কি হবে?

জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হলে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক শ্রেণী অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট হলে নেতৃত্ব দেবে কোন বুর্জোয়া পার্টি। ফ্রন্টের চরিত্র অনুযায়ী তৈরী হবে রণনীতি ও রণকৌশল।

সারা রাত তর্ক করেও কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়নি। অসুস্থ সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ঐক্যরক্ষার আবেদন জানিয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন। এই বক্তৃতাটিই গণ্য হল ৬ষ্ঠ কংগ্রেসের দলিলরূপে। এই ঘটনাতেই স্পষ্ট হলে গেল পার্টি বিভক্ত হতে যাচ্ছে।

অজয় ঘোষের বক্তৃতার সার মর্ম হল ঃ-

ভারতেব কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিনিধিরা ৮১ পার্টির দলিল সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করেছে কিন্তু এই পার্টি কংগ্রেস সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারলো না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সরকারের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়েছে। উপনিবেশবাদের পতন, সাম্রাজ্যবাদেব অবক্ষয় এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতি হলেও শান্তির শক্তি ও আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিচ্ছে।

ভারতের বৈদেশিক নীতিতে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটছে, দেশের অর্থনীতিতে স্বয়ংভরতার ইচ্ছা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশী অর্থনীতির সংরক্ষণের দাবীতে দেশীয় বুর্জোয়ারাও জনগণের সঙ্গে জোট গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সহযোগিতায় ভারতে ভারী শিল্পের বিকাশ ঘটছে। সরকারী শিল্পেই বেশীসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে।

অন্যদিকে ভূমি সংস্কার কার্যকর হচ্ছে না। গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকের জন্ম হচ্ছে। গরীব কৃষকেরা আরো গরীব হচ্ছে। শহরে ও গ্রামে বেকার সংখ্যা বাড়ছে। মূল বৃদ্ধি ঘটছে। বিদেশী পুঁজিও ঢুকছে। খাদ্য সংকট বাড়ছে। জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বিদ্বেষ ক্রমবর্দ্ধমান।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে তীব্র গণসংগ্রামের মাধ্যমে সরকারের নীতিকে ক্রমাগত বামমুখী করতে হবে।

অজয় ঘোষের শেষ কথা হল - জাতীয় গণতন্ত্র হল,বর্তমান বিপ্লবের স্তরে সঠিক শ্লোগান। জাতীয় গণতান্ত্রিক শক্তির ব্যাপক ও শক্তিশালী জোট গঠন করার জন্য কমিউনিষ্টদেরই

ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এই সংগ্রামে যুক্ত হবে কংগ্রেস অনুগামী ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত ও স্বদেশী পন্থী বুর্জোয়ারা।

কংগ্রেস একটি পুরানো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরে কংগ্রেসের শক্তি ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলের সঙ্গে কংগ্রেসকে এক করে দেখা ভুল হবে। দেশের এই জটিল পরিস্থিতি উপেক্ষা করলে বড় ভুল করা হবে।

জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের নীতি গ্রহণ করলে ১৯৬৭ সাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস দলের শরিক দল হিসেবে দেশ গঠনের কাজে বিরাট ভূমিকা নিতে পারতো। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

নেহেরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব নিয়ে কোন্দল এবং সুযোগ সন্ধানী ক্ষমতালোভীদের কংগ্রেস দলে আবির্ভাব জনগণ মেনে নিতে পারেনি। তাই ৯টি রাজ্যে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে সাধারণ ভোটাররাই। কিন্তু কোন বিকল্প সৃষ্টি করতে পারেনি রাজনৈতিক নেতারা। জোড়াতালির কোয়ালিশন সরকারগুলো স্থায়ী হয়নি।

কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে কর্মসূচীভিত্তিক জোট গড়ে তুলতে পারলে কংগ্রেস দলের সুযোগ সন্ধানীরা কংগ্রেস দল ত্যাগ করে ভিন্ন দলে যোগ দিত বা নতুন দল তৈবী করতো। এর ফলে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট শক্তিশালী হতো। কংগ্রেস দল বাধ্য হয়ে জোটের উপব নির্ভরশীল হয়ে কর্মসূচী রূপায়ণে আগ্রহী হতো।

৪৫ বছর আগে এরূপ ঘটনা ঘটলে ভারতে বিজেপি দলের জন্ম হতো না। গণআন্দোলনের প্রবল চাপে প্রতিটি রাজ্যেই প্রতিক্রিয়াশীলদের সীমাবদ্ধ গন্ডীতে আটকে বাখা যেত।

ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য অতিবিপ্লবী মাওবাদী দর্শনের প্রবল আকর্ষণে ভারতের আবেগপ্রবণ কমিউনিষ্ট নেতাদের একটা অংশ দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে সি পি আই (এম)নামে নতুন দল গঠন করলেন। সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাসী এই সব অতি বিপ্লবীরা কৌশল হিসেবে নির্বাচনকে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু জনগণ তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ থেক সরে আসতে বাধ্য করলো। তবুও বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে কমিউনিষ্ট ঐক্য গড়ে তোলা হলো না।

১৯৬১ সালে অজয় ঘোষের প্রস্তাব মেনে নিয়ে পার্টির ৬ষ্ঠ কংগ্রেস শেষ হল। ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে অজয় ঘোষের মৃত্যুর পর পার্টির মধ্যে মতভেদ আবার তীব্র বিরোধের আকারেই দেখা দিল। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে মাওবাদী চীন ভারত আক্রমণ করল। একটা কমিউনিষ্ট দেশ সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে একটি বন্ধু রাষ্ট্রকে আক্রমণ করতে পারে একথা কমিউনিষ্টরা বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ বাস্তবে তাই ঘটল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট পার্টিতে বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল। মাওবাদীরা ভারতকেই আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করল। সোভিয়েত পন্থীরা চীনকে আক্রমণকারী রূপে স্বীকার করে নিল।

১৯৬৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চীনপন্থীরা আলাদা দল গঠন করল। নতুন দলের নাম হল সি পি আই এম।

বিগত ৪৫ বছর ধরে বামপন্থীরা নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পরিস্থিতির চাপে বর্তমানে ৪৫ বছর আগেকার অজয় ঘোষের ঘোষিত নীতির কাছাকাছি এসেছে। কেন্দ্রে বামপন্থীদের উপর নির্ভরশীল সরকার গঠিত হয়েছে। কিছু কালের মধ্যেই কংগ্রেসের সঙ্গে কর্মসূচী ভিত্তিক কোয়ালিশন সরকার গড়তে বাধ্য হবে বামপন্থীরা। নতুবা ফ্যাসিবাদকে পথ ছেড়ে দিতে হবে ভারতের মাটিতে।

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন সি পি এম রাজনীতির সঠিকতা প্রমাণ করে না। কংগ্রেস দলের নীতি ও নেতৃত্বের সংকট কংগ্রেস দলের পতন ঘটিয়েছে। বামফ্রন্টের মিটিং মিছিলে যাদের দেখা যায় তাদের একটা অংশ হল কংগ্রেসী। প্রকৃত দেশপ্রেমিক এবং আদর্শবান কংগ্রেসী গণতান্ত্রিক নেতার আবির্ভাব ঘটলে গণআন্দোলনের ভারসাম্য বদলে যেতে পারে।

কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ শোনা গেছে, আজকাল বামপন্থীদের বিরুদ্ধেও তেমনি অভিযোগ উঠছে। প্রয়োজনের তাগিদেই বিকল্প শক্তির সৃষ্টি হয়। সুযোগসন্ধানী ও অযোগ্য ব্যক্তিরা চিরকাল নেতৃত্ব দখল করে রাখতে পারে না। ভারতের জটিল পরিস্থিতি এখন ফ্যাসিবাদী বিপদের সম্মুখীন।

রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নতুন দল, নতুন নীতি ও নতুন নেতার জন্ম হয়। শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতা সৃষ্টি করার জন্য মানুষই বিকল্প শক্তির উদ্ভব ঘটায়।

রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর পতন থেকে শিক্ষা নিয়ে যথাসময়ে সঠিক নীতি, সঠিক কর্মসূচী এবং সঠিক জোট গঠন করতে না পারলে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

জাতীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে ত্রিপুরা এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের সঠিক পথ দেখাতে পারে এমন কিছু নতুন নেতার আশায় দিন গুণছে ত্রিপুরা। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনগনের প্রধান শত্রু হল সাম্প্রদায়িকতা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ। এর মোকাবেলা করতে পারে একমাত্র বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির যৌথ মোর্চা।

সি এফ ডি ও জনতা দল

জাতীয় রাজনীতির এক প্রবল ঝড়ে একটি দুর্ঘটনা রূপেই ত্রিপুরায় সি এফ ডি অর্থাৎ কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী দলের জন্ম হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে জর্জড়িত কংগ্রেস দলের কোন্দলের ফলেই কংগ্রেস দলের মূল স্তম্ভটি ভেঙ্গে পড়েছিল। এর ফলেই ত্রিপুরায় রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় ঘুরে গিয়েছিল।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে দলের অন্যতম স্তম্ভ সুখময় সেনগুপ্ত **'ত্রিপুরা কংগ্রেস'** নামে নতুন দল গঠন করে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ে ছিলেন। প্রতিটি মহকুমায় নির্বাচনী বক্তৃতায় দুর্নীতিবাজ কংগ্রেস দলকে উৎখাত করার জন্য জনগণের কাছে অত্যন্ত কড়া ভাষায় আহ্বান জানিয়ে ছিলেন সুখময় সেনগুপ্ত। নির্বাচনে ত্রিপুরা কংগ্রেস কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কিন্তু কংগ্রেস দলের মূল শিকড়টিতে নাড়া পড়েছিল। যুক্তফ্রন্টের রাজনীতিও রাজ্যের মানুষ গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস নেতা শচীন্দ্র লাল সিংহের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল

ঐ নির্বাচনে।

ঠিক পাঁচ বছর পরই সুখময় সেনগুপ্তকে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতাকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে চার মাসের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের নেতৃত্বে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেন। বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব এনে শচীন্দ্র লাল সিংহকে সরানো সম্ভব ছিল না। কারণ সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। সি পি এম এই ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানায়। অন্যদিকে সি পি আই এই ঘটনাকে অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার বলে নিন্দা করে।

ইন্দিরা গান্ধীর এই পদক্ষেপ ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে চরম হঠকারী রাজনৈতিক ট্রেজেডি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। শুধু তাই নয় ১৯৭২ সালের নির্বাচনে শচীন্দ্র লাল সিংহকে বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থী হবার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। হাইকমান্ডের তাঁবেদার হতে রাজী না হওয়ার জন্যই শচীন্দ্র লাল সিংহের উপর এই আক্রমণ হয়েছিল। ব্যক্তিত্বের সংঘাত কংগ্রেস দলের সর্বনাশ ডেকে আনল। ১৯৬৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস ভেঙ্গে সিন্ডিকেট কংগ্রেস এবং ইন্দিরা কংগ্রেস নামে দুটি দল সৃষ্টি হয়। শচীন্দ্র লাল সিংহ কংগ্রেস দল ভাগাভাগির সময় ইন্দিরার পক্ষে ভোট দেননি। এটাই ছিল বিরোধের মূল কারণ।

এই সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবার ফলে ইন্দিরাজীর জনপ্রিয়তা যেমন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, শচীন্দ্র লাল সিংহের জনপ্রিয়তাও তেমনি সমগ্র ত্রিপুরা-বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় শচীন্দ্র লাল সিংহ নীরবে অপমান সহ্য করেছেন। তাই কংগ্রেস দল বিপুলভাবে জয় লাভ করে। বিধানসভার ৬০টি আসনের মধ্যে ৪১টি কংগ্রেস দলের দখলে আসে।

সারা ভারতবর্ষেই তখন ইন্দিরা কংগ্রেসের বিপুল জয় কংগ্রেস বিরোধীদের আতংকিত করে তোলে। কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরেও ইন্দিরাজীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এক দলনেতার মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরাজীর লোকসভার সদস্য পদ বাতিল হবার পর । সারা দেশ জুড়ে ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলনের ঢেউ উঠে। জগজীবন রাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসী অর্থাৎ সি এফ ডি দল গঠন করেন। শচীন্দ্র লাল সিংহ এই সুযোগে ত্রিপুরায় সি এফ ডি দল গঠন করেন।

ইন্দিরাজী সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ পেয়ে দেশের অস্থির অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জরুরী অবস্থা ২৬শে জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে ঘোষনা করেন । জারি হবার পর সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করা হয়। বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা নিজ দলের বিক্ষুব্ধ নেতাদেরও গ্রেপ্তার করেন। প্রশাসনে আমলাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশে বিদেশে ভারতীয় গণতন্ত্রের অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হওয়ায় ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭৭ তারিখে ইন্দিরা গান্ধী - লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করেন। জরুরী অবস্থা শিথিল করা হয় এবং বিভিন্ন দলের নেতা ও কর্মীদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ত্রিপুরায় ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে শচীন্দ্র লাল সিংহ- সি এফ ডি দলের প্রার্থী হয়ে কংগ্রেস ও সি পি এমের দু'জন প্রার্থীকেই পরাজিত করে লোকসভায় নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ভোট ভাগ হবে এবং সি পি এম জয়ী হবে এটাই ছিল স্বাভাবিক ধারণা। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত জয়ের ফলে শচীন্দ্র লাল সিংহের ধারণা হয় যে, সি এফ ডি দল ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে।

৩০ শে মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় সি এফ ডি ও সি পি এম বিধায়করা সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। সরকারের পতন ঘটিয়ে ১লা এপ্রিল ১৯৭৭ তারিখে রাজ্যে প্রথম সি এফ ডি সি পি এম কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। প্রফুল্ল কুমার দাসকে মুখ্যমন্ত্রী করে সি এফ ডি-সি পি এম-কোয়ালিশন সরকার চার মাসও অতিক্রম করতে পারেনি। ২১ শে জুলাই ১৯৭৭ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ এনে সি পি এম দল কোয়ালিশন সরকার থেকে সমর্থন তুলে নেয়।

ইতিমধ্যে- সি এফ ডি-দলের একাংশ জনতা দলে যোগ দিয়ে সি পি এম - জনতা কোয়ালিশন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সি এফ ডি-র সব নেতাবাই বাধ্য হয়ে জনতা দলে যোগ দিয়ে নতুন কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেয়। ২৬শে জুলাই ১৯৭৭ তারিখে নতুন কোয়ালিশন সরকাব কাজ শুরু করে। রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। মাত্র ১০০দিন কাজ করাব পবই ৩ নভেম্বর ১৯৭৭ তারিখে সি পি এম দল সরকার থেকে সরে যায়। রাজ্যপাল বাধ্য হয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতিব শাসন জারি করার সিদ্ধান্ত নেন।

মাত্র সাত মাস কোয়ালিশন সরকাবে থেকে- সি পি এম-দল সাবা রাজ্যে সংগঠন ছড়িয়ে দেবার সুযোগ লাভ করে। শচীন্দ্র লাল সিংহের অনুগামীদেব একটা বড় অংশই সি পি এমের বিভিন্ন গণসংগঠনে যুক্ত হয়ে গেল। এর আগে সুখময় সেনগুপ্তেব সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গড়ার ফলেও গ্রামাঞ্চলে বহু কংগ্রেস অনুগামী কৃষক-দিন মজুর-শিক্ষক-কর্মচারী, সি পি এম দলের গণসংগঠনে যোগ দিয়েছিল। নেতারা কংগ্রেস দলে ফিরে গেলেও তাদের অনুগামীদের একটা বড় অংশই সুবিধাবাদী বাজনীতির সঙ্গে স্থায়ীভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

শচীন্দ্র লাল সিংহ এই পরিস্থিতির তাৎপয বুঝতেই পাবেননি। তাই বিধানসভায় সংঘ্যাগরিষ্ঠ আসনের দাবীতে জেদ ধরে থেকে বামফ্রন্টের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতায় রাজী হননি। বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যুক্তিসঙ্গত আসনের দাবী নিয়ে নির্বাচনী সমঝোতা করলে ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের সরকার না হয়ে বাম গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হত। নির্দিষ্ট আসনে বাছাই করা নির্ভরযোগ্য প্রার্থী দিতে পারলে শচীন্দ্র লাল সিংহ ত্রিপুরার রাজনীতিতে নতুন মর্যাদা লাভ করতে পারতেন। হয়তো ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী রাজনীতির আবির্ভাব ঘটতো না।

অল্প সময়ের জন্য সি এফ ডি দল গঠন করে ত্রিপুরায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাই কংগ্রেস দলের সমাধি রচনা করে গেলেন অথচ নতুন কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারলেন না। সি এফ ডি দলের অবলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাস তাকে স্থায়ী আসনে চিহ্নিত কং রেখেছে।

জনতা পার্টি এবং ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার পর রাজনৈতিক সুযোগ লাভের আশায় ত্রিপুরা যারা ঐ সব দলের রাজ্য শাখা গঠন করেছেন তাবা ত্রিপুবাব রাজনীতিতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেননি। কিন্তু সি এফ ডি দল ত্রিপুরায় একদলীয় শাসনেব অবসান ঘটিয়ে কোয়ালিশনের যুগ সৃষ্টি করেছে।

ত্রিপুরায় নতুন ইতিহাস সৃষ্টির মুহূর্ত
১৯৭৭ সালে সি.এফ.ডি, সি.পি.এম কোয়ালিশন সরাকার গঠনের সিদ্ধান্ত

ষষ্ঠ অধ্যায়

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলন

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন ঘটেছে ১৯৪০ সালে ঢাকার দাঙ্গার পর থেকে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ত্রিপুরায় কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। মহারাজা বীর বিক্রম নিজেই উদ্যোগ নিয়ে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালিতে ভয়াবহ দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বহু উদ্বাস্তু পরিবার ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। মহারাজা বীর বিক্রম উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। যারা স্থায়ীভাবে ত্রিপুরায় বসবাস করতে চায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দেন।

এই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র-জাতীয় কংগ্রেস-দলই প্রকাশ্যে রাজনৈতিক মঞ্চে ছিলো। তারা আন্তরিকভাবেই উদ্বাস্তুদের পাশে এসে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পুনর্বাসনের দাবীতে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। এছাড়া জনমঙ্গল সমিতি ও প্রজামন্ডলের নেতারাও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন।

ভারত বিভক্ত হবে এবং ভারতের স্বাধীনতাও ঘোষিত হবে এ বিষয়টি তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরই হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নেবে এটা তখনও কারো ধারায় ছিল না। সব সংগঠনই তখন মানবিক দায়িত্ববোধ নিয়েই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে এগিয়ে এসেছিল।

১৯৪৭ সালের ১৭ই মে ভারতের স্বাধীনতা লাভের মাত্র তিন মাস আগে ত্রিপরার মহারাজা বীর বিক্রমের আকস্মিক মৃত্যুতে ত্রিপুরার পরিস্থিতি খুব জটিল হয়ে উঠে। মহারাজা বীর বিক্রম মৃত্যুর দুই সপ্তাহ আগে রাজমন্ত্রী গিরিজা শংকর গুহকে ভারতের সংবিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করে রাজ্যের প্রতিনিধি হিসেবে দিল্লীতে পাঠান এবং ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

২৮ শে এপ্রিল গিরিজা শংকর গুহ দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। কিন্তু কলকাতায় কয়েকদিন অবস্থানকালে হঠাৎ মহারাজার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে খবর পেয়ে আগরতলায় ফিরে আসেন। মহারাজার অকাল মৃত্যু রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলে। যুবরাজ কিরীট বিক্রম নাবালক থাকায় রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে রাজ প্রতিনিধি নির্বাচন করে চার সদস্যের শাসন পরিষদ অর্থাৎ রিজেন্সী কাউন্সিল গঠন করা হয়।

১৯২৩ সালেও বীরেন্দ্র কিশোরের মৃত্যুর পর যুবরাজ বীর বিক্রম নাবালক থাকায় এরকম শাসন পরিষদ গঠন করা হয়েছিল।

রাজ্যের অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়ে রাজ পরিবারের একাংশ ত্রিপুরাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ হাতির মাহুত গেঁদু মিয়ার নেতৃত্বে

মুসলিমদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আগরতলায় বেশ কয়েকটি জঙ্গী মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। এদিকে ১৯৪৯ সাল থেকে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন দ্রুত বাড়তে থাকে। রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় এই সমস্যার মোকাবিলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদ্বাস্তু আগমনের বিরুদ্ধে **'সেংক্রাক'** নামে একটি সংগঠন জঙ্গী আন্দোলনের হুমকী দেয়। **'বীর বিক্রম ত্রিপুর সংঘ'** গঠন করে রাজার এক ভাই বৈমাত্রেয় কুমার দুর্জয় কিশোর প্রকাশ্যে উদ্বাস্তু আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন।

এই সময় প্রয়োজন ছিল সর্বদলীয় মোর্চা গঠন করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা। কিন্তু তা সম্ভব হল না। বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন দলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনে বিভক্ত হয়ে ত্রিপুরার ভারতভুক্তি এবং উদ্বাস্তুদের স্থায়ী ও সুষ্ঠু পূনর্বাসনের দাবীতে বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন শুরু হয়।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টি বেআইনী ছিল। প্রকৃত পক্ষে ১৯৫০ সালের আগে কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রকাশ্যে কোন কাজ করতে পারেনি। পার্টি সদস্যের সংখ্যা ১০/১২জনের বেশী ছিল না। তাদের অধিকাংশই ছিল নিষ্ক্রীয় সদস্য। গণমুক্তি পরিষদের সদস্যরা কমিউনিষ্ট পার্টিতে একযোগে যোগ দেবার ফলেই রাজ্যে শক্তিশালী কমিউনিষ্ট দলের আবির্ভাব ঘটে।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত হয়। এর আগে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টির কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। ১৯৫১ সালে এ রাজ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম রাজ্য সম্মেলনে সম্পাদকীয় রিপোর্টে এই দুর্বলতার স্বীকৃতি রয়েছে।

কংগ্রেস দল সরকার গঠনের আগে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবীতে আন্দোলনে যে ভূমিকা নিয়েছিল ১৯৫৩ সালে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের পর থেকে সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা নিয়েছে। উদ্বাস্তুদের যে কোন আন্দোলনকে কংগ্রেস সরকার বিরোধী আন্দোলন রূপে গণ্য করেছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্তু আন্দোলন অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলেছে। বিভিন্ন দল ও সংগঠন বিভিন্ন স্তরে যার যার সাধ্য মত সেবামূলক মনোভাব নিয়েই উদ্বাস্তুদের আশ্রয়, সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য কাজ করেছে।

এই সময় উদ্বাস্তুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ত্রিপুরায় আসেন। বিভিন্ন উদ্বাস্তু সংগঠন শ্যামাপ্রসাদকে উদ্বাস্তু সংগঠন গুলোর মধ্যে স্বাগত জানায়। এত বিচ্ছিন্নতা দেখে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী অবাক হন। সব দলমতের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্বাস্তু সমস্যার মত জটিল বিষয়কে সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে আবেদন জানান।

১৯৫০ সালের জুন মাসে শ্যামাপ্রসাদ এই রাজ্যের উদ্বাস্তুদের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে যান। তাঁরই পরামর্শ মত সবগুলো উদ্বাস্তু সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৫০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে শহরের বিশিষ্ট লোকদের এক সভা ডেকে-**ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বসতি সমিতি** নামে একটি উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন এডভোকেট নিবারণ চন্দ্র ঘোষ এবং যুগ্ম সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন জীতেন পাল ও ফটিক চক্রবর্তী।

১৯৫১ সালের ৩রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সারা রাজ্যের উদ্বাস্তু সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের

সম্মেলনে গঠন করা হয়- **ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতি**। সভাপতি নির্বাচিত হন নিবারণ ঘোষ এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন জীতেন পাল। বিভিন্ন মহকুমা থেকে কার্যনির্বাহক কমিটিতে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন- সুবোধ রায়-ধর্মনগর, বিহারী লাল দত্ত- কৈলাসহর, কালীপদ ভট্টাচার্য্য- কমলপুর, নরধ্বজ সিংহ খোয়াই, অরুনোদয় দেব-সোনামুড়া, ফনীন্দ্র প্রসাদ শূর উদয়পুর এবং দ্বিজেন দে - সদর।

এক বছর পরই উদ্বাস্তু সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে, আগরতলায়। বিপুল উৎসাহে ২১জনের এক কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন এডভোকেট - হেমচন্দ্র নাথ এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন জীতেন পাল। **সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ১৮টি প্রস্তাব পাশ করা হয়**। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দাবীগুলো হলো -

১) যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জরুরী ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদেব পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার দিতে হবে।

৩) জুমিয়া সমস্যার সমাধান করতে হবে। ৪) ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না।

৫) স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দিয়ে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করতে হবে।

৬) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে।

৭) দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৮) রেশনিং ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করতে হবে।

৯) বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) উদ্বাস্তু কলোনীতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে ইত্যাদি। এই সম্মেলনে উদ্বাস্তু সমিতির নাম বদল করে 'নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি' করা হয়। শুধুমাত্র উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে গণআন্দোলন করার জন্য এটাই ছিল ত্রিপুরায় একমাত্র সংগঠন।

রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথক সংগঠন করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন করলেও সেটা ছিল তাদের অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনেরই একটা অংশ। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের স্বার্থে নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকারের প্রশ্নেও নানা রকম বাধা সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক দলগুলো।

নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতি ১৪ বছর ধরে শুধুমাত্র উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে তীব্র গণআন্দোলন পরিচালনা করেছে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে নানা রকম স্কীম চালু করে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা হয়েছে। ভোটাধিকার আদায় করা হয়েছে। কৃষি ও ব্যবসা ঋণ মকুবের দাবী আদায় করা হয়েছে। ক্যাম্পের উদ্বাস্তু এবং ক্যাম্পের বাইরের উদ্বাস্তুদের মধ্যে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিভেদ সৃষ্টি করার নীতিকে বাধা দেওয়া হয়েছে। ১৯৫০ সালের উদ্বাস্তু এবং ১৯৬৪ সালের উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিভেদ নীতি প্রতিহত করা হয়েছে। মাইগ্রেশান উদ্বাস্তু এবং যারা সম্পত্তি বিনিময় করে এসেছে তাদের মধ্যেও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা তীব্র আন্দোলনের মুখে প্রতিহত করা হয়েছে।

নিখিল ত্রিপুরা উদ্বাস্তু সমিতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সঙ্গে গণআন্দোলন

পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন সদর- জিতেন পাল, দ্বিজেন দে-যোগেশ চক্রবর্তী - সাব্রুম - বরদা মিত্র, হেম রায়- বিলোনীয়া-মতিলাল পোদ্দার - উদয়পুর-ডাঃ ইন্দুভূষণ রায়, মহেন্দ্র মজুমদার- উদয়পুর-রমেশ পাল, চন্দ্রমোহন দেবনাথ, সতীশ পাল- সোনামুড়া- নৃপেন ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্র পাল- ধর্মনগর-রামকৃষ্ণ শর্মা, কেদার মালাকার, ডাঃ রাধা রমন দেবরায়- কৈলাসহর, যোগেন্দ্র ভৌমিক, অরুণ চক্রবর্তী-কমলপুর-পিযূষ চৌধুরী, সতীশ মজুমদার, খোয়াই- নিবারণ ঘোষ, হেমচন্দ্র নাথ, অমূল্য রতন পাল, ইন্দ্রমোহন দেবনাথ, গণেশ সাহা, নীহার নাগ, মনীন্দ্র আচার্য্য, সুবোধ দেব-সদর।

১৯৫৩ সালে রাজ্যে তিন সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে কংগ্রেস দলের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়। ফলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপরে কংগ্রেস দলের পক্ষে রাজ্য প্রশাসনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। অথচ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা সম্পর্কে কংগ্রেস দলের কোন বক্তব্য বা ভূমিকা ছিল না। ফলে একটা রাজনৈতিক সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরী হয়।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (সি পি আই) এই সুযোগ ব্যবহার করে উদ্বাস্তু কলোনীগুলোতে সংগঠন গড়ার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রতিটি কলোনীতে উদ্বাস্তু কমিটি গঠন করা হয়। উদ্বাস্তুদের ঢোল, লোন, জমি ও অন্যান্য সাহায্য আদায় করার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় কমিউনিষ্ট কর্মীরা। পুনর্বাসন দপ্তরের নানা রকম হয়রানী এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঘেরাও, অবরোধ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে কমিউনিষ্ট পার্টি।

সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য গান্ধীজীর পথকেই বেঁছে নিয়েছে কমিউনিষ্টরা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস দল যে পদ্ধতিতে আন্দোলন করেছে স্বাধীনতার পর কমিউনিষ্টরা সেই পদ্ধতিতেই আন্দোলন শুরু করে। অহিংস, অসহযোগ, আইন অমান্য এবং সত্যাগ্রহ ইত্যাদি আন্দোলনের উপর বৃটিশ সরকার যেভাবে পরাধীন ভারতে দমন নীতি চালিয়েছে স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকারও একই পদ্ধতিতে আন্দোলন দমনের চেষ্টা করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অহিংস গণআন্দোলরে উপর বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর দমন নীতি অহিংস আন্দোলনকে জঙ্গী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছে। গান্ধীজী সর্বদাই অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হলেও বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে অহিংস নীতির সীমানায় আটকে রাখতে পারেননি। কংগ্রেস দলের মধ্যেই বার বার সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে কংগ্রেস নেতারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেননি। স্বাধীনতার পর ক্ষমতা হাতে পেয়েই বৃটিশ কায়দায় বৃটিশের তৈরী আইন, পুলিশ ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে গণআন্দোলনের উপর নির্মম দমনীতি চালু করেছিলেন।

ত্রিপুরায় নয় সারা ভারতবর্ষেই গণআন্দোলন দমনের একই বৃটিশ নীতি অনুসর করেছিল কংগ্রেস সরকারগুলো। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের উপর লাঠি চার্জ করা, আইন অমান্য আন্দোলনে গুলিবর্ষণ করা, আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করা, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের সরকারী সুযোগ

সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা স্বাধীন ভারতেও সরকারী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা হল তীব্র গণআন্দোলন ছাড়া কোন দাবীই আদায় করা যানি। তাই ত্রিপুরায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান দাবীই ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্বশীল সরকার গঠন। এ কারণেই উদ্বাস্তু আন্দোলনে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীর সঙ্গে । ভোটাধিকার প্রদান এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও একই সঙ্গে চলেছে।

বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণই ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দিয়েছে। গড়ে উঠেছে কংগ্রেস বিরোধী ফ্রন্ট। গণআন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে প্রতিটি গ্রামে, শহরে ও কলোনীতে। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদের জন্য এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতার জন্য গণআন্দোলনে সব সময় ঐক্য রক্ষা করা যায়নি। বহুবার ঐক্য ভেঙ্গেছে আবার নতুন করে ঐক্য গড়ে উঠেছে। কারণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস বিরোধী। কাজেই জঙ্গী আন্দোলনের জটিল পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন হয়ে উঠেছিল জরুরী প্রয়োজন।

গণআন্দোলন যেভাবেই হোক না কোন তার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনরা বিকাশ ঘটে এবং অধিকার বোধ জেগে উঠে।

উদ্বাস্তুদের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের আচরণ ছিল অনেকটা দয়া প্রদর্শনের মত। কিন্তু উদ্বাস্তু সমস্যার সৃষ্টি করেছিল কংগ্রেস দল । সরকারী ক্ষমতা দখল করার জন্য লালায়িত কংগ্রেস নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেই দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিল। উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারকেই নিতে হবে গান্ধীজীও এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন। **সরকারী কোষাগারের মালিক দেশের জনগণ, কংগ্রেস দল নয়, এই সাধারণ ধারণাটুকুও বহু কংগ্রেস নেতাব মধ্যে ছিল না।**

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের মধ্যেও গণতান্ত্রিক চেতনার যথেষ্ট অভাব ছিল। নুন খাই যার গুণ গাই তার-এই প্রবাদ বাক্যটি বহু উদ্বাস্তুর মুখেই শোনা যেত যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে তা কংগ্রেস সরকারই দিচ্ছে। কাজেই কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া উদ্বাস্তুদেব কর্তব্য এরূপ একটা নৈতিক কর্তব্য বোধ ১৯৭২ সালের নির্বাচন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।

কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ যখন কংগ্রেস দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন তখনই উদ্বাস্তুদের মধ্যে নতুন চিন্তা-চেতনা ও অধিকারবোধ প্রকাশ পেতে থাকে। তাছাড়া উদ্বাস্তু পরিবারগুলোতে দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষিত যুবকেরা গণতান্ত্রিক চেতনায় অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এই সময়।

বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বৈষম্যমূলক মনোভাব পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় সব স্তরের বাঙ্গালীদের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একদল উদ্বাস্তু দুর্গাবাড়ীতে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। ১৫দিন স্থায়ী এই অনশন ধর্মঘটের সময় বিশ্বাম্বর নমঃ দাস নামে এক উদ্বাস্তুর মৃত্যুকে ঘিরে উদ্বাস্তু আন্দোলন সারা ত্রিপুরায় উত্তাল রূপ নেয়। কংগ্রেস দলের তৎকালীন সভাপতি ইন্দিরা গান্ধী এই সময় আগরতলায় উদ্বাস্তুদের অবস্থা দেখতে এসেছিলেন।

আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে উদ্বাস্তুদের কিছু দাবীর মীমাংসা করা হয়।

পাঞ্জাবে ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার প্রায় ৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে কিন্তু এক কোটিরও বেশী বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল একশ কোটিরও কম।

ত্রিপুরায় ১৯৫৮ সালে পুনর্বাসন দপ্তব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নতুন কোন উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের দায়িত্ব সরকার নেবে না বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। আশা করা হয়েছিল পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরে আসবে। ১৯৫০ সালে নেহেরু লিয়াকত আলি চুক্তি সফল হয়নি। দাঙ্গা আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। ১৯৭১ সালে ইন্দিরা মুজিব চুক্তির ফলে উদ্বাস্তু আগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এরপর দাঙ্গার কারণেও যদি কেউ দেশ ত্যাগ করে আসে তারা সাময়িক শরণার্থীরূপে গণ্য হবে। অবস্থা স্বাভাবিক হলেই আবার দেশে ফিরে যেতে হবে। কাজেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে আন্দোলনেও এই পর্যায়ে সমাপ্ত হয়েছে। এই সময় থেকে উদ্বাস্তুরা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে জাতীয় গণআন্দোলনের অংশীদার রূপে গণ্য হয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমেই তাদের বাকী সমস্যার সমাধান হবে।

ত্রিপুরায় ১৯৫০ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮৩০০০ তিরাশী হাজার উদ্বাস্তু পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে। মোট উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৩,৮৫,৩০০জন।

১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় মোট ৩২,২০৯টি উদ্বাস্তু পরিবার নথিভুক্ত হয়েছে। মোট উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ১৪০,৫৯৮জন।

মোট ৭৫টি কলোনীতে চারটি বিভিন্ন স্কীমে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

এছাড়াও নিজস্ব উদ্যোগে সম্পত্তি বিনিময় করে কয়েক হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় এসেছে।

১৯৬৪ সালে ৭০৬৫টি উদ্বাস্তু পরিবাবকে রাজ্যের বাইরে পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। উদ্বাস্তু আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার ফলে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ত্রিপুরায় কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। ত্রিশ হাজার হেক্টর পতিত জমি উদ্ধার কবে উদ্বাস্তুরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে। রাজ্যের মোট কৃষি উৎপাদনের শতকরা ৮২% ভাগ উদ্বাস্তু কৃষকরা উৎপাদন করে। নতুন নতুন শাক-সব্জি, ডাল, আলু, পাট, মেস্তা, নারকেল-সুপারী চাষ করে কৃষি অর্থনীতিকে সবল করে তুলেছে উদ্বাস্তুরা।

উদ্বাস্তুদের স্বেচ্ছা শ্রম দানে রাজ্যের সর্বত্র,-রাস্তাঘাট, পুকুর, স্কুল ঘর, স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। নানা ধরনের কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও বাজার সৃষ্টি করেছে উদ্বাস্তুরা।

এই উন্নয়নের ধারায় রাজ্যের উপজাতি জীবনেও এসেছে পরিবর্তন। জাতি-উপজাতির মিলনে ত্রিপুরায় সৃষ্টি হচ্ছে নতুন এক সংস্কৃতি। বলিষ্ঠ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারা।

ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্বাসন আন্দোলন

ত্রিপুরায় ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দল বা আন্দোলনের মঞ্চ থেকে জুমিয়া পুনর্বাসনের দাবী উঠেনি। সকলেরই কর্মসূচীতে এবং দাবী তালিকায় সাধারণভাবে আদিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নের দাবী উল্লেখ করা হয়েছিল। এর কারণ হল তখন পর্যন্ত জুমিয়াদের মধ্যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়নি।

১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে সারা দেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে যোগ দেন। বিস্তারিত আলোচনাব পব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষভাবে জুমিয়াদের জন্য পুনর্বাসনের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কারণ এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জুম চাষ বন্ধ করার দাবী উঠে।

এর আগে ১৯৪৬ সালে সংবিধান বচনার উদ্দেশ্যে গঠিত গণপরিষদে আদিবাসী সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দ্রুত উন্নয়নের জন্য বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাখাব সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয। তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একমাত্র আসামের সমস্যা বিশেষভাবে বিবেচিত হয। ত্রিপুরা ও মণিপুর দেশীয় রাজ্য হওয়ায় সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল বর্ণিত সুযোগ সুবিধার আওতায় আসেনি। এ জন্যই পরবর্তীকালে এই সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হয়। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী উন্নয়ন খাতে পৃথক বরাদ্দ হয়। কিন্তু তখনো কোন পরিকল্পনা তৈরী হয়নি। জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা রূপায়ণে আসাম সরকারের ভূমিকায় ষষ্ঠ তপশীলভুক্ত জেলা পরিষদগুলো তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ক্রমশঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ভাবত বিদ্বেষী বিদেশী শক্তির মদতে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক শক্তির সাহায্যে দমন নীতি চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে আপোষ মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করে। **মেঘালয়-নাগাল্যান্ড-মিজোরাম ও অরুণাচল** চারটি পৃথক রাজ্য গঠন করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপজাতি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটা অংশ মীমাংসায় আসতে রাজী হয়নি। বিদেশী মদতে অস্ত্র-অর্থ ও প্রশিক্ষণ পেয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিযে যেতে থাকে।

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়েছে ১৯৮০ সাল থেকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। পাকিস্তান-আমেরিকা-চীন ও বাংলাদেশ থেকে নানাভাবে মদত পাচ্ছে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো। বহু রক্তপাতের পর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন থেকে সরে এসেছে বৃহত্তর জনসমাজ। প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনে সন্ত্রাসবাদীদের ভোট বয়কটের ডাক অগ্রাহ্য করে ব্যাপক সংখ্যায় ভোট দানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা।

এখনো পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীরা উপজাতি উন্নয়নের বা জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে নতুন কোন পথ দেখাতে পারেনি।

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে জুমিয়াদের জুমের জমির সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম ছাড়া অন্য রাজ্যগুলোতে উদ্বাস্তু সমসম্যা নেই। জুমের জমিরও অভাব নেই, কেন্দ্রীয় সাহায্যেরও কোন ঘাটতি নেই। তবু জুম চাষের বিকল্প খুজতেই হচ্ছে। কারণ জুম চাষে লাভের চেয়ে ক্ষতি অনেক বেশী। তাছাড়া জুমিয়াদের অর্থনৈতিক জীবন চির দারিদ্রের মধ্যে আটকে থাকে। একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক চিরকাল এরকম একটা পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক জীবন কাঠামো আকড়ে থাকতে পারে না।

ত্রিপুরায় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় থেকেই জুমিয়াদের সমতল চাষে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা শুরু হয়। বন সংরক্ষণ করে চার পাশে জুম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়। বিভিন্ন টিলায় মূল্যবান বৃক্ষ ধ্বংস করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে জুমচাষ থেকে বিরত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জুমিয়ারা আরো দুর্গম অঞ্চলে সরে গিয়ে জুম চাষ করতে থাকে।

এক সময় কুকী আক্রমণে দুর্গম অঞ্চলেও জুমিয়ারা বিপন্ন বোধ করায় একটু একটু করে সমতল অঞ্চলে চাষবাসে মনোযোগী হয়। তবে সমতল অঞ্চলেও যেখানে কিছুটা জুম চাষের জমি পাওয়া যায় সেখানেই জুমিয়া বসতি গড়ে উঠেছে।

জুম চাষের পাশাপাশি সমতল চাষের মাধ্যমে নতুন অর্থনৈতিক পথের সন্ধান পাওয়া যায়। কারন শত শত বছরের অভ্যেস ছাড়াও জুম চাষের প্রধান আকর্ষণ হল - একই টিলায় একই সময়ে ১০/১২টি ফসলের বীজ লাগিয়ে দীর্ঘ ছয় মাস যাবত একের পর এক ফসল পাওয়া যায় একই জুমের টিলা থেকে। সাধারণতঃ আষাঢ় মাসে শাক-সব্জী তোলা শুরু হয়। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জুমের ধান কাটা হয়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে তিল এবং কার্পাস-তুলা তোলা হয়। বেগুন-লংকা-বরবটি-চিনরা কুমড়া ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

জুমের কাজে পরিবারের সবাইকে সারা বছর ধরে কোন না কোন কাজ করতে হয়। এক সময় জুম চাষ ছিল সমবেত চাষ। একটা গোষ্ঠীর সবাই মিলে জুমের টিলায় জঙ্গল কাটা, জঙ্গল পোড়ানো, ছাই·ছড়ানো বীজ বপন, জুমের টংঘরে পাহাড়া দেওয়া, ফসল তোলা ইত্যাদি সবই যৌথভাবে করা হতো। আজকাল অনেক পরিবর্তন ঘটেগেছে। প্রত্যেক পরিবার নিজস্ব জমি নির্বাচন করছে। পরিবারের সবাই মিলে কাজ করছে। প্রয়োজনে অন্য কারো সাহায্য নিচ্ছে। এই সাহায্য নেওয়া হচ্ছে দুইভাবে শ্রমের বিনিময়ে শ্রমদান করে অথবা শ্রমের বিনিময়ে অর্থ বা ফসল দিয়ে।

সব পরিবার সমান নয়। ছোট-বড় পরিবার ভেঙ্গে টিলার জমি ও কম বেশী হচ্ছে। ফসলও সব জমিতে এক সমান হয় না। কাজেই আর্থিক অবস্থায়ও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রচলিত জুম চাষে ক্ষতির দিকগুলো পৃথিবীর সর্বত্র এক রকম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যেসব অঞ্চলে বছরের বেশীর ভাগ সময় গরম থাকে এবং ছয় মাসের বেশী বৃষ্টিপাত হয় সে সব অঞ্চলের পাহাড়ী জমিতে জুম চাষ হয়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে জুম চাষই হল সবচেয়ে আদিম পদ্ধতি। পৃথিবীর সর্বত্র জুম চাষীরা হল সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অংশ।

তের হাজার বছর আগে পৃথিবীর সর্বত্র সমতল অঞ্চলেও এক টুকরা পাথরের ছুরি

দিয়ে গর্ত করে করে বীজ বপন করা হতো। জুম চাষীরা সেই পদ্ধতিতে আজও চাষ করে। তাই তাদের একটি মাত্র টাক্কাল দিয়ে চাষের সব কাজ চলে। নিজেরা জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করে। জমিতে সেচ বা সারের ব্যবহার জানে না। প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে। সময়মত বৃষ্টি না হলে বা অতি বৃষ্টি হলে জুম চাষ থেকে ফসল পাওয়া যায় না। অতিরিক্ত কীট পতঙ্গের আক্রমণে, বন্য পশু পাখী ও ইঁদুরের আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়।

যৌথ পাহাড়া দিয়েও অনেক সময় ফসল রক্ষা করা যায় না। সমতল চাষে প্রথমেই দরকার হয় এক জোড়া বলদ, একটা লাঙ্গল, কোদাল, কাঁচি ও অন্যান্য সরঞ্জাম। তারপরেই সংগ্রহ করতে হয় বীজ, সার, জলসেচ ও অতিরিক্ত জল বের করে দেবার ব্যবস্থা। তাছাড়া সমতল জমিতে এক সঙ্গে ১০/১২ রকম বীজ বোনা এবং ১০/১২ রকম ফসল পাওয়া সম্ভব নয়। এ জন্যই জুমিয়ারা সমতল চাষে উৎসাহ বোধ করে না।

তাছাড়া শত শত বছরের অভ্যেস এবং জুম চাষের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির ঘনিষ্ট সম্পর্ক জুম চাষের আকর্ষণকে বাড়িয়ে দেয়। জুমিয়াদের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার আচরণ, সংগীত নৃত্য ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ধারা জুম চাষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই হঠাৎ করে নতুন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা জুমিয়াদের পক্ষে কঠিন।

আধুনিক শিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্থায়ী আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত জুম চাষ বন্ধ করা সম্ভব নয়।

জুমিয়াদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ, পরিস্থিতি ও মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা না করেই হঠাৎ করে জুম চাষ বন্ধ করে দেবার ফলে জুমিয়া জীবনে চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। শুধু ত্রিপুরায় নয় সর্বত্র এই সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিয়েছিল। এ জন্যই বিশেষজ্ঞরা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা চালাবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন।

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুরা যেমন কৃষি-জমি ও বাস্তু ভিটি এবং কিছু আর্থিক সাহায্য পেয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় স্থিতি লাভ করেছে। জুমিয়ারাও তেমনি প্রক্রিয়ায় পুনর্বাসন পেয়ে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞদের এই সহজ পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের জীবন যাত্রা এবং জুমিয়াদের জীবন যাত্রা এক নয়। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা চাষ বাসে যে রূপ দক্ষ জুমিয়ারা তেমন নয়।

সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় জুমিয়ারা অরণ্যের মুক্ত পরিবেশে বসবাসে অভ্যস্ত । জুম চাষে যে ঘাটতি দেখা দেয় বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে সে ঘাটতি অনায়াসে পূরণ করা যায়। কিন্তু জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর সম্পদ সংগ্রহে নানা রকম বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে জুমিয়া জীবনে সংকট তীব্রভাবে দেখা দেয়।

জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনায় উদ্বাস্তুদের মতই কলোনী স্থাপন করে কিছু টিলা জমি ও কিছু লুঙা জমিতে কৃষি, পশু পালন ও অন্যান্য পেশায় প্রশিক্ষণ দান, ভরন পোষণের জন্য নগদ অর্থ, বাসস্থান নির্মাণের জন্য কিছু অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক কলোনীতে সরকারী খরচে রাস্তাঘাট ও স্কুল ঘর নির্মাণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, পশু পাখীর বাচ্চা সরবরাহ করা, মাছ চাষের ব্যবস্থা করা, আধুনিক তাঁত শিল্পের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু কোন কাজই সঠিকভাবে চলেনি। আমলাদের দ্বারা পরিচালিত পরিকল্পনায় আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধের অভাব ছিল। কলোনীবাসীদের মতামত নিয়ে কাজ করার মানসিকতা ছিল না। ফলে অর্থের বিপুল অপচয় হয়েছে। সীমিত আকারে জুম চাষ এবং বনজ সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার স্বীকার করে নিলেই জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা অনেকটা সাফল্য অর্জন করতে পারতো।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো জুমিয়া পুনর্বাসনের কর্মযজ্ঞে বামপন্থীরাও উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে জুমিয়াদের মৌলিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে কারোরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং গভীরভাবে সমীক্ষা চালাবার কোন উদ্যোগও ছিল না। অত্যন্ত ভাসাভাসা ধাবণা নিয়ে জুমিয়া পুনর্বাসন আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ জুমিয়া পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে। তাদের মুল দাবীগুলোর মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য স্পষ্ট কোন দাবী ছিল না। আসলে এ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না। উদ্বাস্তু আগমনের ফলে জুমের জমির অভাব দেখা দিয়েছে। এটাই প্রধান সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, এই শ্লোগানটাই বড় আকারে জোরালো দাবী হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবীটা গুরুত্ব পেয়েছে।

কিন্তু জুমিয়াদের জুম চাষের বিকল্প হিসেবে আধুনিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং কিভাবে তা কার্যকর করতে হবে এ সম্পর্কে কোন ভাবনা চিন্তা রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দেখা যায়নি। জুমিয়ারা কি চিরকালই জুম চাষের জীবনে আটকে থাকবে, নাকি বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করতে হবে এই মৌলিক প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে হবে।

ভারত সরকারের জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনার দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমটি হল ঃ- জুম চাষের পরিবর্তে স্থায়ী চাষে অভ্যস্ত করে তোলা। দ্বিতীয়টি হল ঃ- জুমিয়াদের দারিদ্র্য দূর করা এবং আধুনিক জীবনে উন্নীত করা।

সরকারী ও বেসরকারী সমীক্ষায় জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার কতকগুলো ত্রুটি ধরা পড়েছে। যেমন ঃ-

১) নতুন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সীমিত আকারে জুম চাষের ব্যবস্থা থাকা দরকার ছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিচার না করেই হঠাৎ করে জুম চাষ বন্ধ করে দেওয়া অনুচিত হয়েছে।

২) জন্ম থেকেই জুমিয়ারা বনের অবাধ পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বনজ সম্পদ সংগ্রহ করা - পশুপাখি শিকার করা জুমিয়া জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ। হঠাৎ করে ভারতীয় বন আইন প্রয়োগ করে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া মারাত্মক ভুল হয়েছে।

৩) জুমিয়াদের জন্য আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল খুবই কম। তাছাড়া দালালদের উৎপাতে সামান্য অর্থ আদায়ের জন্য ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়ায় জুমিয়াদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল।

৪) সমতল চাষে জলসেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু জুমিয়া কলোনীগুলোতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা ছিল না। পানীয় জলেরও সংকট ছিল। টিউবওয়েল এবং রিংওয়েলে বছরের অর্দ্ধেক

সময় জল পাওয়া যেত না।

৫) জুম চাষে কোন পুঁজি দরকার হত না। কিন্তু সমতল চাষে সার, বীজ, বলদ, লাঙ্গল ইত্যাদি সংগ্রহ করতে অনেক টাকা দরকার হতো। অথচ সমবায় সমিতি থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়া যেত না। কলোনীতে বিপদের সময় মহাজনের ঋণ পাওয়ার ও সুযোগ ছিল না।

এসব কারণে জুমিয়া কলোনীগুলোতে জুমিয়াদের কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনীগুলোতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছে। জুমিয়ারা কলোনী ত্যাগ করে দুর্গম পাহাড়ে জুম চাষেই আবার ফিরে গেছে। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

এই দীর্ঘ সময়কালে জুমিয়া পুনর্বাসনের দাবীতে বহু মিছিল মিটিং হয়েছে। প্রধানতঃ কমিউনিষ্টরাই আন্দোলন করেছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে পুরানো ঋণ মকুব এবং নতুন ঋণের জন্য দাবী করা হয়েছে। বন আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনার ত্রুটিগুলো দূর করে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের বিকল্প দাবীতে কোন আন্দোলন হয়নি।

২৪ বছরে ত্রিপুরায় ৫৯টি জুমিয়া কলোনী স্থাপন করা হয়েছিল। ত্রিশ হাজার জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। কয়েকটি মাত্র ত্রুটি দূর করতে পারলেই জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ সফল হতে পারত। এই ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। কমিউনিষ্ট নেতারাও মৌলিক সমস্যা সমাধানের কথা ভাবেননি। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল একমাত্র কমিউনিষ্টরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেই এসব সমস্যার শুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব। উপজাতি যুব সমিতি আদর্শগত সংকট এবং অভিজ্ঞতার অভাবে এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিতে পারেনি। ফলে জুমিয়া পুনর্বাসনের একটা সম্ভাবনা অংকুরেই বিনষ্ট হল।

জুমিয়া পুনর্বাসন সমস্যা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা নয়। এটা হল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা।

এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার পাহাড়ী অঞ্চলে ২০ কোটি উপজাতি জুম চাষ করে। ভারতে ৮টি রাজ্যে পাঁচ লক্ষ উপজাতি পরিবার সম্পূর্ণরূপে জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর সব দেশেই সমস্যা একই রকম। ভাষা, ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠীর পার্থক্য থাকলেও অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় পার্থক্য নেই।

জুমের জমিতে জুমিয়াদের কোন মালিকানা সত্ত্ব নেই। নতুন নতুন জমি নির্বাচন করে জুম চাষ করতে হয় বলে যাযাবরের মতই জীবন কাটে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য- যোগাযোগ-আধুনিক জীবন যাত্রা সম্পর্কে তাদের কোন অভিজ্ঞতাও নেই আকর্ষণও নেই।

রাষ্ট্রসংঘ জুম চাষের সমস্যাটিকে গুরুত্ব দেবার কারণ হল - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আধুনিক পৃথিবীর পরিবেশ দূষণের জন্য জুম চাষও দায়ী। তাছাড়া জুম চাষে নিযুক্ত বিশ্বের ২০ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাতে বাধ্য হয় এবং আধুনিক সভ্য জীবনের সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। মানব সম্পদের এই অপচয় বন্ধ করার জন্যই জুম চাষ বন্ধ করতে হবে এবং বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে জুম চাষের ফলে সর্বত্র নিম্নে বর্ণিত ক্ষতিগুলো ঘটে থাকে।

১) মূল্যবান বনজ সম্পদ নষ্ট হয়।
২) টিলার মাটি বর্ষার জলে মিশে ভূমিক্ষয় ঘটায় এবং সমতলে নদী-নালায় মাটি জমে নাব্যতা নষ্ট করে এবং জমির উর্বরতা কমিয়ে দেয়।
৩) পাহাড়ে বৃষ্টি হলেই সমতলে বন্যা হয়। কৃষি-বাড়ীঘর ও গৃহপালিত পশুর বিপুল ক্ষতি হয়।
৪) জুমের জমিতে জঙ্গল কেটে পোড়াবার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়। ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রার ক্ষতি হয়। বনজ সম্পদও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৫) জুম চাষ সম্পূর্ণ প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় জুমের ফসলের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ভাল ফসল হলেও ছয় মাসের বেশী চাহিদা মিটে না।

এভাবে বিশেষ সমীক্ষায় দেখা গেছে জুম চাষের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে জুমিয়াদেরও সংকট এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কাজেই পৃথিবীর সব দেশেই জুম চাষ বন্ধ করে বিকল্প পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে জুমিয়া পুনর্বাসন পরিকল্পনা যারা করবেন তাদের যেমন সবদলের অভিজ্ঞতা ও মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে, তেমনি যারা পুনর্বাসনের দাবীতে আন্দোলন করবেন তাদের মৌলিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে সচেতন থেকেই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি সমস্যা নিয়ে বিগত ৬০ বছর দরে যা কিছু আন্দোলন হয়েছে তার সবই কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে হয়েছে । তাই কমিউনিষ্ট পার্টি এ রাজ্যে ট্রাইবেল পার্টি রূপে পরিচিত হয়েছে।

ভারতভুক্তির পরবর্তী অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিহাস প্রমাণ করছে কমিউনিষ্টরাই উপজাতি ও জুমিয়াদের প্রকৃত বন্ধু। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই জুমিয়া পুনর্বাসনের বাস্তব ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী ও কার্যকর হচ্ছে। ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে সমালোচন হচ্ছে কিনা বিকল্প দাবী উত্থাপন করে জুমিয়া পুনর্বাসনের আন্দোলনে কেউ উদ্যোগ নিচ্ছেন। জুমিয়া পুনর্বাসনের প্রথম শর্তই হল জুমিয়াদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন। বিগত ৬০ বছর ধরে যারা জুমিয়া স্বার্থ রক্ষার জন্য আন্দোলন করেছেন, তারাই আজ রাজ্যের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটেছে বিগত দুই দশকের কর্মসূচী এবং কার্যকলাপে।

উপাতি জনগরে উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রথমেই সৃষ্টি করা হয়েছে স্বশাসিত জেলা পরিষদ। ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের আয়োজনও সম্পূর্ণ হয়েছে।

উন্নত প্রথায় জুম চাষের নানা পদ্ধতি এখন আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশ্ব জুড়েই চলছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। ভারতীয় কৃষি বিভাগ এবং ত্রিপুরার কৃষি দপ্তর ও উন্নত জুম চাষের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

উন্নত প্রথায় চাষ করে জুমের টিলা থেকে স্থায়ী আয়ের নানা প্রকল্প কার্যকর করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ একই টিলায় বার বার চাষ করার জন্য বনাঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের লতানো গাছ আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিপুরায়ও কুমারিয়া লতা নামে এক ধরনের লতা গাছ পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো

খুব দ্রুত বাড়ে এবং অল্প সময়ে সম্পূর্ণ টিলায় চাদরের মত ছড়িয়ে পড়ে। এসব লতার পাতা ঝড়ে জমিতে সার সৃষ্টি করে। সীম জাতীয় বীজ ব্যবহার করে বিভিন্ন টিলায় লতা গাছ লাগানো যায়। লতাগুলো কেটে টিলা জমিকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করে সমতল জমির মত আইল সৃষ্টি কবতে হবে। লতা ও আগাছা পচে আইলগুলো শক্ত হবে। এর দ্বারা বনের জঙ্গল পোড়ানোর ফলে যে পরিবেশ দূষণ হয় তা বন্ধ হবে। লতানো গাছের তলায় বড় গাছ জন্মাবে না, আগাছাও বেশী হবে না। আজকাল রাবার বাগানে আগাছা দমন করার জন্য বিভিন্ন রকম লতানো গাছ ব্যবহার করা হচ্ছে। জুমেও এগুলো ব্যবহার করা যাবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা জুম চাষের প্রধান দুটি ক্ষতির দিকর পরিবেশ দূষণ এবং ভূমিক্ষয় বন্ধ হবে। একই জমিতে বার বার চাষ করা যাবে।

জুমের চাষ পদ্ধতি বদলাতে হবে না। গর্ত করে বিভিন্ন বীজ এক সঙ্গে বপন করা যাবে। বীজ বপনের পর দুটি গর্তের মাঝামাঝি জায়গায় একটি গর্ত করে সার দিতে হবে। বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে সার সবটা জমিতেই ছড়িয়ে যাবে। ফলে জুমের ফসল উৎপাদন ও বেড়ে যাবে।

আইনগুলো ক্রমশঃ বড় হলে আইনের উপর সারিবদ্ধভাবে কলা ও পেঁপের চারা লাগিয়ে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। পরে কলা ও পেঁপে গাছ কেটে আইলের মধ্যে দিয়ে দিলে আইলগুলো আরও মজবুত হবে। আইল শক্ত হলে বৃষ্টির জল দ্রুত নীচে নামতে পারবে না। জমির মাটি আইলে আটকে যাবে। টিলার মাটি ও বৃষ্টির জলে আইলগুলো ক্রমশঃ উর্বর হবে কলা ও পেঁপের ফসল ভাল হবে। মাঝে মাঝে জলা .. আইলে দিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

জুম চাষে যেসব বীজ ব্যবহার করা হয় তার মান বিচার করা হয় না। ঘরে যে বীজ থাকে তাই ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বীজ .. করে দিলে অনেক কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

এই দুর্বলতা দূর করার জন্য জুমের জন্য ও উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ করতে হবে। বীজ শোধন করার পদ্ধতি শিখিযে দিয়ে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

জুমের জমি পরীক্ষা করে কি ধরনের সার কতটা পরিমাণে দিতে হবে তা কৃষি বিশেষজ্ঞরা বুঝিয়ে দেবেন। ইউরিয়া, ফসফেট ও পটাশ এই তিন ধরনের সার সম পরিমাণে ব্যবহার করার জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়েছেন। সার প্রয়োগের পদ্ধতি শিখিয়ে দিতে হবে।

জুম চাষের পর জমিতে ২/৩ বার আগাছা বেছে দিতে হয়। আগাছাগুলো জমির আইলে বিছিয়ে দিলে বর্ষার জলে পচে সার হয়ে যাবে।

জুমিয়ারা কীট পতঙ্গের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার জন্য কোন রাসায়নিক ব্যবহার করে না। বাঁশের তৈরী নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে আওয়াজ করে পশু পাখী কীট পতঙ্গ তাড়াবার ব্যবস্থা করে।

গাছেরও রোগ হয়। তারও চিকিৎসা করতে হয়। এ সম্পর্কে জুমিয়াদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। এসবের জন্য কৃষি দপ্তরের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন। জুমের জমিতে একবারই ফসল হয়। কাজেই সময়মত বিভিন্ন ঔষধ ও রাসায়নিক পরিমাণ মত ব্যবহার করতে না পারলে ভাল ফসল পাওয়া বা ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

জুমের চাষ এখনো বৃষ্টি নির্ভর। জলসেচের ব্যবস্থা এক সময় গড়ে তুলতেই হবে।

পাম্পেব সাহায্যে জলসেচেব ব্যবস্থা কবা সম্ভব। খাড়া টিলায সিঁড়ি কেটে টেবেসিং পদ্ধতি আগেই চালু হযেছে। আফ্রিকা থেকে সেই পদ্ধতি আমদানী কবা হযেছে। পৃথিবীর সব দেশেই চলছে গবেষণা। আবো নতুন নতুন পদ্ধতিব আবিষ্কাব হবে এবং জুম চাষের ক্ষতিকব দিকগুলো দূব হবে এটা আশা কবা যায।

সবচে গুকত্বপূর্ণ সমস্যা হল জুমিযাদেব অর্থনৈতিক অবস্থাব উন্নয়ন। শুধু জুম চাষেব উপব নির্ভব করে এই সমস্যাব সমাধান হবে না। নানা ধবনেব বিকল্প পেশায অভ্যস্ত কর্বে তুলতে হবে জুমিযাদেব। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেব মাধ্যমে কিভাবে তা কবা যায় তা নিযেই ভাবতে হবে জুমিযা পুনর্বাসনেব দাবীতে আন্দোলনকাবীদেব। জুমিযা পুনর্বাসনেব দাবীতে যাবা আন্দোলন কববেন তাদেবকে নতুন পবিস্থিতি সম্পর্কে জানতে হবে তদনুযাযী দাবীপত্র তৈবী কবতে হবে। প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি অনিযম এবংদলীয সংকীর্ণতাব বিকদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জুমিযা পুনর্বাসনে বিক্সা প্রশিক্ষণ ও প্রদান

জুমিযা পুনর্বাসনে সেলাইমেশিন প্রশিক্ষণ ও প্রদান

ত্রিপুরায় খাদ্য আন্দোলন

রাজন্য যুগে ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। এ রাজ্য থেকে ধান, কার্পাস, তুলা তিল প্রতি বছর বৃটিশ ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্যে রপ্তানী করা হত। চাকলা রোশনাবাদের বহু জিরাতিয়া প্রজা এ রাজ্যে চাষ বাস করে ফসল নিয়ে যেত। অবশ্য কোন কোন বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঝড়, তুফান বা অনাবৃষ্টির কারণে অভাব দেখা দিলে চাকলা রোশনাবাদ এলাকা থেকেও খাদ্যদ্রব্য ত্রিপুরায় আসত। সীমান্তের বাধা ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে মহারাজার নির্দেশে প্রচুর খাদ্য গোদামজাত করা হয়। বেশ কিছু মহাজনও খাদ্য মজুত করার ফলে এ রাজ্যে কৃত্রিম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। কিন্তু সভা সমিতি ও মিছিল নিষিদ্ধ থাকায় খাদ্যের দাবীতে কোন আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধের সময় একইভাবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ খাদ্য মজুত হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে জাপানী বাহিনী দ্রুতবেগে একের পর এক রাজ্য দখল করে ভারতের প্রবেশ পথ বার্মা দখল করে নেবার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সমগ্র বাংলা জাপানীদের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না এই আশংকা করে বৃটিশ সরকার পোড়ানীতি অনুসরণ করে।

মজুত খাদ্য পুড়িয়ে ফেলতে থাকে। রাস্তার সেতু ধ্বংস করা হতে থাকে। নদীর সব নৌকা ডুবিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যদিকে দেখা দেয় অনাবৃষ্টি। বাংলার হাজার হাজার গ্রামের লক্ষ লক্ষ কৃষক বৃটিশের সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করেছিল। সরকারী হিসাবেই ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে খ্যাত হয়েছে। ত্রিপুরায়ও অনাহার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে বিপুল বনজ সম্পদ ত্রিপুরার ক্ষুধার্ত মানুষকে বহু বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরই ত্রিপুরায় নতুনভাবে গণআন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি হতে থাকে। সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকা কালেই জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়। অরাজনৈতিক সমাজসেবামূলক কাজ বলেই মহারাজা বীর বিক্রম জনশিক্ষা আন্দোলনে কোন বাধা সৃষ্টি করেননি।

১৯৪৬ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সব সদস্যরা মিলে ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস কমিটি গঠন করেন। **এই কমিটির উদ্যোগে প্রচারিত ২০ দফা কর্মসূচীতে খাদ্য সমস্যার কোন উল্লেখ ছিল না।**

১৯৪৬ সালের শেষ দিকে নোয়াখালীতে ভয়াবহ দাঙ্গা হবার পর হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয়। তখনো দেশ ভাগ হয়নি। চাকলা রোশনাবাদের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খাদ্য দ্রব্য অবাধেই চলে আসতো।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে সীমান্ত বন্ধ না হলেও শত্রুতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট অনুভূত হতে থাকে।

১৯৪৮ সালে খাদ্যের দাবীতে গোলাঘাটিতে ক্ষুধার্ত কৃষকদের এক সমাবেশে পুলিশের গুলি চালনায় নয়জন কৃষকের মৃত্যু হয়। এবকম হৃদয়বিদারক ঘটনা ত্রিপুরায় এটাই প্রথম। রাজন্য যুগে ক্ষুধার্ত মানুষকে খুন করার কোন ঘটনা ঘটেনি। মহারাজা বীর বিক্রমের অকাল মৃত্যুর পর দেওয়ানী শাসনকালে এরূপ ঘটনা ঘটায় উপজাতিদের মনে কংগ্রেস দল সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা জেগে উঠে। তারই ফলে গণমুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠে।

১৯৫০ সালের পর দফায় দফায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে খাদ্য সংকট ক্রমশঃ তীব্র রূপ নিতে থাকে। পাসপোর্ট প্রথা চালু করে সীমান্ত বন্ধ করে দেবার পর খাদ্য আমদানীর সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। সারা রাজ্যে তখন খাদ্যের জন্য হাহাকার শুরু হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে বিমানপথে ত্রিপুরায় খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু রাজ্যের একমাত্র বিমানঘাটি আগরতলা থেকে মহকুমাগুলোতে খাদ্য পাঠাবার কোন রাস্তাঘাট ছিল না।

ফলে জরুরী ভিত্তিতে বিলোনীয়া-খোয়াই ও কৈলাসহরে বিমান ঘাটি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয় এবং আসাম-আগরতলা রাস্তার কাজ বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্মাণ করা হয়।

ক্রমে ক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা হলেও একদিকে অধিকাংশ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল অস্বাভাবিকভাবে।

এই সময় শহর এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল খুবই দুর্বল। কংগ্রেস দল সরকারী দলে পরিণত হবার পর জনগণের দাবীতে আন্দোলন সংগঠিত করার পরিবর্তে যারা আন্দোলনে যোগ দেয় তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বেশী উৎসাহী ছিল।

ত্রিপুরায় ১৯৫১ সালে খোয়াই বিভাগে দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে সারা ত্রিপুরায় তীব্র খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় । কমিউনিষ্ট পার্টি - পি এস পি,-ফরওয়ার্ড ব্লক -আর এস পি এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যক্তিবর্গের সর্বদলীয় উদ্যোগে খাদ্য আন্দোলন গড়ে উঠে।

অবশ্য ভারতভুক্তির আগে ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের উপর দিয়ে মালপত্র ত্রিপুরায় আসা বন্ধ করে দেওয়ায় যে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল এবং মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছিল তার প্রতিবাদে সংগঠিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল কংগ্রেস দল। ছাত্র কংগ্রেসের নেতৃত্বে উমাকান্ত মাঠে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই জমায়েতে হঠাৎ করে পুলিশের লাঠি চার্জ শুরু হয়। প্রিয়দাস চক্রবর্তী, অনিল ভট্টাচার্য, বাসনা চক্রবর্তী, অনিল চক্রবর্তী, হারাধন বর্দ্ধন এই জমায়েতে পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন এবং প্রতিকার দাবী করেন। প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দাবী করে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

কংগ্রেস অফিস থেকে এরূপ আন্দোলনের কোন নির্দেশ ছিল না বা নিষেধও ছিল না। বাস্তব পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন ছিল। একদিকে খাদ্য আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে ত্রিপুরার কৃষকদের কাছ থেকে কম দামে খাদ্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। কৃষকদের দাবী ছিল বাজার দরে খাদ্য কিনতে হবে।

মহকুমাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। মাল পত্র আদানপ্রদানের যানবাহনও

ছিল না। অনেক জায়গায় গরুর গাড়ী চলার মত রাস্তাও ছিল না। গরুর গাড়ীর সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য।

ধর্মনগর- কৈলাসহর-বিলোনীয়া ও অন্যান্য মহকুমার কংগ্রেস নেতারা আগরতলায় এসে কংগ্রেস ভবনে এ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবী জানান। তড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত এবং গয়া প্রসাদ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে চীপ কমিশনারের কাছে একটা ডেপুটেশন দেওয়া হয়।আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী সংগ্রহ মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবার পর ডাক বিভাগ বিমানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কয়েকশ রানার নিয়োগ করতে হয়। পায়ে হেঁটে কাঁধে বোঝা নিয়ে বিভিন্ন মহকুমায় পোষ্ট পার্শ্বেল পৌঁছাতে হয়। তখন প্রচুর মালপত্র পোষ্ট পার্শ্বেলে আসতো। আগরতলা থেকে খাদ্য দ্রব্যাদিও কাঁধের ভারে করে দুর দুরান্তে নিয়ে যেতে হতো।

রাস্তাঘাট নির্মাণের প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ জঙ্গল কাটা এবং মাটি সমান করার ব্যবস্থা হবার পর গরুর গাড়ীতে মাল চলাচল শুরু হয়। নদীপথে নৌকা যোগেও মালপত্র আনা নেওয়ার কাজ চলতে থাকে।

১৯৫৩ সালে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবার পর কংগ্রেস দলের ভূমিকা বদলে যায়। কংগ্রেস দলের যুব নেতা সুখময় সেনগুপ্ত যিনি এক সময় গণআন্দোলনে যুবকদের মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন, তিনিই উপদেষ্টা হবার পর গণআন্দোলন দমনের জন্য পুলিশকে লাঠি চার্জ করার নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেননি।

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে খাদ্য সংকট ক্রমাগত বেড়েছে। ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম দফায় পুনর্বাসনের কাজ শেষ হবার পর ত্রিপুরায় খাদ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু ১৯৬৪ সালের পর নতুনভাবে উদ্বাস্তু আগমনের পর খাদ্য সমস্যা আবার তীব্র আকার ধারণ করে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজও এই সময় বন্ধ ছিল। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ শেষ হবার তিন বছরের মধ্যেই পাক - ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে আসাম - আগরতলা এবং আগরতলা - সাব্রুম রাস্তা চালু হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ ও পুনর্বাসনের দ্বিমুখী সমস্যা মোকাবিলা করা কঠিন হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভারত ছিল খাদ্যে ঘাটতি দেশ। সেই সঙ্গে শুরু হয় পর পর যুদ্ধ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা। প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহেরু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাভাবে চেষ্টা করেও সম্মানজনক শর্তে খাদ্য আমদানীর কোন উপায় করতে পারেননি। ফলে, বাধ্য হয়ে আমেরিকার সঙ্গে কিছু আপত্তিজনক শর্ত মেনে নিয়েই খাদ্য আমদানীর চুক্তি করতে হয়েছিল। পি. এল - ৪৮০ চুক্তির জন্য অনেক রকম সমালোচনা শুনতে হয়েছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত ভারতবাসীর মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য তখন আর কোন বিকল্প ছিল না।

পাক - ভারত যুদ্ধের পর ১৯৬৬ সালে ত্রিপুরায় খাদ্য সংকট চরম আকার নেয়। সারা রাজ্যে খাদ্যের চোরাকারবার এবং গোপনে খাদ্য মজুত করার প্রবণতা ব্যাপক রূপ নেয়। শহর এলাকায় রেশনশপে খাদ্য সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলে রেশন দোকান ছিল না।

কেন্দ্রীয় সরবরাহ অনিয়মিত হয়ে পড়ায় ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফার আশায় খাদ্য দ্রব্য লুকিয়ে ফেলে।

সরকার অনেকটা অসহায় এবং নির্বিকার হয়ে পড়ে। সমস্যাটা ছিল সর্বভাতীয়। তবে ত্রিপুরায় তীব্রতা ছিল বেশী। অপচয় বন্ধ করার জন্য সরকারী প্রচার চলতে থাকে। কিন্তু মজুত উদ্ধারের কোন উদ্যোগই ছিল না। ফলে গণঅসন্তোষ ব্যাপকভাবে সারা রাজ্যে দেখা দেয়।

ত্রিপুরায় খাদ্য দ্রব্যের সরকারী মজুত ভান্ডার ছিল না। খাদ্য গুদামও ছিল না। খাদ্য গুদাম তৈরী করা এবং খাদ্য সরবরাহ করা দুটিই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই সময় আসামে ব্যাপক বন্যা দেখা দেওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকা থেকে অনাহার মৃত্যুর খবর আসতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানেও ছিল খাদ্য সংকট। ত্রিপুরার খাদ্য সীমান্ত বাণিজ্যের মারফতে ব্যাপকভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল দ্রুততালে।

এই রকম পরিস্থিতিতে সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করে ব্যাপক খাদ্য আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ আকাশ বাণী থেকে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে খাদ্য পরিস্থিতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারও চাহিদামত চাউল, গম সরবরাহ করতে পারছে না। কারণ উদ্বাস্তু আগমনের ফলে রাজ্যের চাহিদা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী বার বার জরুরী বার্তা পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন যাতে খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় কংগ্রেস কর্মীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে।

১৮ই মে ১৯৬৬ ইং তারিখে আগরতলা শিশু উদ্যানে সর্বদলীয় খাদ্য ত্রাণ কমিটির আহ্বানে এক বিশাল সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার সভাপতি অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র চৌধুরী সভাপতির ভাষণে বলেন- যুগে যুগে বুভুক্ষুরা বিপ্লব সৃষ্টি করে। ১৮ বছরের স্বাধীনতার পরও খাদ্য সমস্যার সমাধান হল না। আমেরিকার কাছে আমাদের ভিক্ষাবৃত্তি করতে হচ্ছে। তাদের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে আছে ভারত সরকার।

এই সভায় অনান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, দ্বিজেন দে, জিতেন পাল, মোহন চৌধুরী, নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, সরোজ চন্দ, সাধনা চক্রবর্তী, দীপক দে, অনিল সরকার ও অন্যান্যরা।

এই সভা থেকে রাজ্যের সর্বত্র মজুত উদ্ধার করে ন্যায্য দামে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে দাবী করা হয়। রাজ্যের সর্বত্র রেশন ব্যবস্থা চালু করে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের দাবী জানানো হয়। এছাড়া অবিলম্বে খাদ্য পাচার অভিযান কঠোরভাবে শুরু করার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান রাখা হয়।

এই সময় নতুন দুটি ছাত্র সংগঠন খাদ্য আন্দোলনে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি করে নিশীথ দাসের নেতৃত্বে ছাত্র ঐক্য সংস্থা এবং দীপক দে, মানিক দে ও সুদর্শন দাসের নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন মজুত উদ্ধার করে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বন্টন করে। উদয়পুরে মৎস্য ব্যবসায়ী গৌরাঙ্গ দাস দাস পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সরকারী কর্মচারীরাও খাদ্য আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৭ই

জুন ১৯৬৬ তারিখে সরকারী খাদ্য নীতির প্রতিবাদে আগরতলায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়। আহ্বায়ক দ্বিজেন দে জনগণকে হরতাল সফল করার জন্য অভিনন্দন জানান।

১৯ শে জুন ১৯৬৬ তারিখে আগরতলায় অজয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে খাদ্য সমস্যা সমাধানের দাবীতে কর্মচারীদের বিশাল মিছিল হয়। শিশু উদ্যানে বিশাল জমায়েতে অজয় বিশ্বাস এবং ভবেশ দাস বক্তব্য রাখেন। এই জমায়েত থেকে সপ্তাহে মাথাপিছু সাড়ে তিন কেজি চাউল এবং দেড় কেজি গম সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। রেশনকার্ড বিলি বন্টনে অযথা হয়রানী বন্ধ করারও দাবী করা হয়।

সর্বদলীয় খাদ্য ত্রাণ কমিটি ১০ই জুলাই ১৯৬৬ তারিখের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র সরকারী নীতির প্রতিবাদে হরতাল পালনের আহ্বান জানায় এবং মজুত খাদ্য উদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আবেদন জানায়।

১৯৭০-৭১ সালে ব্যাপক সংখ্যক শরনার্থী পূর্ব বাংলা থেকে ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। সেই সঙ্গে শুরু হয় পাক-ভারত যুদ্ধ। ত্রিপুরার লোকসংখ্যা থেকেও শরনার্থী সংখ্যা ছিল বেশী। ফলে নতুনভাবে দেখা দেয় খাদ্য সংকট।

এই সময় সি পি আই এককভাবে সারা রাজ্যে খাদ্য, কাজ ও কেরোসিনের দাবীতে সারা রাজ্যে মিছিল মিটিং করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সংগঠিত করে।

অন্যদিকে খাদ্য ও অন্যান্য দাবীতে বামফ্রন্টের আহ্বানে বিধানসভা অভিযান করা হয়। বিশাল জমায়েতে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তী সরকারের নিষ্ক্রীয় ভূমিকার বিরুদ্ধে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে জনগণের কাছে আহ্বান জানান।

বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট রাজনৈতিক দলগুলো খাদ্য সংকট নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ছাত্র - যুবকদের মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর খাদ্য আন্দোলন বন্ধ রাখতে হয়। ১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারগুলোব পতনের পর নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ত্রিপরায় এখন খাদ্যাভাব নেই কিন্তু কাজের অভাব বেড়েই চলেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবার ফলে ভিন্ন রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানী করা সহজ হয়েছে। স্বাধীনতার পর ১০টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাতে ভারতের কৃষি উৎপাদনে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। যে ভারত ৪০ কোটি মানুষের খাদ্য যোগান দিতে পারত না সেই ভারত এখন ১০০ কোটিরও বেশী মানুষের খাদ্য যেগান দিচ্ছে। ভারতের কৃষিবিদ্যা ও কৃষি বিজ্ঞান এখন আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। উন্নত বীজ, সার, সেচ ও চাষ পদ্ধতিতে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। তবুও ক্রয় ক্ষমতার অভাবে খাদ্য সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই খাদ্য আন্দোলনের সঙ্গে কাজের দাবীতেও আন্দোলন চলছে। ক্রয় ক্ষমতাহীন ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যাও বাড়ছে।

ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কার আন্দোলন

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের আগে ভূমি সংক্রান্ত কোন আইন কানুন ছিল না। রাজ্যের প্রজাদেরও ভূমির উপর কোন সত্ত্ব ছিল না। অধিকাংশ উপজাতি প্রজা জুম চাষের উপর নির্ভশীল ছিল। একই এলাকায় বার বার জুম চাষ চলে না। তাই জুমিয়ারা কিছুকাল পর পরই নতুন এলাকায় জুম চাষের জন্য সরে যেতে বাধ্য হয়। ফলে জুমিয়াদের কোন স্থায়ী বসতি গড়ে উঠেনি কাজেই জমির উপর স্থায়ী সত্ত্বের প্রয়োজন হয়নি । বছরে একবার ঘর চুক্তি কর জমা দিলেই মহারাজারা খুশী থাকতেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সর্দার বছরে একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা করে জুমিয়াদের আর্থিক অবস্থা বিচার বিবেচনা করে ঘর চুক্তি কর স্থির করার পর রাজ দরবারে কর জমা দিতেন। ত্রিপুরায় দুর্গা পূজা উপলক্ষে এক উৎসবের পরিবেশে কর আদায়ের কাজ সম্পন্ন হত। এই উপলক্ষে সর্দারদের ভূড়ি ভোজনের আয়োজন করা হত। প্রজাদের সঙ্গে রাজার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল না। প্রত্যেক উপজাতি গোষ্ঠীর জন্য রাজ পরিবারের একজনকে মিসিপ নিযুক্ত করা হত। যে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য মিসিপের সঙ্গে সর্দাররা যোগাযোগ করতে পারতেন। বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে মিসিপ বিষয়টিকে মহাবাজার দরবারে পেশ করতেন। মহারাজার সিদ্ধান্তই শেষ কথা। মহারাজার আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ চলতো।

মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের সময় বৃটিশ রাজ প্রতিনিধির পরামর্শে রাজ্যের আয় বৃদ্ধির জন্য ভূমি বন্দোবস্ত আইন তৈরী করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ সবকারের একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী নীলমণি দাসকে দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৃটিশ আইনের অনুকরণে ভূমি বন্দোবস্ত আইন, স্টাম্প আইন, ভূমি রেজেস্ট্রী করার আইন তৈরী করেন। এগুলোই ছিল ত্রিপুরায় প্রথম লিখিত আইন। এর আগে রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন।

এসব ব্যবস্থার ফলে রাজ্যের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভূমি বন্দোবস্ত নেবার জন্য প্রজাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। রাজ কার্যের সুবিধার জন্য ১৮৭৩ সালে তিনটি বিভাগ স্থাপন করা হয়। আগরতলা (সদর বিভাগ), উদয়পুর ও কৈলাসহর এই তিনটি বিভাগে প্রশাসনের বিভিন্ন কাজকর্মের প্রথম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। ১৮৮২ সালে বিলোনীয়া বিভাগ স্থাপন করা হয়। মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য নতুন তিনটি বিভাগ স্থাপন করেন সোনামুড়া - খোয়াই ও ধর্মনগর।

মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোরের সময় সাব্রুম বিভাগটি স্থাপিত হয়। ১৯১৭ সালে অমরপুর এবং কল্যাণপুর বিভাগ দুটি স্থাপন করা হয়। সব বিভাগীয় অফিসে ভূমি বন্দোবস্ত এবং ক্রয় - বিক্রয়ের দলিল রেজেস্ট্রী করার ব্যবস্থা চালু হয়।

১৯১৬ সালে কৈলাসহরে দুটি চা-বাগান তৈরীর কাজ শুরু হয়। এটাই ত্রিপুরায় চা-বাগানের প্রথম উদ্যোগ।

এভাবে ক্রমে ক্রমে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের জন্য ভূমি আইন তৈরী হতে থাকে।

বৃটিশ শাসনে ভারতের কৃষকদের জীবনে যে চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছিল, ত্রিপুরায় তেমন ঘটনা ঘটেনি।

১৭৯৩ সালে বৃটিশ স্বার্থে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন চালু হবার ফলে বৃটিশ ভারতের কৃষকেরা জমির উপর অধিকার হারায়। জমির মালিকানা চলে যায় জমিদার শ্রেণীর হাতে। মোগল আমলে ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল। বৃটিশ আমলে তারাই হঠাৎ করে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হল। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় যে দুর্দিন নেমে এল তার হাত থেকে মুক্তির জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভূমি সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

(১) লাঙ্গল যার জমি তার, অর্থাৎ যে জমি চাষ করে জমি তারই হবে। ল্যাণ্ড টু দি টিলার্স অর্থাৎ (২) কৃষকের হাতে জমি দাও। এই দুটি স্লোগানই হল ভূমি সংস্কারের মূল কথা।

বৃটিশ শাসকদের তৈরী ভূমি আইনে কৃষকেরা হয়েছিল নিঃস্ব - ভূমিহীন - নির্যাতিত, ঋণগ্রস্ত, চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসের মত। অন্যদিকে জমির মালিক হয়েছিল — জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, দালাল, উকীল ও মুক্তার শ্রেণীর লোকেরা, জমির সঙ্গে বা কৃষির সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। ঘরে বসে অর্দ্ধেক ফসলের মালিক হত এই সব ভুঁইফোর জমির মালিকেরা। ক্রমে ক্রমে কৃষিতে নানা ধরনের মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হল। তালুকদার, জোতদার, ইজারাদার ইত্যাদি মধ্যসত্ত্বভোগী শোষক শ্রেণীর আবির্ভাবে ভারতীয় কৃষকের সামাজিক জীবন ছাড়খার হয়ে গিয়েছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট উভয় দলই ভূমি সংস্কারের দাবীতে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন শুরু করে। সারা দেশে অসংখ্য সভা - সমিতি, মিছিল ও সম্মেলনে লক্ষ লক্ষ কৃষক জমায়েত হতে থাকে।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে কংগ্রেস দল ভূমি সংস্কার নীতি থেকে দূরে সরে যায়। কারণ কংগ্রেস দলের মূল ভিত্তিই ছিল জমিদার - জোতদার, মহাজন - ব্যবসায়ী ও অন্যান্য মধ্যসত্ত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

কমিউনিষ্টরা ভূমি সংস্কারের দাবীতে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। জঙ্গী কৃষক আন্দোলন দমনে যেখানে যেখানে পুলিশ ও গুন্ডা বাহিনীর আক্রমণ এসেছে সেখানে সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে তুলেছে।

ফলে স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জমিদারী প্রথা বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। পার্লামেন্টে আইন পাস হলেও কোন রাজ্য সরকারই এই আইন কার্যকর করতে কোন উদ্যোগ নেয়নি। জমিদাররা পরিবার পরিজন সহ বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন এবং মন্দির - মসজিদ এমন কি বাড়ীর পোষা কুকুর - বিড়ালের নামে বেনামে জমি ভাগ করে ভোগ দখল কবতে থাকে।

ফলে ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য কৃষকের হাতে জমি দেওয়ার উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়।

কমিউনিষ্ট পার্টি অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে উদ্বৃত্ত জমি ও সরকারী খাস জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার জন্য জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে।

এই সময় ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্যেও এই জমি দখলের

আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়ে।

ত্রিপরায় কোন জমিদার ছিল না। কিন্তু ছোট বড় অনেক তালুকদার ও জোতদার ছিল। তাদের জমিতে যেসব বর্গা চাষীরা চাষ করতো তাদের সবাইকে বর্গা চাষ থেকে উচ্ছেদ করা শুরু হয়। কারণ তালুকদার ও জোতদারদের ভয় হল বর্গা চাষীরাই জমির মালিক হয়ে যাবে। যেসব কংগ্রেস নেতারা এক সময় লাঙ্গল যার জমি তার – স্লোগান দিয়ে কৃষকদের ময়দানে টেনে আনতেন তারাই স্বাধীনতার পর তালুকদার ও জোতদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিশকে লাঠি - গুলি চালিয়ে আন্দোলন দমন করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনা শুধু ত্রিপুরায় নয়। সারা ভারতবর্ষে একই চিত্র।

সুদীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে একাধিক্রমে কংগ্রেস শাসন থাকা সত্ত্বেও ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর হয়নি। বিহার - মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং উত্তরপ্রদেশে ব্যাপকভাবে কৃষক আন্দোলন দমন করার জন্য বেতনভোগী গুন্ডা বাহিনী গঠন করেছে জমিদাররা। সঙ্গে পুলিশ ও তাদের সাহায্য করে।

ভারতের সর্বত্র ভূমিহীন কৃষকরা হল শত শত বছরের অবহেলিত দলিত, পশ্চাদ্ পদ ও নিম্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা। সংখ্যার দিক থেকে তারা এখনো দেশের অধিকাংশ। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও তারা অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত।

ত্রিপুরায় জমি দখল আন্দোলন ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত মজুর শ্রেণীর অধিকারকে সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ভূমি সংস্কারের দাবীতে পার্লামেন্টে দশরথ দেব ও বীরেন দত্ত যে সব বক্তব্য রেখেছেন তা অন্যান্য রাজ্যের নেতাদেরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

ত্রিপুরায় বিধানসভা না থাকায় ১৯৬০ সালে পার্লামেন্টে ত্রিপুরার জন্য একটি ভূমি সংস্কার আইন পাস করা হয়। এই আইন কার্যকর করতেও রাজ্য সরকার আগ্রহী ছিল না।

ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কারের প্রধান দাবী ছিল বিপন্ন উপজাতি মানুষেরা মহাজনের ঋণ শোধ করার জন্য বা বিপদের সময় ঋণ না পাওয়ার ফলে যেসব জমি নাম মাত্র মূল্যে বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। জমি ফেরৎ দেওয়ার ফলে কেউ যদি বিপন্ন হয় বা ভূমিহীন হয় তবে তাকে ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন দেবার জন্যও দাবী করা হয়। ১৯৫৪ সাল থেকেই এই দাবীতে বড় বড় মিছিল - মিটিং হয়েছে রাজ্যের সর্বত্র। কিন্তু রাজ্য সরকার গ্রাহ্য করেনি। ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার আইনে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের কাছে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে সরকারী অনুমতি নিয়ে বিক্রীর ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। অনুমতি ছাড়া হস্তান্তরকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়।

এই আইন পাস করার পরও ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকার বেআইনী জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি।

১৯৭৪ সালে পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেন গুপ্ত ত্রিপরা বিধানসভায় ভূমি সংস্কার আইন সংশোধনী বিল পেশ করে পাস করিয়ে নেন। বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করার পর ১৯৭৫ সালে এবং ১৯৭৬ সালে জরুরী অবস্থার সময় দুইবার সংশোধন করেন।

এসব সংশোধনীর ফলে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার নীতি ১৯৬৯ সাল

থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া প্রত্যেক পরিবারের জমির উর্দ্ধসীমার পরিবর্তন ঘটানো হয়।

জরুরী অবস্থার সময় এসব সংশোধনীর উপর আন্দোলন করার সুযোগ ছিল না। জরুরী অবস্থা তুলে নেবার পর তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হয়।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল বিধানসভায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসে ভূমি সংস্কার আইনকে জনগণের স্বার্থে প্রয়োগ করাব উদ্যোগ নেয় ।

জমির সিলিং সংক্রান্ত বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা যায় উপজাতি সমাজে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত একই ব্যক্তির নামে জমি নথিভুক্ত রয়েছে অথচ ইতিমধ্যে বংশ ধরেরা বহু পবিবারে বিভক্ত হয়ে গেছে। পুত্র বা নাতিরা পৃথকভাবে জমি ভাগ করে নিয়েছে কিন্তু পৃথক দলিল বা নথিভুক্ত করেনি। অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, অনেক ক্ষেত্রে উকীল-মোক্তারের ভয়। আবার কাবো ক্ষেত্রে পৃথক দলিল রেজিষ্ট্রী করার মত আর্থিক সামর্থ্যের অভাব ইত্যাদি কারণে একই ব্যক্তির নামে জমি নথিভুক্ত থাকলেও তা একই পরিবারের সম্পত্তি নয়। এরূপ ক্ষেত্রে জমি ভাগ করে পৃথক দলিল করার সুযোগ দেওয়া হয়।

বেআইনী হস্তান্তরিত জমি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে উপজাতি এবং অনুপজাতির ভূমিহীন কৃষকদের বিভিন্ন প্রকল্পে পুনর্বাসনের কাজ চলছে। এভাবেই ত্রিপুরা বাজ্যে ভূমি সংস্কার আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছে। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে প্রত্যেক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরকে কৃষিজমি দেওয়া সম্ভব নয় । উদ্বাস্তু আগমন ছাড়াও ভারতের প্রতিটি রাজ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিব কারনে ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। তাই এখন লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য বাস্তু ভিটা এবং বিকল্প কাজেব সংস্থান করা । এব জন্য তৈরী হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প ।

ত্রিপুরায় ছাত্র আন্দোলন

ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রদের উদ্যোগেই গণচেতনার বিকাশ ঘটেছে। সমাজ সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে দিয়েই গণআন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। অনুশীলন সমিতির অবদানই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কুমিল্লা কলেজে পাঠরত ত্রিপরার ছাত্ররা অনুশীলন সমিতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে বিভিন্নভাবে। বৃটিশ বিরোধী চিন্তাধারার প্রসার এবং দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য বোধ জাগিয়ে তোলাই ছিল ছাত্র রাজনীতির প্রথম স্তর।

ছাত্রসংঘই হল ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। পরে যুগান্তর দলের অনুগামীরা গঠন করেন ভাতৃ সংঘ। প্রভাত রায় গঠন করেন সবুজ সংঘ। মিলন সংঘ এবং মাতৃ সংঘও এই ধারারই সংগঠন।

আগরতলায় অনুশীলন সমিতির অনুগামীদের মধ্যে প্রথম সারির নেতৃত্বে ছিলেন – ক্ষিতীশ চন্দ্র বানার্জী, প্রিয় নাথ বানার্জী, সুকুমার ভৌমিক,উমেশলাল সিংহ, শচীন্দ্র লাল সিংহ, বীরেন দত্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সুখময় সেনগুপ্ত, প্রভাত রায়, ধীরেন দত্ত, জিতেন দত্ত, কৃষ্ণ

চক্রবর্তী, কান্তি দেববর্মা, নলিনী সেনগুপ্ত, শচীন দত্ত, পবিত্র পাল প্রমুখরা। এরা সকলেই পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

যুগান্তর দলের অনুগামীরা ভাতৃ সংঘ গঠন করেন। আগরতলায় নেতৃত্ব দেন - তড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত, ক্ষিরোদ সেন,মণিময় বিশ্বাস, বঙ্কিম চক্রবর্তী, সনৎ দত্ত, গোপাল চক্রবর্তী, হররঞ্জন গাঙ্গুলী, অমূল্য ভূষণ মজুমদার প্রমুখরা। এরা সকলেই ছিলেন ছাত্র।

অনুশীলন সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল আন্তরিক অনুশীলনের দ্বারা সবল শরীর গঠন এবং মানসিক উন্নয়নের দ্বারা সৎ, সাহসী, সমাজসেবক এবং নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক সৃষ্টি করা। অনুশীলন সমিতির কাজকর্ম প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। সারা ভারতবর্ষে অনুশীলন সমিতির সংগঠন ছড়িয়ে পড়েছিল। মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।

কংগ্রেস দল গঠিত হবার ৪৫ বছর পর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী পাস করেছিল। অথচ অনুশীলন সমিতির জন্মই হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখে। তাই বিদেশী শাসকরা অনুশীলন দলের সদস্যদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছে সমিতির সংগঠনকে। অসংখ্য কর্মী ও নেতাকে গুলি করে হত্যা করেছে, বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় মৃত্যুদন্ড ও যাবজ্জীবন দন্ড দিয়েছে। দেশপ্রেমের গভীর আকর্ষণে ছাত্র জীবন ছেড়ে হাজার হাজার ছাত্র যোগ দিয়েছে বিপ্লবী আন্দোলনে।

যুগান্তর পত্রিকা ছিল যুগান্তর দলের মুখপত্র। ১৯০৬ সালে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হাজার হাজার ছাত্র এই পত্রিকার প্রভাবে বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনে স্বেচ্ছায় স্কুল-কলেজ ছেড়ে যোগ দিয়েছিল বিপ্লবী আন্দোলনে। মেয়েরাও এসেছে নানাভাবে সাহায্য করতে।

আগরতলার নবম ও দশম শ্রেণী দুই ছাত্রী বীনা দত্ত ও পানু দত্ত যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন। এরা দু'জনেই ছিলেন সহোদর বোন। বাড়ীতে বেআইনী বই রাখার অপরাধে রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন। বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ বেআইনী কয়েকটি বই পেয়েছিল।

কুমিল্লায় শান্তি ও সুনীতির কাহিনী তখন চারিদিকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তারাও বিপ্লবী দলের সদস্য ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ত্রিপুরা বোর্ডিং-এর ছাত্ররাই গণশিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ত্রিপরার গ্রামীণ জুমিয়া পরিবারের ছাত্রদের এই আন্দোলন ছিল ত্রিপুরার ইতিহাসে একটি টার্নিং পয়েন্ট।

১৯৪৬ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস দল গঠিত হবার পর উদ্বাস্তু আগমনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। প্রকাশ্যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের অনুগামী ছাত্র সংগঠন এই সময়ই কাজ করতে শুরু করে।

১৯৪৭ সালের এম. বি. বি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্র কুমিল্লা কলেজ থেকে সরে আসে এম বি বি কলেজে। ছাত্র কংগ্রেস গঠিত হয় কংগ্রেস দলের উদ্যোগে। সভাপতি নির্বাচিত হন প্রিয়দাস চক্রবর্তী এবং সম্পাদক নির্বাচিত হন সরোজ চন্দ। কমিউনিষ্ট পার্টি তখনো প্রকাশ্যে কাজ শুরু করেনি।

কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা দেবার পর দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। বামপন্থী ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জলন্ত সমস্যার প্রতিকারের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। এই সময় সরোজ চন্দ কংগ্রেস দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সি পি আই দলে যোগ দেন।

এম বি বি কলেজের প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে বীর বল্লভ সাহা ছিলেন ছাত্র ব্লকের নেতা। ছাত্র ব্লক পরে ছাত্র ব্যুরো নামে পুনর্গঠিত হয়। সভাপতি বীর বল্লভ সাহা ছাড়াও নেতৃত্বে ছিলেন - তুষার কান্তি সেন, অজয় সিংহ রায়, গৌরাঙ্গ ঘটক, সুকুমার দাস।

সরোজ চন্দ ছাত্র কংগ্রেস ছেড়ে যাবার পর নেতৃত্ব দেন সজল কান্তি বসু । পঞ্চাশের দশকে ছাত্র আন্দোলনে বিদ্বেষ ছিল না। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজে সব ছাত্ররাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে।

নোয়াখালী দাঙ্গার পরে যে সব উদ্বাস্তুরা এসেছে তাদের প্রায় সকলেই একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় এসেছে। রাজ্যের কোন মহকুমাতেই আশ্রয় দেবার মত শিবির ছিল না। সর্বত্র রাতারাতি ছন বাঁশের বড় বড় ঘর তৈরী করে আশ্রয় শিবির তৈরী করতে হয়েছিল। উদ্বাস্তুদের জরুরী প্রয়োজন ছিল আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা। ত্রিপুরায় এই বিপুল সমস্যার মোকাবিলা করার মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্ররা সংঘবদ্ধভাবে সেবামূলক মনোভাব নিয়ে এই সময় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত প্রথম দফায় উদ্বাস্তু আগমনের ফলে তীব্র শিক্ষা সংকট সৃষ্টি হয়। স্কুলের অভাব, বইপত্রের অভাব, শিক্ষকের অভাব, কাগজ কলমের অভাব, পড়াশোনা করার মত কেরোসিনের অভাব সেই সঙ্গে উদ্বাস্তুদের ক্রয় ক্ষমতার অভাব।

খাদ্য সংকট এবং শিক্ষা সংকটের মোকাবিলায় ছাত্র সমাজ প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজ্যের সর্বত্র সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে বহু বিদ্যালয় স্থাপনের কাজে ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। ঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র সংগ্রহ করা, চাঁদা সংগ্রহ করা ইত্যাদি কাজের সঙ্গে ছাত্রদের বুকগ্র্যান্ট ও স্টাইপেন্ড আদায়ের জন্য আন্দোলন করা, রেশনে কাগজ-খাদ্য ও কেরোসিন সরবরাহের দাবীতে আন্দোলন করা, উদ্বাস্তু শিবিরে শৃংখলা রক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজে ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বিদ্যালয়গুলোতে নকল পার্লামেন্ট তৈরী করে গণতান্ত্রিক শিক্ষা প্রসারের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক দলগুলো আড়াল থেকে দলীয় প্রভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছাত্র সংগঠনগুলোকে মদত দিতে থাকে। কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক বিদ্বেষমূলক রাজনৈতিক প্রচার শুরু হয়। পোষ্টার, হ্যান্ডবিল, বক্তৃতা ক্রমশঃ তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ, সংঘাত, সংঘর্ষ শুরু হয়। পেছন থেকে রাজনৈতিক দলের অনুগামী শিক্ষকরাও এসব সংঘাত ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ফলে ছাত্র আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ পরিস্থিতি একেবারে বদলে যায়।

১৯৬৭ সালে এম বি বি কলেজের বার্ষিক ছাত্র সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি সজল কান্তি লস্কর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি মানবিক আবেদন জানিয়ে বলেন – রাজ্যের ও দেশের

বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত। কোন ইজমেই জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভেদের পরিনামে সামাজিক শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট হবে।

ষাটের দশকে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং পাক-ভারত যুদ্ধ দেশের পরিস্থিতিকে অত্যন্ত জটিল করে তুলেছিল। ১৯৬৪ সাল থেকে ব্যাপকভাবে দ্বিতীয় দফায় উদ্বাস্তু আগমন ঘটতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের ঐক্যবদ্ধ সেবামূলক কাজ এই সময় খুব জরুরী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক সংকীর্ণতা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভেদও সংঘাতের পথকেই খুলে দিয়েছিল।

১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় প্রকৃত পক্ষে বেকার সমস্যা ছিল না। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত কর্মীর অভাব ছিল। ভিন্ন রাজ্য থেকে কর্মী নিয়োগ করতে হয়েছে বাড়তি ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিয়ে।

এই সময়েই উপজাতি ছাত্র যুবকদের মধ্যেও জেগে উঠে অসন্তোষ। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে গড়ে উঠে উপজাতি ছাত্র সংগঠন টি এস এফ। শুরু হয় ছাত্র আন্দোলনে সংঘাতের নতুন ধারা। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্য সরকার কাজ করছে না। তাই উপজাতি ছাত্র- ছাত্রীরা বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এই অভিযোগটাই ছিল প্রধান। এই অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলে রাজ্যের শান্তি-সম্প্রীতি ও উন্নয়নের পক্ষে কল্যাণকর হত। কিন্তু তার পরিবর্তে ক্রমশঃ তা বিদ্বেষের আগুনে পরিণত হল।

ছাত্র আন্দোলনে আরেক কলংকের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে নক্সাল পন্থীরা। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া, লাইব্রেরী ধ্বংস করা, পরীক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করা, স্কুল বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পুড়িয়ে দেওয়ার, এই নক্সাল পন্থী আন্দোলনেব সূত্রপাত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। তা অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বত্র। আবেগপ্রবণ বহু ছাত্র নক্সাল রাজনীতির প্রভাবে উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই ধ্বংসাত্মক ছাত্র আন্দোলনে। হাজার হাজার ছাত্র প্রাণ দিয়েছে পুলিশের সঙ্গে সংঘাতে ও সংঘর্ষে। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলন স্তব্ধ হয়েছিল।

রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দাবীতে বহু স্বতঃস্ফূর্ত ছাত্র আন্দোলন হয়েছে। যেমন ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে অমরপুরের ছাত্ররা দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘট ডেকে ছিল। আগরতলায় ছাত্র ঐক্য সংস্থা নাম দিয়ে একটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছে রজত কান্তি গুপ্ত। সাব্রুম মনু বাজারে জুনিয়র বেসিক স্কুলে ৩৫০জন ছাত্রের জন্য শিক্ষক ছিল মাত্র দুইজন। আরো শিক্ষক এবং সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার দাবীতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। বুধজং স্কুলের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাত দফা দাবীতে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দেয় এবং দাবীগুলোর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ক্লাশ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। দাবীগুলো ছিল ঃ—

১) বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা। ২) পানীয় জলের ব্যবস্থা করা।
৩) বিজ্ঞানাগারে গ্যাসের ব্যবস্থা করা । ৪) বৈদ্যুতিক পাখা ও লাইটের ব্যবস্থা করা।

৫) পায়খানার ব্যবস্থা করা। **৬) সাইকেল শেডের ব্যবস্থা করা।**
৭) সাংস্কৃতিক মঞ্চের ব্যবস্থা করা ।

বিভিন্ন ছাত্র সংস্থা এসব দাবীর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল। কৈলাসহর, ধর্মনগর, বিলোনীয়া, খোয়াই সব বিভাগেই ছাত্ররা স্থানীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজনীতি মুক্ত ছাত্র আন্দোলন গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই সাফল্য পাওয়া গেছে ।জঙ্গী আন্দোলন ছাত্র সমাজকে নানা শিবিরে বিভক্ত করে দেয় ।

কিন্তু ৭০ এর দশকে ছাত্র আন্দোলন ক্রমশঃ জঙ্গী রূপ ধারণ করতে থাকে। নক্সালরা ছাড়াও ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ব্লক, পি এস ইউ। পৃথক পৃথকভাবে আবার যৌথভাবে বিভিন্ন দাবীতে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলে। এই সময় থেকে ছাত্র আন্দোলন সম্পূর্ণ রূপে রাজনৈতিক দলের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচীকে প্রভাবিত করে। ছাত্র আন্দোলনের রাজনীতিকরণ বিষয়ে বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গী দেশে রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র-যুবক-কৃষক-শ্রমিক-কর্মচারী, ডাক্তার, আইনজীবী সকলেরই জরুরী ভূমিকা ছিল। কারণ স্বাধীনতা ছাড়া সামাজিক - অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। তাই ছাত্ররাও স্কুল, কলেজ ত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার কাজে প্রত্যেকের ভূমিকা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী উঠেছে। দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে অক্ষুন্ন রাখা এবং ছাত্র সমাজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ।

ছাত্র আন্দোলনের প্রধান কাজ হবে শিক্ষার পরিবেশকে উন্নত কবা, সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগকে প্রসারিত করা, শিক্ষার অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করা। শিক্ষক বাণিজ্যিকী করণ ও গৈরিকী করন বন্ধ করা এবং গণতন্ত্রের আদর্শকে সুরক্ষিত করা ।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিক্ষায়তন গুলো শ্রেণী সংগ্রামের আওতা থেকে মুক্ত থাকা উচিত। সব মতের ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধ ও যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার পরিবেশ ও কর্ম সংস্কৃতির উন্নতি ঘটান প্রয়োজন।

শিক্ষায়তনে দলীয় রাজনীতির প্রবেশ শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করেছে। ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকরা বিভিন্ন দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভক্ত হয়ে গেছে। ফলে ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে।

স্কুলে-কলেজে প্রশাসনিক অবহেলার জন্য যদি সময় মত হাজিরা না দিয়ে যখন খুশি আসা-যাওয়া করা যায়, ক্লাশ না করেও মাপ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক কারণে যখন খুশী ক্লাশ বর্জন করার আন্দোলন করা যায়, সিলেবাস শেষ হয় না, সময়মত পরীক্ষা হয় না, যে কোন অজুহাতে স্কুল ছুটি হয়ে যায়। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার বিচার হয় না। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষকের বাড়ীতে গিয়ে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। এসব ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই নানা দোষ ত্রুটি কর্তব্যে অবহেলার কথা শোনা যায়। সময়মত স্কুল চালু না হবার অভিযোগে স্কুলের গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেবার ঘটনাও ঘটেছে।

এসব সমস্যার সমাধান আইন করে হবে না। যৌথ আন্দোলন এক্ষেত্রে জরুরী হয়ে পড়েছে। ছাত্র আন্দোলন এখন আর দলীয় ভিত্তিক না হয়ে যদি যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠে তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা মুক্ত মানবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই শ্রদ্ধা-ভালবাসা-দায়িত্ববোধ-কর্তব্যবোধ ও সুস্থ কর্ম-সংস্কৃতির জন্য যৌথ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

তাছাড়াও ছাত্র সমাজকে কিছুটা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালন করতে হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি জাতির ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংবিধান বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার বিরুদ্ধেও যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবিকতা বিরোধী কোন ঘটনা ঘটলেও যৌথ প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র সমাজের যে গৌরবজনক ভূমিকার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তি ছিল যৌথ আন্দোলন ।

ত্রিপুরায় যুব আন্দোলন

ত্রিপুরায় ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে বিভিন্ন ক্লাব গঠন করে যে সব ছাত্ররা সমাজসেবামূলক কাজকর্ম শুরু করেছিলেন তারাই এই দশকের শেষভাগে ১৯৩৮ সালে স্কুল-কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে পূর্ণ যুবক হিসেবে ত্রিপুরায় গণআন্দোলন সৃষ্টির কর্মযজ্ঞ শুরু করেন।

দুটি মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত দুটি মঞ্চে যুবকেরা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কংগ্রেস ও গান্ধীবাদী আদর্শের অনুগামীরা গঠন করেন ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ এবং বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসীরা গঠন করেন জনমঙ্গল সমিতি। অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় যুব আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগ থেমে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যুবকরাই হয়ে গেলেন রাজনৈতিক নেতা। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর রাজ্য শাখা গঠন প্রক্রিয়ায় যুবকেরাই দিলেন নেতৃত্ব। ক্রমে ক্রমে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের নেতারা জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসে রাজনীতিব মঞ্চে যুক্ত হলেন৭

এই সময় উপজাতি ছাত্ররা জনশিক্ষা সমিতি গঠন কবে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন সৃষ্টি করলেন। তারাই স্কুল-কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে পূর্ণ যুবকের দায়িত্ব নিয়ে গণমুক্তি পরিষদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর রাজ্যের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করেছেন গণমুক্তি পরিষদের যুব নেতারাই।

এম. বি. বি. কলেজ স্থাপনের পর যেসব ছাত্ররা প্রধানত মানবিক কারণে ছাত্র আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের অনেকেই পড়ে যুব আন্দোলনের মাধ্যমে ত্রিপুরার রাজনীতিতে বিভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছেন। শিক্ষিত যুবকদের আগমনে ত্রিপুরার রাজনীতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ফলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শক্তিশালী হয়েছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুব আন্দোলনে কংগ্রেস অনুগামী যুব কংগ্রেস নেতারাই শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছেন। ত্রিপুরায় ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বেকার সমস্যা ছিল না। ছাত্ররা পাশ করা মাত্রই সরকাবী চাকুরী পেয়ে গেছে। ফলে বেকাব যুবকদেব নিয়ে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না। অর্দ্ধ শিক্ষিতদেরও চাকুরীর সুযোগ ছিল। প্রতি মাসেই নতুন নতুন দপ্তর খোলার কাজ চলছিল। কাজেই এই সময় যুব আন্দোলনের জোয়ার ছিল না।

অর্দ্ধ শিক্ষিত উদ্বাস্তু এবং জুমিয়া যুবকেরা পুনর্বাসন আন্দোলন এবং খাদ্য আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। সংগঠন গড়ার কাজে তাদের প্রয়োজনও ছিল। তাই পৃথকভাবে শক্তিশালী যুব সংগঠন গড়ে তোলার তেমন উদ্যোগও ছিল না।

১৯৬৪ সালের পর যে সব উদ্বাস্তুরা এসেছে, তাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত যুবক ছিল। উপজাতিদের মধ্যেও প্রচুর শিক্ষিত যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল। ফলে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের দাবীতে যুব আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথম দিকে সব মতের যুবকেরাই যৌথ যুব আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

কমিউনিষ্ট পার্টি দুই ভাগে বিভক্ত হবার ফলে যুব আন্দোলনে সংকট দেখা দেয়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দুই পার্টির যুবকদের মধ্যে শত্রুতামূলক সম্পর্ক চলতে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষও হয়।

১৯৬৭ সালে সি পি আই এম অনুগামী যুবকরা গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন গঠন করে

পৃথকভাবে যুব আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু যুব আন্দোলনের প্রকৃত জোয়ার সৃষ্টি হয় ৭০ এর দশকে ।

উগ্র বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যুব আন্দোলনে তীব্র মতভেদ এবং সংঘাত-সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। নক্সালপন্থী যুবকেরাও সংঘাত ও সংঘর্ষের রাজনীতিতে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠে। বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দিয়ে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার শ্লোগান ও কার্যক্রম চলতে থাকে ।

এই সময় কংগ্রেস দলেও বিভাজন ঘটে। কংগ্রেস অনুগামী যুবকেরাও নিজেদের মধ্যেই সংঘাত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ঐক্যবদ্ধ যুব আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

ত্রিপুরা রাজ্যের যুবকেরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে রাজনৈতিক বিভ্রান্তির শিকার হয়। যুব আন্দোলন এক রক্তাক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য যুবক হিংসা ও বিদ্বেষের বলি হয়।

নক্সাল যুবকরা সত্তরের দশককে মুক্তির দশক বলে ঘোষণা দেয়। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী ছাত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে নক্সাল আন্দোলনে যুক্ত হয়। ত্রিপুরাতেও এর ঢেউ এসে ছাত্র যুব আন্দোলনে চরম অস্থিরতা এবং সংঘাতের সৃষ্টি করে। বহু স্কুল ঘর এবং বোর্ডিং হাউস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয় চরম উচ্ছৃংখলা। বহু শিক্ষক ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হন। বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় ।

অন্যদিকে ছাত্র যুবকদের মধ্য থেকেই গড়ে উঠে প্রতিরোধ। বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে থাকে। পুলিশ এবং প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব নিতে হয়। সারা রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। জরুরী অবস্থা ঘোষণা পর্যন্ত এই অবস্থা অব্যাহত থাকে।

এই সময় গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে চারটি বামপন্থী যুব সংগঠন যৌথ যুব আন্দোলন গড়ে তুলতে ঐক্যবদ্ধ হয়। এখান থেকে শুরু হয় নতুন যুগের সূচনা।

২০ শে জুন ১৯৭২ তারিখে ৭ দফা দাবীতে বিধানসভা অভিযান হয়। দাবীগুলো ছিল
১) বেকারদের জন্য চাকুরী অথবা ভাতা দিতে হবে।
২) রেজেষ্ট্রিকৃত তালিকার ভিত্তিতে চাকুরী দিতে হবে।
৩) সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪) রাজ্যে শিল্প কারখানা স্থাপন করতে হবে।

৫) পূর্ণ রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৬) দ্রব্য মূল্য রোধ করতে হবে।
৭) পুলিশী সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

সমস্ত মহকুমা দপ্তরে এবং বিডিও অফিসে এই দাবী সনদের ভিত্তিতে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। এই দাবীগুলো নিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করা যেত। এসব দাবীর কোনটিতেই কারো আপত্তি ছিল না। রাজনৈতিক সংকীর্ণতাই ছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রধান বাধা।

যুবকদের মধ্য থেকেই রাজনৈতিক নেতা ও দক্ষ প্রশাসক সৃষ্টি হয়। গণতান্ত্রিক যুব আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী। রাজনৈতিক সংকীর্ণতা এই সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। গণতান্ত্রিক চেতনা, দেশপ্রেম, মানবিক দায়িত্ববোধের পরিবর্তে যুব মনে সৃষ্টি হচ্ছে পারস্পরিক বিদ্বেষ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং অগণতান্ত্রিক এবং অমানবিক চিন্তাধারা। যার ফলে বন্ধুই বন্ধুকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না।

ত্রিপুরায় সত্তরের দশকে বামপন্থী যুব আন্দোলনের পাশাপাশি যুব কংগ্রেসের মধ্যেও তীব্র প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়। বিভিন্ন মহকুমায় এবং গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কংগ্রেস অনুগামী যুবকেরা নিজস্ব উদ্যোগে যুব কংগ্রেস গঠন করে এবং স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে।

কমলপুর বিভাগীয় যুব কংগ্রেস ২৮ শে মে ১৯৭২ তারিখে স্থানীয় কৃষকদের প্রয়োজনীয় সার, বীজ, ঋণ ও কীটনাশক সরবরাহের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। যুব কংগ্রেস সভাপতি গৌরাঙ্গ দেব, এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এসব দাবীতে বামপন্থীরাও যদি যুক্ত থাকে তবে যুব আন্দোলন প্রকৃত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, কৈলাসহর, ধর্মনগর, উদয়পুর ও বিলোনীয়ায় স্থানীয় উদ্যোগে যুব কংগ্রেস গঠন করে স্থানীয় সমস্যা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব তখন নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। উত্তর জেলার যুব কংগ্রেস সভাপতি নন্দলাল সিংহ এই সময় বাজারগুলোর উন্নয়নের দাবীতে যুব আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। উপমন্ত্রী শৈলেশ সোম এসব দাবীর সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু যুব কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত থাকায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

১৯৭২ সালে আসামের ভাষা দাঙ্গায় আসামের যুবকেরা সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। তার প্রতিক্রিয়ায় ত্রিপুরাতেও যুবকদের মনে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিন্তু ত্রিপুরায় উপজাতি যুবকেরা আসাম আন্দোলনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়।

১৯৭৩ সালে সারা ভারতে ইন্দিরা বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। জয় প্রকাশ নারায়ণ সারা দেশের ইন্দিরা বিরোধী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি মঞ্চে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

সোশ্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে চরম দক্ষিণপন্থী স্বতন্ত্র দল এবং সাম্প্রদায়িক দল জনসংঘ একই মঞ্চে মিলিত হয়। উগ্র বামপন্থীরাও ইন্দিরা হঠাও দেশ বাঁচাও স্লোগানের ভিত্তিতে এই আন্দোলনে সামিল হয়ে যায়। ফলে ভারতের যুব আন্দোলন জঙ্গীরূপ ধারণ করে।

ত্রিপুরায় বামপন্থী যুব সংগঠনগুলো এই সময় রাজ্য জুড়ে জঙ্গী যুব আন্দোলন গড়ে তোলে। কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের কঠোর দমনমূলক ব্যবস্থা যুব সমাজকে চরম উত্তেজনার মুখে ঠেলে দেয়।

জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলো দেশের যুব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে ইন্দিরা গান্ধীর বলিষ্ঠ ভূমিকায় সারা বিশ্বে ভারতের মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জনপ্রিয়তাও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে ছিল।

পাকিস্থানের দুই পাশে থেকে চীন এবং আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কড়া কড়া হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দিরা গান্ধী নিজের সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় পাক-ভারত যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ঘটনা আর কিছু নেই।

ভারতীয় জনগণের মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী দেবী রূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ কারণেই দেশী বিদেশী প্রতিক্রিয়ার শক্তি এবং সাম্রাজ্যবাদীরা যে কোন উপায়ে ইন্দিরা গান্ধীকে হঠাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

জয়প্রকাশের সার্বিক বিপ্লবের ডাকে ছাত্র-যুবকেরা বিভ্রান্ত হয়েছিল। শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী হেরে গেলেন। ইন্দিরা গান্ধী হটে গেলেন বটে কিন্তু দেশ বাঁচাবার পথ হয়নি। ভারতীয় গণতন্ত্র এবং অর্থনীতি চরম এক অস্থিরতা এবং অরাজকতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করে।

কংগ্রেস দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং বাইরে অরাজকতা দেখে ইন্দিরাজী বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। সংকট মোকাবেলার জন্য চরম ব্যবস্থা হিসেবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে প্রথম বড় ভুল করলেন। কারণ ইন্দিরাজী একাই সংকটের মোকাবিলা করার মত শক্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মোকাবিলা করতে পারতেন। তাহলে জনপ্রিয়তা আরো বাড়তো। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতারা তখন ভুল

পরামর্শ দিয়েছিল। রাজনৈতিক মিত্রদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হয়নি ।

বিশ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে ইন্দিরাজী বুঝাতে চেয়েছিলেন যে জনকল্যাণের লক্ষ্যেই তিনি সাময়িকভাবে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। বিশ দফা কর্মসূচী নিয়ে যুব কংগ্রেসকে যদি আন্দোলনে সক্রিয় করা যেত তাহলে কংগ্রেস দলের গণভিত্তি অনেক বেশী শক্তিশালী হতো। কিন্তু কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীরা বিশ দফা কর্মসূচী কার্যকর করতে আগ্রহী ছিল না। কারণ বিশ দফার প্রথম কয়েকটি দফা কার্যকর করলেও কংগ্রেসের জোতদার নেতাদের গায়ে অঘাত পড়তো। যুব কংগ্রেস সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো, যদি সে রকম প্রেরণা সৃষ্টি করা যেত। সি পি আই সে রকম চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে পরামর্শ না শুনে ইন্দিরা গান্ধী দ্বিতীয় ভুল করেছিলেন ।

দেশে বিদেশে জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হওয়ায় ইন্দিরাজী তাড়াহুড়া করে জরুরী অবস্থার অবসান ঘটিয়ে নির্বাচন ঘোষণা করে দিয়ে তৃতীয় ভুলটি করলেন। উচিত ছিল জরুরী অবস্থার পর্যালোচনা করে জনসংযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে দলীয় সংহতি এবং সাংগঠনিক দুর্বলতা দুর করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। কংগ্রেস দলের সংকট মোকাবিলার জন্য যুব কংগ্রেসই ছিল একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংগঠন। রাজীব গান্ধী পরবর্তী সময়ে তা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু যুব সংগঠনকে গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কংগ্রেসের কোন কর্মসূচীই ছিল না। যার ফলে নিষ্ঠাবান কর্মীদল সৃষ্টি হয়নি।

বর্তমানে ভারতের রাজনীতিতে কোয়ালিশনের যুগ শুরু হয়েছে। কিন্তু এখনো পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। সি পি আই দল চল্লিশ বছর আগে থেকেই বলেছে ভারতের জটিল রাজনীতি ও অর্থনীতির মোকাবেলা করা একা কংগ্রেস বা সমস্ত বামপন্থীদের জোটের পক্ষেও সম্ভব নয়। বাম এবং গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে যৌথ গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং কর্মসূচী কার্যকর করার জন্য যৌথ নেতৃত্বের সরকার গঠন করতে হবে।

গণআন্দোলনের মধ্য থেকেই সৎ, নিষ্ঠাবান, দেশপ্রেমিক নেতাদের আবির্ভাব ঘটে। সব রাজনৈতিক দলেই এ ধরনের নেতার অভাব দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রেস দলেও হাজার হাজার সৎ-নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক নেতাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা দেশের এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী ছিল। এসব নেতারা সবাই এসেছিল যুবকদের মধ্য থেকেই। বামপন্থী আন্দোলনেও এসেছিল শত শত যুব নেতা যারা দেশ ও জাতির জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে বিশেষ করে সত্তরের দশকের পর থেকে সেরা যুবকেরা সব রকম রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ ষাটের দশকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির

মধ্যে বিদ্বেষমূলক বিভাজন প্রক্রিয়া দেশের রাজনৈতিক দলের নীতি ও আদর্শের প্রতি আস্থা নষ্ট করে দিয়েছে এবং নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে গেছে।

ভারতে দশ কোটিরও বেশী শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী থাকা সত্ত্বেও সব দলেই উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য যুব নেতার অভাব দেখা দিয়েছে। বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সুস্থ ও যৌথ যুব আন্দোলনই শুধু এই শূন্যতা পূরণ করতে পারবে। হিংসা-বিদ্বেষ-সংঘাত ও সংঘর্ষের সংকীর্ণ রাজনীতি ভারতে কোন পরিবর্তন আনতে পারবেনা।

ক্ষমতার গর্বে এতকাল যারা কোয়ালিশনের রাজনীতিকে উপেক্ষা করেছেন তারাও আজ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন যে ভারতে কোয়ালিশন সরকার গড়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। বিচিত্র মতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের মধ্যেই ভারতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যুব আন্দোলনকে সে পথ ধরেই চলতে হবে । সংঘাতের পরিবর্তে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। সব দলের যুব সমাজকেই । সমাজ সেবার আদর্শই যুবকদের মধ্যে কর্ম প্রেরণা সৃষ্টি করে ।

ত্রিপুরায় নারী আন্দোলন

ত্রিপরায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের প্রভাবে ত্রিশের দশকে ছাত্র-যুবকরা যেভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের দীক্ষা গ্রহণ করেছে, তেমনিভাবেই একদল ছাত্রী ও যুবতী বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। ত্রিপুরায় মহিলারা মাতৃসংঘ গঠন করেছিল। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠলেও মূল প্রেরণা ছিল দুটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর বিভিন্ন নেতার প্রভাব। বীনা দত্ত ও পানু দত্ত দুই বোন রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল এই সময়। অন্যান্য মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কারণ তখন সব কাজই চলতো গোপনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপজাতি ছাত্রদের উদ্যোগে জনশিক্ষা সমিতির কাজকর্ম শুরু হবার ফলে উপজাতি মহিলাদের মধ্যেও নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে খোয়াই পদ্মবিলে তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে যে সব মহিলারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা সংগঠিত কোন মহিলা সমিতির সদস্য ছিল না। মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে ক্ষিপ্ত সিপাহীরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে তিনজন উপজাতি মহিলাকে হত্যা করেছিল। কুমারী-মধুতি-রূপশ্রী দেববর্মার হত্যাকাড সারা রাজ্যে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। এই ঘটনার পরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শত শত উপজাতি মহিলা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে এগিযে আসে। শুরু হয় সংগঠিতভাবে মহিলাদের গণসংগ্রামে অংশগ্রহণের ইতিহাস।

ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর দলে দলে উদ্বাস্তু আগমনের ফলে শহরের মধ্যবিত্ত মহিলাদের

মধ্যে সমাজ সেবার আগ্রহ দেখা দেয়। অল্পসংখ্যক মহিলা উদ্বাস্তু শিবিরে শিশুদের মধ্যে দুধ বিলি করার কাজে অংশ নেন। কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগেই মহিলারা এ কাজ শুরু করেন। কমিউনিষ্ট পার্টি তখনো বেআইনী ছিল। অন্যান্য দলের শক্তি ছিল অতি নগণ্য।

১৯৫১ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। পার্টির নেতারা প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগঠন তৈরী করতে উদ্যোগী হন। আগরতলা শহরে সি পি আই সংগঠন ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ১০/১২ জন নিষ্ক্রিয় সদস্য শহরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বীরেন দত্ত বেশীর ভাগ সময় জেলে কাটিয়েছেন। গণমুক্তি পরিষদের নেতা ও কর্মীরা এক যোগে সি পি আই দলে যোগ দেবার পর পাহাড় অঞ্চলে সি পি আই এর শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপিত হয়।

কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত গণমুক্তি পরিষদই পার্টি এবং গণসংগঠন এই দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করেছে। শহরে পার্টির নামে সংগঠন গড়ে তুলে কংগ্রেসের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। তাই বিভিন্ন দলের গণতান্ত্রিক নেতা ও কর্মীদের নিয়ে গণতান্ত্রিক সংঘ গড়তে হয়েছিল।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে একদিকে মহিলা কংগ্রেস এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক নারী সংঘ ত্রিপুরায় নারী আন্দোলনের শক্তিশালী দুই ধাবা সৃষ্টি করে, যা আজও অব্যাহত আছে। বিভিন্ন সময়ে আন্দোলনের নীতি ও নেতৃত্বেব বদল হয়েছে। কিন্তু সংগঠনের ধারা আজো দুটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলছে।

অথচ ত্রিপুবায় নারী সমস্যা সমাধানে সব মতের মহিলা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুযোগ ও সম্ভাবনা আগেও ছিল এখনো আছে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ত্রিপুরায় মহিলা সংঘের প্রধান দাবী ছিল ঃ —

১) অবিলম্বে চীপ কমিশনারেব শাসনের অবসান চাই।

২) গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা চাই। এই দাবীর সঙ্গে কংগ্রেসের কোন বিরোধ ছিল না। তারাও একই দাবী করেছে।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে সদর উত্তর সিমনায় দারোগামুড়ায় এক নারী সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সারা রাজ্যে তখন সংগঠন ছিল না। সদর, খোয়াই এবং কমলপুর এই তিনটি মহকুমা থেকে প্রধানত উপজাতি মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে এই প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা থেকে কয়েকজন বাঙ্গালী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। এখানে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য গণতান্ত্রিক নারী সমিতির জন্ম হয়।

১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে গণতান্ত্রিক নারী সমিতি বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে নির্বাচনী

প্রচারেও বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক নারী সমিতির প্রথম সম্পাদিকা কিরণ প্রভা দেববর্মা কল্যাণপুর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও বাঙ্গালী উদ্বাস্তু মহিলাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কোন সংগঠন গড়ে তোলা যায়নি।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সারা রাজ্যে শুধুমাত্র উপজাতি মহিলাদের মধ্যেই গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সংগঠন সীমাবদ্ধ ছিল। শহরাঞ্চলে এবং উদ্বাস্তু কলোণীগুলোতে মহিলা কংগ্রেসের সংগঠনগুলো সক্রিয় ছিল। কিন্তু মহিলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোন গণআন্দোলন গড়ে উঠেনি তাদের সক্রিয়তা প্রধানত সেবামূলক কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

রাজ্যের সর্বত্র গণআন্দোলন এবং বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত হয়েছে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির উদ্যোগে ও নেতৃত্বে। এসব আন্দোলনে ও বিক্ষোভ মিছিলে উপজাতি মহিলারা বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাঙ্গালী মহিলাদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য।

১৯৬৭-৬৮ সালে পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে, ফরেষ্ট অফিসারদের জুলুমের বিরুদ্ধে, এবং জোর করে লেভী আদায়ের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির নেতৃত্বে বড় বড় বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল।

খাদ্য সংকট তীব্র হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য সরবরাহ অনিয়মিত হওয়ায় রাজ্য সরকার সব কৃষকের ঘর থেকে জোর করে ধান, চাউল সংগ্রহ করতে শুরু করে। গরীব কৃষকেরা বছরের খাদ্য এবং জমির বীজ হিসেবে যে ধান ঘরে মজুত করেছে তা দিতে অস্বীকার করায় জোর জুলুম শুরু হয়। গণতান্ত্রিক নারী সমিতি এস্বব জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গরীব উদ্বাস্তু মহিলারা দলে দলে বনাঞ্চলে প্রবেশ করে জ্বালানী কাঠ, বাঁশ ও ছন সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। ফরেষ্ট গার্ডরা এসব নিঃস্ব উদ্বাস্তু মহিলাদের আটক করে ফরেষ্ট মাশুল আদায়ের জন্য নির্যাতন চালাতো। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির আন্দোলনের ফলে এরূপ জুলুম বন্ধ হয় এবং মাশুল আদায় ব্যবস্থা রদ করা হয়।

১৯৭৩ সালে সারা রাজ্যে তীব্র খরা এবং দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ফলে সর্বত্র রেশনে খাদ্য সরবরাহের দাবীতে সর্বত্র গণসংগঠনগুলো পৃথক পৃথকভাবে তীব্র গণআন্দোলনে সামিল হয়। ছাত্র-যুব-কৃষক-শ্রমিক কর্মচারীরাও খাদ্য আন্দোলরে সমর্থনে বড় বড় মিছিল মিটিং শুরু করে।

মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত বৃটিশ কায়দায় দমননীতি চালিয়ে সব রকম গণআন্দোলন

ধ্বংস করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ গণআন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ফলে উদ্বাস্তু কলোণীগুলোতে বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলারা সুখময় বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে থাকে।

গণতান্ত্রিক নারী সমিতি এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোণীতেই গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ফলে রাজ্যের নারী আন্দোলনে প্রচন্ড জোয়ার সৃষ্টি হয়। এই সময়ে নারী আন্দোলনের প্রধান দাবীগুলো ছিল ঃ--

১) খয়রাতি সাহায্য এবং টেস্ট রিলিফের কাজ চাই।
২) দরিদ্র তাঁতীদের জন্য বিনা মূল্যে সূতা চাই।
৩) রেশনের মাধ্যমে নায্য মূল্যে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় ডাল, তেল, লবণ, সাবান, কাপড় ইত্যাদি চাই।
৪) সমান কাজে সমান মজুরী চাই।
৫) মহিলাদের জন্য কাজ চাই।
৬) নারী নির্যাতন বন্ধ কর।
৭) সস্তা দামে সূতা চাই।

এই সাত দফা দাবীতে প্রতিটি মহকুমা দপ্তরে, ব্লক অফিসে এবং তহশীল অফিসে গণঅবস্থান সহ ১৭ই অক্টোবর থেকে ২৩ শে অক্টোবর ১৯৭৪ পর্যন্ত দাবী সপ্তাহ পালন করা হয। ত্রিপুরায় খুব সম্ভবতঃএটাই ছিল সাবা রাজ্য জুড়ে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির সবচেয়ে বড় ও জঙ্গী আন্দোলন।

রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসন গণআন্দোলন দমনে ব্যর্থ হওয়ায় ভাড়াটে গুন্ডা এবং সমাজ বিরোধীদের গণআন্দোলন দমনেব কাজে নিযুক্ত করা হয়। ফলে রাজ্যেব আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

এর প্রতিবাদে ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে আগরতলা শহরে গণতান্ত্রিক নারী সমিতির ডাকে এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। এতে উপজাতি মহিলাদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যায় বাঙ্গালী শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। শুরু হয় নারী আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। এরপর থেকে চারটি বামপন্থী দলের মহিলা সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করতে থাকে।

অন্যদিকে কংগ্রেস দল আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছিন্ন ভিন্ন হতে থাকে। মহিলা কংগ্রেস ও নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কংগ্রেস অনুগামীদের মধ্যে তীব্র হতাশা সঞ্চারিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীই প্রথম নারী আন্দোলনের জরুরী প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

একটা দেশের অর্দ্ধেক মানুষ যদি কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে নিমজ্জিত থাকে তবে সে দেশের জনজাগরণ আসতে পারে না। নারী জাগরণের মাধ্যমেই প্রতিটি গৃহে সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়। দেশের সমাজ সংস্কারক মনীষীরা অনেক আগেই নারী শিক্ষার দাবীতে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষা প্রসার, বিধবা বিবাহের প্রচলন, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা ইত্যাদি দাবীতে বাংলায় যে সমাজ বিপ্লব শুরু করেছিলেন তা কবিতা-সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আন্দোলনের ধারাকে গতিশীল করেছিলেন এবং যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাধারায় সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

গান্ধীজী নারী জাগরণকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গান্ধীজী ঘোষণা করেন – "নারী জাতিকে সামন্তযুগীয় কুসংস্কারের অন্ধকারে বন্দী করে রাখা চলতে পারে না। সচ্ছল সংসারের রুচিসম্মত গৃহসজ্জা রূপেও রাখা চলে না। আমি যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতাম, তবে পুরুষের ক্রীড়নক হয়ে থাকার বিরুদ্ধে নিশ্চয় বিদ্রোহ করতাম"।

অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে, এবং ভারতছাড় আন্দোলনে গান্ধীজীর ডাকে হাজার হাজার মহিলা পুরুষের পাশে পাশে বিশাল বিশাল মিছিলে ও মিটিংয়ে সামিল হয়েছেন। শত শত মহিলা কারাবরণ করেছেন। হাজার হাজার মহিলা পুলিশের লাঠি গুলি ও টিয়ার গ্যাসের মুখে চরম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণায় মুক্তি সংগ্রামের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকারের শপথ গ্রহণ করেছেন। সব শ্রেণীর সব স্তরের মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে টেনে আনার কৃতিত্ব ও গৌরব একমাত্র গান্ধীজীই দাবী করতে পারেন। নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবী এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

রুশ বিপ্লবের সময় লেনিনও বলেছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে জনগণকে পুরোপুরি নিয়ে আসা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নারী সমাজ এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকে। রুশ বিপ্লবই পৃথিবীতে প্রথম নারী ও পুরুষের বৈষম্য চিরতরে বাতিল করার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, এবং নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাষ্ট্রসংঘ এই আদর্শকে বিশ্বের সব দেশের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছে।

স্বাধীনতার পর ভারতেও নারী-পুরুষের সমান অধিকার আইন পাস হয়েছে। কিন্তু আইন পাস করলেই তা কার্যকর হয় না। অধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণআন্দোলনই অধিকার অর্জনের একমাত্র পথ।

১৯৬১ সালে ভারতে পণপ্রথা নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু চল্লিশ বছর পরও এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটার পরিবর্তে সারা দেশে ব্যাপক ও ভয়াবহ রূপ নিয়ে পণ প্রথার বৃদ্ধি ঘটে চলেছে।

শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বিলাসের লোভ ভয়ংকর রূপে দেখা দিচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিকারের ব্যবস্থা জরুরী হয়ে উঠেছে। পণ নেব না পণ দেব না স্লোগান দিয়ে মিছিল করলে কোন ফল পাওয়া যাবে না। প্রয়োজন হল সর্বদলীয় মহিলা সংগঠন ও সর্বদলীয় যুব সংগঠন গড়ে লোভী পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করা, সামাজিক বয়কট করা এবং শাস্তির ব্যবস্থা করা।

দশ হাজার বছর আগে কৃষি সভ্যতার পত্তন করেছে নারী। কৃষি কর্মই মানুষকে বর্বর জীবন থেকে মুক্ত করে সভ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শিশু পালনের দায়িত্ব নিয়ে মেয়েরা আশ্রয় নিত পর্বত গুহায়। পুরুষেরা দল বেঁধে বেরিয়ে যেত শিকার করতে। সে যুগে শিকার করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। পৃথিবীর স্থল ভাগ ছিল গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। চারদিকে ঘুরে বেড়াতো অজস্র হিংস্র জন্তু। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা এবং নিরীহ কোন প্রাণী শিকার করে আনা সহজ ছিল না। শিকারের যন্ত্রপাতি বলতে কয়েক টুকরা পাথরের তৈরী অস্ত্র। অনেক সময় খালি হাতেই ফিরতে হতো শিকারীদের।

ক্ষুধার্ত শিশুর জন্য বিকল্প খাদ্য খুঁজতে হতো মেয়েদের। তারাই এক সময় আবিষ্কার করলো যে ফলের বীজ থেকে গাছ সৃষ্টি হয়। শুরু হল কৃষি কাজ। কৃষি ও শিকার দু'য়ে মিলে গড়ে উঠল নতুন জীবন।

এই সময় সমাজে মেয়েদের প্রাধান্য সৃষ্টি হয়। মেয়েরা বহু বিবাহের অধিকার পায়। অর্থাৎ একই নারী বহু পুরষকে বিবাহ করতে পারতো। ফলে মায়ের পরিচয়েই শিশুর পরিচয় হতো।

তারপর এক সময় এলাকা দখল নিয়ে শুরু হয় বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘাত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। তখন শুরু হয় পুরুষের আধিপত্য। পুরুষ বহু বিবাহের অধিকার পায়। নারীর জন্য স্থির করা হয় একটি মাত্র স্বামী। শিশুর পরিচয় হয় পিতার পরিচয়ে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে পুরুষের আধিপত্য।

নারী শুধু আধিপত্যই হারায়নি, হারিয়েছে তার স্বাধীনতা, তার অধিকার। সইতে হয়েছে বহু নির্যাতন-লাঞ্ছনা ও অপমান।

আজকের সমাজেও নারী নির্যাতন চলছে নানা রূপে, নানা অজুহাতে। সাম্প্রতিককালে ত্রিপুরায় নারী নির্যাতন, বধু হত্যা, ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্যা কোন একটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সব শ্রেণীর, সব স্তরের নারীর জীবনেই নেমে আসছে নির্মম নির্যাতন ও মৃত্যু। আইন-আদালত-পুলিশ প্রশাসন রক্ষা করতে পারছে না অসহায় নারীকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে নারীর শত্রু হচ্ছে নারী। শ্বাশুরী-ননদ-বড়জা-মেঝ জা

মিলে পণের দাবীতে নববধুকে নির্যাতন করছে। পেটে সন্তান সহ পুড়িয়ে হত্যা করছে বধুকে। শ্বশুর, ভাসুর দেবর এবং স্বামী ষড়যন্ত্র করে হত্যা করছে ঘরের বধুকে। বধু হত্যার পাশাপাশি বেড়ে চলেছে শিশু ও কিশোরী ধর্ষণের এবং ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা। এমন জঘন্য অপরাধেরও শাস্তির ঘটনা খুবই নগণ্য। সাক্ষীর অভাব, পুলিশ ও প্রশাসনের উদাসীনতা, রাজনৈতিক নেতাদের গোপন মদতের ফলে সুবিচার পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। এসব সমস্যা দূর করার জন্য সব নারী সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রশাসন ও মহিলা কমিশনকে সমস্যার মোকাবিলায় সহযোগিতা করতে হবে। এটাই হবে এই সময়ের জরুরী কাজ।

ত্রিপুরায় ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে বিভিন্ন থানায় যে সব নারী নির্যাতন ও বধু হত্যার ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা রীতিমত ভয়াবহ। ২০০৩ সালের মে মাসে বিধানসভায় পেশ করা তথ্য অনুযায়ী নিম্নরূপ চিত্র পাওয়া গেছে। বিভিন্ন কারণে থানায় নথিভুক্ত হয় না এমন ঘটনাও কম নয়।

৫ বছরে নারীঘটিত নথিভুক্ত অপরাধ ঃ-

নারী ধর্ষণের ঘটনা - ৪৮৯
বধু হত্যার ঘটনা - ২০২
শ্লীলতাহানির ঘটনা - ৪১৫
মহিলা নির্যাতনের ঘটনা - ১৩৩০

নারী ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা বেশী নথিভুক্ত হয়েছে রাধা কিশোরপুর থানায় এবং বধু হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা বেশী নথিভুক্ত হয়েছে আগরতলা পূর্ব ও পশ্চিম থানায়।

ধর্ষণের ঘটনা --- রাধা কিশোরপুর ৫৫টি, কৈলাসহর ৩৬টি পূর্ব আগরতলা ৩১টি, বিলোনীয়া ২৮টি, সোনামুড়া ২৩টি, ধর্মনগর ২০টি, আমতলী ১২টি, বিশালগড় ও কমলপুরে ১৪টি করে, বাইখোড়া, মনুবাজার, পেচারথল, পানিসাগরে ১৫টি করে, চুড়াইবাড়ীতে ১৯টি।

বধু হত্যার ঘটনা --- আগরতলা পূর্ব থানায় ৩৭টি, পশ্চিম থানায় ৩৫টি, আমতলীতে ২৩টি, সোনামুড়ায় ১৭টি, সিধাই থানায় ১১টি, বিলোনীয়াতে ২১টি, শান্তিরবাজারে ১০টি, সাব্রুমে ২০টি, পি আর বাড়ীতে ১৮টি।

বধু নির্যাতনের ঘটনা --- রাধা কিশোরপুর ৫৫টি, আগরতলা পূর্ব থানায় ৪৭টি, পশ্চিম থানায় ৪৫টি, আমতলীতে ২৬টি, সোনামুড়ায় ২৫টি, বিলোনীয়ায় ৩৬টি, বাইখোড়ায় ২৬টি, পি আর বাড়ীতে ২০টি, কৈলাসহরে ৪২টি, ধর্মনগরে ৩২টি চুড়াই বাড়ীতে ৩০টি, কুমারঘাটে ১৯টি, পানিসাগরে ১২টি, মনুতে ১৩টি, সিধাইতে ১৬টি, কমলপুর ও এয়ারপোর্টে ১০টি করে।

এছাড়াও মহিলা নির্যাতনের অনেক ঘটনা বিভিন্ন থানায় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পরবর্তী এক বছরের একটি রিপোর্টে জানা গেছে ২০০৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১৫৫টি ধর্ষণের মামলার মধ্যে মাত্র ১৬টি মামলায় অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। বাকী মামলায় বিভিন্ন কারণে অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি। এই এক বছরে বিভিন্ন আদালতে খরপোষের মামলা হয়েছে-৪৫২টি। এসব ঘটনা মহিলা আন্দোলনের সামনে, অতি জরুরী বিষয়। বধু হত্যা

একদিনে ঘটে না। তিলে তিলে নির্যাতনেব পর হত্যা করা হয়। এসব অপরাধী পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে আন্দোলন শুরু করা সম্ভব। ত্রিপুরা মহিলা আন্দোলন এখনো আবেদন নিবেদন ও প্রচার সর্বস্ব স্তবে সীমাবদ্ধ বয়েছে ।অপরাধী পবিবার গুলোকে চিহ্নিত করে জঙ্গী আন্দোলনের চাপে ফেলে প্রতিকারের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন ।

সাহানা সেনগুপ্ত — ভুবনেশ্বরী দেববর্মা — ছায়া বল

পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য — বিভা নাথ — লক্ষ্মী নাগ

মীরা মজুমদার — মহুয়া রায — কৃষ্ণা রক্ষিত

ত্রিপুরায় নারী আন্দোলনের বর্তমান নেতৃত্ব

ত্রিপুরায় শিক্ষা আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ত্রিপুরায় উপজাতি ছাত্রদের উদ্যোগে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন এক অভিনব জনজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। একটি ঘুমন্ত জনগোষ্ঠীকে জাগিয়ে দেবার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যেই এই জনশিক্ষা আন্দোলন থেমে গিয়েছিল। ফলে উপজাতি জনগোষ্ঠীর বড় ক্ষতি হয়েছিল। জনশিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।

অরাজনৈতিক জনশিক্ষা সমিতির গায়ে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসন রাজনৈতিক লেবেল এঁটে দিয়ে নেতাদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর দমননীতি চালাবার ফলে ইতিহাসের গতি নতুন মোড় নিতে বাধ্য হয়।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ত্রিপুরা রাজ্য কমিউনিষ্ট আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। অবশ্য এর ফলে শেষ পর্যন্ত জনগণই উপকৃত হয়েছেন। রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং মানবিক অধিকারবোধ দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে।

শক্তিশালী গণআন্দোলনের চাপে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যেই জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনার দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-যোগাযোগ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

জনশিক্ষা সমিতি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কিন্তু জনজীবনে নবজাগরণের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তার গতিশীলতা রক্ষা করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে নেতারা ব্যর্থ হয়েছে।

ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর জনশিক্ষা সমিতির পুনর্গঠন করে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করা যেত। তাহলে কয়েক হাজার উপজাতি যুবক শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করে নতুন জীবনের সন্ধান করে নিতে পারতো। এই ধারা অব্যাহত থাকলে হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থী সমস্যার সৃষ্টি হতো না। জনশিক্ষা সমিতিই হয়ে যেত শিক্ষিত উপজাতি যুবকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একমাত্র মঞ্চ। এই মঞ্চ অরাজনৈতিক ঐতিহ্য রক্ষা করে চলতে পারলে উপজাতি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে রাজ্যের প্রচলিত ভাষা-সংস্কৃতি ও শিক্ষা আন্দোলনে মিলনের এক সেতু তৈরী হয়ে যেত।

বংশী ঠাকুর এবং প্রভাত রায়ের মত প্রগতিশীল উপজাতি নেতারা এরকম স্বপ্নই দেখেছিলেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। একটা শক্তিশালী প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। ত্রিপুরায় জনমঙ্গল সমিতি, প্রজামন্ডল এবং গণতান্ত্রিক সংঘ এই তিনটি সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বংশী ঠাকুর এবং প্রভাত রায়। বীরেন দত্ত আড়ালে থেকে প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন।

তৎকালীন পরিস্থিতির উপযোগী কর্মসূচী এবং কর্ম কৌশল নির্মাণের কৃতিত্বও বীরেন দত্তের।

কিন্তু তিনটা সংগঠনের অধিকাংশ নেতাই তখনকার কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না। ফলে ১৯৫২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে লড়াই শুরু করার পর ঐসব গণ সংগঠনের নেতারা ক্রমশঃ দূরে সরে যান। কমিউনিষ্ট পার্টির নীতির পরিবর্তন ঘটলেও মতাদর্শগত সংকীর্ণতা তখনো ছিল।

১৯৪৮ সালে মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জনশিক্ষা সমিতির অবলুপ্তি ঘটে। ঠিক এই সময়েই ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সমস্যা তীব্র আকার ধারন করে।

সরকারী উদ্যোগে সকলের জন্য শিক্ষার আয়োজন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আগরতলায় উমাকান্ত স্কুল এবং তুলসীবতিই ছিল একমাত্র অবলম্বন।

স্থানীয় শিক্ষানুরাগীরা স্বতঃস্ফূর্তভাগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেসরকারীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এগিয়ে আসেন। উদ্বাস্তু শিবিরগুলোতে বহু শিক্ষক তখন নিঃস্ব অবস্থায় বেকার বসেছিলেন। সব দল মতের নেতা ও কর্মীরা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে।

এই সময় কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। নেতারা ছিলেন জেলখানায়। শহরে পার্টি ছিল খুবই দুর্বল। প্রকাশ্যে কাজ করার মত শক্তি ও সংগঠন তখনও ছিল না। তাই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার আন্দোলনে কোন কমিউনিষ্ট নেতাকে দেখা যায়নি।

কংগ্রেস দলের তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত, সুখময় সেনগুপ্ত, গোপাল চক্রবর্তী, জীতেন চক্রবর্তী, মোহিত লাল বানার্জী, ফর ওয়ার্ড ব্লকের ডাঃ রাজেন দে, কামিনী কুমার দত্ত, আশুতোষ সিংহ, হরিদাস সেন, দ্বীজেন দে, কুমার কর্ণকিশোর দেববর্মা, অমূল্য চৌধুরী, এছাড়া বিশিষ্ট সমাজসেবী শান্তি পাল, পন্ডিত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা, অশ্বিনী আঢ্য, মেজর হেমচন্দ্র দত্ত, যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, অধ্যক্ষ অনিল ভট্টাচার্য, প্রভাত রায় প্রমুখ শিক্ষানুরাগীরা দুই বছরের মধ্যেই আগরতলা শহরের উপর নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, প্রগতি বিদ্যাভবন, প্রাচ্যভারতী, মহাত্মাগান্ধী মেমোরিয়াল, বড়দোয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়, বানীবিদ্যাপীঠ এবং শহরতলীতে ঈশান চন্দ্রনগর, রানীরবাজার বিদ্যামন্দির ইত্যাদি বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত করেন।

মহকুমাগুলোতেও বেসরকারী উদ্যোগে বহু বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ, জোলাইবাড়ী হাইস্কুল, উদয়পুরে-রমেশ হাইস্কুল, ধর্মনগরে-ডি এন বিদ্যামন্দির, কৈলাসহরে-রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খোয়াইতে-শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন, কমলপুরে-মানিকভান্ডার হাইস্কুল, ফটিকরায় হাইস্কুল ইত্যাদি স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই আন্দোলনে কোন রকম রাজনৈতিক মতভেদ ছিল না। ক্রমে ক্রমে আগরতলায় রামঠাকুর পাঠশালা, সখীচরণ হাইস্কুল, শঙ্করাচার্য হাইস্কুল, স্বামী দয়ালানন্দ হাইস্কুল এবং শহরতলীতে কাতলামারা হাইস্কুল, ঈশান চন্দ্রনগর পরগনা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সারা রাজ্যে বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশটি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাদান করছে। কয়েকটি বিদ্যালয় সরকার অধিগ্রহণ করেছে। কোন বেসরকারী বিদ্যালয় বাণিজ্য কেন্দ্রে

পরিণত হয়নি। বরং শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। পূর্ববাংলার বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষকেরা সেবার মনোভাব নিয়ে এসব বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন ।

জনশিক্ষা সমিতির পরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার আন্দোলনও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিচালিত হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক কোন সংগঠন গড়ে উঠেনি। স্থানীয় শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগেই এসব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে বিদ্যালয় পরিচালনা এবং আর্থিক সংকট মোচনের দাবীতে রাজ্যভিত্তিক শিক্ষক সমিতির গড়ে উঠেছে।

কমিউনিষ্টরা সব রকম বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিরোধী ছিল। সব কিছুই হতে হবে রাষ্ট্রের অধীনে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই রাজ্যের কোথাও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ কমিউনিষ্টরা নেয়নি। খুব সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই জনশিক্ষা সমিতির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টাও হয়নি। ফলে সব কিছু সরকারকেই করতে হবে এই মানসিকতা রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলনে সঞ্চারিত হয়েছে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ এখনো অব্যাহত আছে। তবে গতি এবং উদ্দেশ্য সর্বত্র এক নয়। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এরূপ প্রচেষ্টা প্রতিহত করা দরকার। জনস্বার্থেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধানে দশ বছরের মধ্যেই সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু ৫৫ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতার অভাব অনেক কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ।

কিন্তু সারা ভারতে এই দাবীতে বামপন্থীরাও বড় কোন আন্দোলন গড়ে তোলেনি। কেরালায় যেভাবে সমস্যার মোকাবেলা করা হয়েছে, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে তাও করা হয়নি। বামপন্থীরা দুই যুগ ধরে সরকারী ক্ষমতায় থেকেও কেন এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়নি তার ব্যাখ্যা জনগণকে জানানোর দাবী উঠেছে।

বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাখাতে যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ করেছে বলে দাবী করে। কিন্তু বরাদ্দ অর্থের বিপুল অংশই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবত খরচ করা হচ্ছে । এই অংকটাই আড়াল করা হয়।

বেতন ভাতা বৃদ্ধি করেই শিক্ষার উন্নতি ঘটানো যাবে না। জনগণের সঙ্গে বিশাল আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি করেও শিক্ষার উন্নয়ন বা প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সকলের কাছে পৌঁছে দিতে না পারার জন্য অর্থের অভাব বলে অজুহাত দেখানোর অর্থ জনগণকে বোকা বানানো। এতকাল শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে জীবন মান উন্নয়নের আন্দোলন করা হয়েছে। এখন শিক্ষার মান ও কর্মসংস্কৃতির উন্নতির জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ।

আসলে প্রয়োজন একটি বড় ধরনের শক্তিশালী শিক্ষা আন্দোলন। যাতে সর্বদলীয় ছাত্র-যুবক-শিক্ষক-কর্মচারীদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব হল প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সকলের জন্য নিশ্চিত করা, প্রি-প্রাইমারী শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করা। এ দুটি কাজ সরকারী উদ্যোগেই করতে হবে। পঞ্চায়েতগুলোকে এ কাজে জরুরী ভিত্তিতে দায়িত্ব দিতে হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েতে একই বিদ্যালয়ে সকালে প্রি প্রাইমারী এবং

দুপুরে প্রাইমারী ক্লাশ চালানো সম্ভব।

এছাড়া বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে বেসরকারী উদ্যোগকে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করতে হবে। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলকায় শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে হবে। স্থানীয় শিক্ষিত বেকারদের উপযুক্ত ব্যাংক ঋণ দিয়ে প্রশিক্ষণকেন্দ্র খোলার জন্য উৎসাহ দিতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণে কিছুটা বাণিজ্যের সুযোগ দিতে হবে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এড়ানো যাবে না। যুগের উপযোগী কারিগরী শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী উদ্যোগ প্রয়োজন ।

ত্রিপুরায় সমস্ত গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ চলছে। তাই বিদ্যুৎকেন্দ্রিক নানা ধরনের শিক্ষা প্রসারের জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত বহু বেকারের কর্ম সংস্থানের দরজা খুলে দেওয়া সম্ভব। এ কাজে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগকে সমানভাবেই উৎসাহিত করা দরকার।

শিক্ষা মানুষের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটায়। সমাজের ভাল মন্দ বিচার করতে শেখায়। যুক্তিবাদী মনের সাহায্যে চিন্তা ও কল্পনা শক্তি অর্জনে সাহায্য করে। তিন বছর বয়স থেকে মানব শিশু এই শক্তি অর্জনের উপযুক্ত হয়ে উঠে। প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবে এ দেশে বিপুল পরিমাণ মানব শক্তির অবক্ষয় ঘটে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনকি শিক্ষার আয়োজন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর তুলনায় যথেষ্ট উন্নত। একমাত্র প্রভেদ হল শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি পুঁজিবাদী সমাজে নেই।

ভারতে আরো দীর্ঘকাল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চলবে। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই বামপন্থী শাসিত রাজ্যে কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাতে দুই ব্যবস্থার পার্থক্য মানুষ বুঝতে পারে। ভূমি সংস্কার, পঞ্চায়েত, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এগুলি হল প্রধান ক্ষেত্র যেখানে দুই দৃষ্টিভঙ্গীর শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট এবং দৃষ্টান্তমূলক পার্থক্য সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায়। তার মধ্য দিয়েই ভারতের অন্যান্য রাজ্যের জনগণের মধ্যে নতুন চিন্তা সঞ্চারিত করা সম্ভব।

ত্রিপুরায় সাড়ে সাত হাজার গ্রামের প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার মধ্যে সকালে প্রি-প্রাইমারী এবং দুপুরে প্রাইমারী ক্লাশ চালাবার ব্যবস্থা করে সারা ভারতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এ ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারী অর্থের প্রয়োজন হবে না। গ্রামেরই দু'জন যুবক-যুবতীকে স্থির

বেতনে এসব কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব। জুমিয়া-ভূমিহীন এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে যে সব পরিবার আছে তাদের মধ্য থেকে এসব পদে নিযুক্তিতে অগ্রাধিকার দিলে কেউ আপত্তি করবে না। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের এ কাজে উদ্দীপিত করা সম্ভব।

শিক্ষার জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং উদ্যোগের দৃষ্টান্ত ত্রিপুরাতেও প্রচুর দেখা গেছে। জনশিক্ষা সমিতির ডাকে গ্রামবাসীরা যৌথ উদ্যোগে স্কুল ঘর নির্মাণ করেছে। অনেকে স্বেচ্ছায় জমি দান করেছে। মহারাজা বিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে শিক্ষকের বেতন দেবার দায়িত্বটুকুই বহন করেছেন।

উদ্বাস্তু আগমনের পর শিক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরা উদ্যোগ নিয়েছেন। অনেকে জমিদান করেছেন। অনেকে বিনা বেতনে শিক্ষকতা করেছেন। সুখময় সেনগুপ্ত, তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত, প্রভাত রায় বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রথমদিকে অনেক শিক্ষকই বিনা বেতনে কাজ করেছেন। উদ্বাস্তু ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য ফিস আদায় করে অভাবী শিক্ষকরা ভাগ করে নিয়েছেন। ১৯৫১ সালের পর ত্রাণ এবং পুনর্বাসন দপ্তরই ছিল একমাত্র ভরসা।

ত্রিপুরায় বেসরকারী বিদ্যালয়কে সাহায্য দেবার মত কোন দপ্তর ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে আজ পর্যন্তও রাজ্যের অধিকাংশ বিদ্যালয় বেসরকারী পরিচালনায় সরকারী অনুদানে চলে। ত্রিপুরাতেও সে রকমভাবেই গ্র্যান্ট-ইন-এইড দপ্তর স্থাপন করা হয়, বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোকে সাহায্য করার প্রয়োজনে। অবশ্য এর জন্য শিক্ষকদের আন্দোলন করতে হয়েছে বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ।

বেসরকারী শিক্ষকরা দীর্ঘকাল অনিয়মিত সাহায্যকে নিয়মিত করা এবং সরকারী হারে বেতন দেওয়া ও গণতান্ত্রিক পরিচালনা কমিটি গঠন করার জন্যে আন্দোলন চালিয়েছেন বর্তমানে শতকরা একশ ভাগ সাহায্য পাচ্ছে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। বেসরকারী শিক্ষক আন্দোলনের নেতা শিক্ষামন্ত্রী হবার ফলে দাবী দাওয়া আদায় সহজ হয়েছে ।

বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল না। তাই রাজ্যব্যাপী কোন সংগঠনও গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা ছিল। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের উদ্যোগী হতে হয়েছে। ফলে বেসরকারী শিক্ষক সমিতি রাজ্যব্যাপী সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠেছে। শিক্ষক এবং শিক্ষা আন্দোলনে এই সমিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

শক্তিশালী হয়েছে ।

ত্রিপুরায় সত্তরের দশকে এই সমস্যাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কর্মচারীনেতা অজয় বিশ্বাস । তিনিই প্রথম প্রতিটি দপ্তরে দপ্তরে পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে সর্বস্তরের কর্মীদের দাবী দাওয়া ও সমস্যা পর্যালোচনা করে দাবী সনদ তৈরী করে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে ব্যপক গণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন । তারই ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার ।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর গ্রামীন গরীব মানুষের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পঞ্চায়েত মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে । তারপর থেকেই গ্রামীন অসংগঠিত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার কাজে সিটু নেতারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে । বর্তমানে অধিকাংশ অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ সিটু অনমোদিত পেশা ভিত্তিক ইউনিয়নে সংগঠিত হয়েছে

অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হল বছরের অধিকাংশ সময় কাজ থাকেনা। ত্রিপুরায় বর্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলে এই রাজ্যে সমস্যা আরো তীব্র হয় । পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যেই এটা হল প্রধান সমস্য । ফলে অসংগঠিত শ্রমিকদের অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে । বছরের অধিকাংশ সময় সপরিবারে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটায় । বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার উপায়ও বর্তমানে নেই ।

সারা ভারতেই বিভিন্ন কারণে অসংগঠিত শ্রমিকরা সারা বছর কাজ পায়না । প্রান্তিক চাষীরাও বছরের একটা সময় দিন মজুরে পরিনত হয় ।

বামপন্থীরাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সারা দেশ ব্যাপী গণ আন্দোলন সংগঠিত করেছে । আঞ্চলিক দলগুলিও এই সমস্যা সমাধানের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে । ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জনকল্যাণমূলক কিছু প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে ।

১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী গরীবি হঠাও শ্লোগান দিয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন । কিন্তু বিরোধীরা ইন্দিরা হঠাও দেশ বাঁচাও শ্লোগান দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলায় বিব্রত প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জনকল্যানমুখী ২০দফা কর্মসূচী ঘোষনা করেন। দেশের গরীব মানুষের স্বর্থে এটাই ছিল প্রথম কর্মসূচী।

রাজীব গান্ধীর সময় পঞ্চায়েত আইন গঠন করে সারা দেশে গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয় । কিন্তু রাজীব গান্ধীর অকালে মৃত্যু ঘটিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রামীণ উন্নয়নের পথ বন্ধ করে দেয় ।

নরসীমা রাওয়ের সময় উদারনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাবে অসংগঠিত শ্রমিকদের জীবনে চরম সংকট সৃষ্টি হয় । ফলে সারা দেশে তীব্র গণ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

গণ আন্দোলনের চাপেই পরবর্তী সব সরকারই অসংগঠিত শ্রমিকদের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প সারা দেশে চালু করতে বাধ্য হয় ।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল -

১) বছরে ১০০ দিন কাজ নিশ্চিত করা ।

২) স্বাস্থ্যবক্ষায ব্যবস্থা কবা

৩) দক্ষতা বৃদ্ধিব জন্য বিভিন্ন পেশায উন্নত প্রশিক্ষন দেওযা

৪) বযস্ক পেনশন যোজনা

৫) বিধবা পেনশান, যোজনা

৬) মহিলাদেব গর্ভকালীন সুযোগ সুবিদা দেওয়া ইত্যাদি ।

প্রকল্প ঘোষিত হলেই তা কার্যকব হযনা । প্রবল গণ আন্দোলনেব জোযাব সৃষ্টি কবেই প্রকল্প রূপাযনে সবকাবকে বাধ্য করতে হয । বামপন্থীবাই সাবা দেশে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী ভিত্তি বদলে যাচ্ছে ।

নবম অধ্যায়

ত্রিপুরায় কৃষক আন্দোলন

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় জুম চাষীরাই ছিল প্রধান । সমতল চাষীরা ছিল সংখ্যায় নগন্য । রাজ্যে কোন জমিদার ছিলনা । কাজেই কৃষি ক্ষেত্রে শ্রেণী সংঘাতও ছিলনা । তালুকদার দের জমি চাষ করার মত লোকই পাওয়া যেতনা । পতিত জমির নগন্য খাজনা দিতে না পারার জন্য বহু তালুক নীলামে বিক্রী হয়ে যেত । মহকুমা অফিসে যারা কাজ করতো তারা এসব নীলামী সম্পত্তি কিনে নিত । অনেক সময় জমির মালিক জানতেই পারতোনা যে তার জমি বকেয়া খাজনার দায়ে নীলামে বিক্রী হয়ে গেছে ।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর উদ্বাস্তু কৃষকেরা পুনর্বাসন লাভ করে পতিত জমি উদ্ধার করে সমতল চাষীতে পরি নত হতে ৫০ এর দশক কেটে গেছে । কাজেই ষাটের দশকের আগে ত্রিপুরায় কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেনি ।

১৯৫৮ সালে হঠাৎ করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ করে দেবার ফলে উদ্বাস্তু কৃষকদের জন্য সরকারী খাস্ জমি দখল করার একটা আন্দোলন কমিউনিষ্ট পার্টি শুরু করেছিল । বেশ কিছু খাস জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল । এই আন্দোলনের নেতাদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । কিন্তু খাস জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৬০ সালে ত্রিপুরায় প্রথম ভুমি সংস্কার আইন প্রয়োগ করা হয় । ত্রিপুরায় বিধানসভা না থাকায় ত্রিপুরা ভুমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন- ১৯৬০ পার্লামেন্টে পাস করতে হয় । এই আইনে উপজাতিদের জমি অউপজাতিদের কাছে বিক্রী করা নিষিদ্ধ হয়। বিশেষক্ষেত্রে সরকারী অনুমতি নিয়ে বিক্রী করার সংস্থান রাখা হয় ।

এই আইন পাস কর‍াার পরও সারা রাজ্যে উদ্বাস্তুদের কাছে দুঃস্থ উপজাতিরা নানা কারনে জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয় । অনেক সময় জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার জন্যও জমি হস্তান্তর হয়েছে ।

ফলে এসব বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার জন্য আন্দোলন শুরু হয় । এই আন্দোলন শুরু করে সিপি আই । পরে পার্টি ভাগ হবার পর দুই কমিউনিষ্ট পার্টিই কোথাও যৌথভাবে কোথাও পৃথকভাবে এই আন্দোলন করতে থাকে ।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হবার পর তাদের চার দফা দাবীর মধ্যে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার দাবীটি প্রধান দাবী হয়ে উঠে । দুই কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণ মুক্তি পরিষদও এই দাবীতে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় ।

কিন্তু যুবসমিতি দাবী করে এই আন্দোলনে শুধু উপজাতিরাই অংশ গ্রহন করতে পারবে । তাদের এই দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী বাতিল হয় । প্রত্যেক দল পৃথকভাবে আন্দোলন শুরু করে ।

উপজাতিদের জমি কোন উদ্বাস্তুই জোর করে দখল করেনি । আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে

মূল্য ধার্য্য করে লেনদেন করেছে। কিন্তু আইনগত ভাবে দলিল রেজেষ্ট্রী করা সম্ভব হয়নি।

আসল সমস্যা দেখা দিয়েছে উপজাতিরা জমি হস্তান্তর করে নতুনভাবে খাস জমি সংগ্রহ করতে না পারায়। জমির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠার ফলে উপজাতি কৃষকরা দারুণ সংকটে পড়ে যায়।

এরাজ্যে উপজাতিরা কখনো জমির অভাব উপলব্ধি করেনি। এক জমি ছেড়ে অন্য জমিতে জুমচাষ করার অভ্যাস দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে। কোথাও কোন বাধা ছিলনা।

উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পরিস্থিতির অমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, এটা উপলব্ধি করা উপজাতি চাষীদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। কারন এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা।

১৯৬০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বেআইনী জমি ফেরৎ দেবার আন্দোলন সারা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নানা রকম বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়। দরিদ্র উদ্বাস্তু কৃষকরা আবার জমি-হারিয়ে ভূমিহীন হবার ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধনী বিল পাস করেন। এই আইনের ফলে ১৯৬০ সালের আইন অনুযায়ী বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার সুযোগ সংকুচিত করা হয়। ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। বেআইনী হস্তারের কাজ ১৯৬০ এর পরিবর্তে ১৯৬৯ এর পর থেকে শুরু করার নীতি ঘোষণা করা হয়। অথচ বেশীর ভাগ বেআইনী হস্তান্তর ঘটেছে ১৯৬৯ সালের আগে। এভাবে সংশোধনীর মাধ্যমে বেআইনী জমি হস্তান্তরের দাবীকে সংকোচিত করা হয়।

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় আবার ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করা হয়। এবারের লক্ষ্য হলো উপজাতিদের সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি দখল করা।

ত্রিপুরায় উপজাতি সমাজের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জমি পরিবারের প্রধান কর্তার নামে থাকে। পিতা অথবা পিতার অবর্তমানে বড়ভাইয়ের নামে পরিবারের সব জমি থাকে। পরিবার ক্রমাগত ভাগ হবার পরও জমির দলিল সাধারণত ভাগ করা হয় না। সরকারী দপ্তরের হয়রানীর ভয়ে গ্রামের সর্দারের মধ্যস্থতায় ভাগ বাটোয়ারা হয়।

সিলিং আইন পাশ করার ফলে উপজাতিরা পরিবারের জমি ভাগ বাটোয়ারা করে দলিল রেজিষ্ট্রী করে নেয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত আইন পাস হবার পরবর্তি রেজিষ্ট্রি হওয়া দলিল মানতে রাজী না হয়ে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে সিলিং আইন কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহন করেন।

লোকসভায় দশরথ দেব অত্যন্ত জোরালো ভাবে মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের উপজাতি স্বার্থ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বক্তব্য

. াখেন এবং বহু উপজাতি পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের বক্তব্যকে সকলের পক্ষে গ্র ণ যোগ্য করে তুলেন। ফলে সিলিং আইন স্থগিত রাখা হয় এবং পরবর্তী নির্বাচনে জনতা সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিলিং আইন সংশোধন করেন।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করে এবং গরীব উদ্বাস্তু কৃষকদের বিকল্প জমি বা নগদ ক্ষতিপূরণ দিয়ে

সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

বর্তমানে সমস্ত সমতল চাষীদের সমস্যাই একরকম । কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা, উন্নত জাতের বীজ সার ও জল সেচের ব্যবস্থা করা , প্রয়োজনের সময় ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা কাঁচামাল সংরক্ষনের জন্য কোল্ড স্টোর স্থাপন করা । বাঙ্গালী এবং উপজাতি কৃষকদের একই সমস্যা সমাধানে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে । গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষকদের সমস্য সমাধানের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্মে বিভিন্ন এলাকায় অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে । নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে । কিছু কিছু এলাকায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । এসবের দ্বারা প্রমাণ হয় সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও গণ আন্দোলন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হয়না ।

ত্রিপুরায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটি কবে কৃষক সংগঠন রয়েছে । কিন্তু বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য একমাত্র বামপন্থী দলগুলোই আন্তরিকভাবে গণ আন্দোলন গংগঠিত করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রান পরিচালনা করে চলেছে ।

কংগ্রেস **অনুগামী-কৃষক কংগ্রেস** কখন কার স্বার্থে আন্দোলন করেছে তার কোন তথ্য ত্রিপুরার কোন পত্রিকায় খুঁজে পাওয়া যায়না ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজী কৃষক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন । কারণ তখনকার কৃষক আন্দোলন ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে । গান্ধীজীর মতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষক এবং জমিদার উভয়েরই সমর্থন পাওয়া দরকার । কিন্তু কংগ্রেসদলের বাম পন্থী নেতারা গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করেই কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বাম পন্থী কংগ্রেস নেতারা শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কৃষক আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেন । এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন রাজ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয় ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রতিটি রাজ্যেই কংগ্রেস সরকার গুলো কৃষক স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস দলের মূল নেতৃত্বে ছিল জমিদার, তালুকদার, ধনী কৃষক এবং মহাজন শ্রেনী । এরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছিল বৃটিশের পক্ষে, স্বাধীনতার পরে রাতারাতি কংগ্রেস ভক্ত হয়ে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস নেতা বণে গেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে জমিদার শ্রেনী ছিলনা । এখানে উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রাক্তন জমিদার, তালুকদার , জোতদার এবং মহাজনরা ছিল । তারা কংগ্রেস দলের সংগঠন তৈরী করে খুব সহজেই কংগ্রেস নেতা বনে গেছেন । উদ্বাস্তু কৃষকেরা বাঁচার তাগিদে তাদের অনুগামী হয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনে বাঙ্গালী কৃষকদের মোহমুক্তি ঘটেছে । ১৯৭০ সালে সারা ভারতে সিপিআই অনুগামী সারা ভারত কৃষক সভা ভূমিহীন কৃষকদের জন্য উদ্বৃত্ত জমি, বেআইনী হস্তান্তরিত জমি এবং সরকারী খাস জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার আন্দোলন শুরু করে । ত্রিপুরায় উদয়পুর বিলোনীয়া এবং সাব্রুম অঞ্চলে এই আন্দোলনের

নেতৃত্ব দেন জুনু দাস, মোহন চৌধুরী, সুনীল দাস এবং শ্যামল চৌধুরী । বেশ কিছু খাস পতিত জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং আইনগত দখলি পাট্টা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় । কৈলাশহর ও কমলপুরে জমি দখলের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন - রাখাল রাজ কুমার,, মনোরঞ্জন বসাক, বিজয় সরকার এবং রাসবিহারী ঘোষ ।

কৃষকদের মধ্যেও নানা স্তর রয়েছে । ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, ভূমিহীন ক্ষেত মজুর । প্রত্যেক স্তরের স্বার্থ গত পার্থক্য আছে ।

সব কৃষকই চেষ্টা করে ক্ষেত মজুরদের যাতে কম মজুরী দিয়ে খাটাতে পারে এবং ফসলের দাম যাতে বেশী পেতে পারে ।

এই দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষেত মজুরের স্বার্থে আঘাত পড়ে । ক্ষেত মজুররা ন্যায্য মজুরী পায় না , আবার ফসলের দাম বেশী হলে কিনে নিতে পারেনা । এজন্যই ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা সংগঠন গড়তে হয়েছে । তাদের জন্যই প্রয়োজন নিম্নতম মজুরী এবং ফসলের ন্যায্যদাম ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের মূল্য যাতে বৃদ্ধি না ঘটে এবং ন্যায্য মূল্যে যাতে সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং কৃষি সরঞ্জাম পাওয়া যায় তার জন্য কৃষকদের আন্দোলন করতে হয় ।

সারা ভারতের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তা প্রধানত ধনী ও মাঝারী কৃষকেরাই ভোগ করে । যেমন জল সেচের জন্য পাম্প মেশিন পেতে হলে দামের একটা অংশ কৃষককে বহন করতে হয় । গরীব কৃষকেরা এই সুযোগ নিতে পারেনা । ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষতি হয় ।

এই সমস্যা দূর করার জন্য কৃষি সমবায় গঠন করার আন্দোলন করতে হয়েছে। ত্রিপুরায় আন্দোলনকারী নেতারাই সরকারে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ত্রিপুরার গরীব কৃষকরা এইসব সুযোগ ভোগ করতে পারছে । অথচ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গরীব কৃষকেরা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে । অনাহারে ও মৃত্যু বরণ করছে । ত্রিপুরায় এমন ঘটনা ঘটেনি ।

অর্থকরী ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে কৃষকরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ত্রিপুরায় পাট চাষীরা ও রাবার চাষীরা এই সংকটে ভুগছে । বিভিন্ন সময় ফসলের দাম উঠানামা করার ফলে প্রান্তিক চাষীরা আত্মরক্ষার জন্য জমি বন্ধক দিয়ে বা বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয় । গ্রামাঞ্চলে এই সংকটের সুযোগ নিয়ে ধনী ও মাঝারী কৃষকেরাও মহাজনী ব্যবসা করছে ।

বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো —

১) প্রান্তিক ও গরীব কৃষকরা যাতে জমি বিক্রী বা বন্ধক দিতে বাধ্য না হয় সে জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা । প্রত্যেক কৃষকের জন্য কিষান কার্ড ব্যবস্থা করা ।

২) ধনী কৃষক বা গ্রামীন মহজনরা যাতে খাদ্য শস্য মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে সে দিকে নজর দেওয়া ।

৩) অভাবের সময় কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারে তার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য করা ।

৪) কৃষকরা যাতে কোন কারনেই জমি থেকে উচ্ছেদ না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া ।

৫) মহাজনরা যাতে অভাবী কৃষকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক হারে সুদ আদায় করতে না পারে এবং ঋণের দায়ে কৃষকের জমি কেড়ে নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে ।

৬) কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্যে সার-বীজ-বিদ্যুৎ-কীটনাশক ঔষধ ও জলসেচের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

৭) কৃষকদের বাস্তু জমি ও আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । যাদের বাস্তু জমি আছে তাদের বাসগৃহ নির্মান বা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৮) কৃষকের ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) বৃদ্ধ কৃষকদের পেনসনের সুযোগ করে দিতে হবে ।

১০) সামাজিক সর্বপ্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ।

১১) কৃষিপণ্য বিক্রীর জন্য সব বাজারে শেড নির্মানের ব্যবস্থা কবা ।

১২) কৃষকদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি করা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

ত্রিপুরার কৃষকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেব প্রভাবিত বিভিন্ন সংগঠনে সদস্য ভুক্ত হয়ে আছে । সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সংগঠন হল সিপিএম অনুমোদিত সারা ভারত কৃষক সভা । বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্পাদক - নারায়ন কর- সহ সম্পাদক- নারায়ন দেবনাথ - সভাপতি- নিরঞ্জন দেববর্মা- সহসভাপতি- পবিত্র কর - সুবোধ দাশ, চিত্ত চন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

অবিভক্ত সিপিআই দলও সারা ভারত কৃষক সভা- নামেই কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিল, এখনো এই নামেই সংগঠন কাজ করছে । দুই কমিউনিষ্ট পার্টি সারা দেশে যৌথ কৃষক আন্দোলনের পরিকল্পনা করছে । সি পি আই প্রভাবিত সারা ভারত কৃষক সভায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন - সুনীল দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎ মজুমদার, বিজয় সরকার, মনোরঞ্জন বসাক , রাসবিহারী ঘোষ, তরনী বণিক, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ত্রিপুরায় ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন

সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ক্ষেত মজুরদের পৃথক সংগঠন গড়ে উঠেছে । স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এরকম পৃথক সংগঠন ছিলনা ।

স্বাধীনতার পরে সুদীর্ঘকাল যাবত ভূমি সংস্কার না হওয়ায় প্রতিটি রাজ্যেই ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । গরীব কৃষকেরাও নানা কারনে জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিনত হয় ।

ভূমিহীন কৃষকেরা এক সময় দলে দলে শহরের কলে কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দিত । কিন্তু স্বাধীনতার পরে বহু শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্য বিত্ত পরিবারের যুবকেরা-কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে থাকায় গামীন ভূমিহীন নিরক্ষর কৃষকেরা কারখানায় কাজ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয় । ফলে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রেই ক্ষেত মজুরের কাজে নিযুক্ত হতে থাকে ।

ভারতের কোন রাজ্যেই কৃষিক্ষেত্রে সারাবছর কাজ থাকেনা । বছরের অধিকাংশ সময় বেকার হয়ে ক্ষেত মজুররা অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন কাটাতে বাধ্য হয় । সামান্য অসুখেও অকাল মৃত্যু বরণ করে ।

ত্রিপুরায়ও ক্ষেত মজুরদের অবস্থা একই রকম । আসলে এটা একটা জাতীয় সমস্যা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে । ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব পূর্ণ প্রকল্প সৃষ্টি করতে হয়েছে । ইন্দিরা গান্ধীর বিশদফা কর্মসূচী এই লক্ষ্যে সারা দেশের জন্য প্রথম কর্মসূচী ছিল।

পরবর্তীকালে সব কয়টি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। রাজীব গান্ধীর সময় জানা গেল এসব প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের বিপুল অংশই মধ্যপথে উধাও হয়ে যায় । তাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠন করে গ্রামীন উন্নয়নের সমস্ত প্রকল্প পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত করার উপযোগী আইন তৈরী করা হয় ।

কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে এখনো এসব প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ নানাভাবে নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমান ইউ. পি. এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেছেন গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় তদারকী ব্যবস্থা চালু করা হবে ।

ক্ষেত মজুরদের **প্রধান সমস্যা** হল নিয়মিত কাজ না পাওয়া । **দ্বিতীয় সমস্য** হল নিম্নতম মজুরী না পাওয়া । **তৃতীয় সমস্যা** হল অধিকাংশ ক্ষেতমজুরের বাসগৃহের অভাব **চতুর্থ সমস্য** হল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব । **পঞ্চম সমস্যা** হল অভাবের দিনে সহজ শর্তে ঋন পাওয়া এবং ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের অক্ষমতা ।

ক্ষেতমজুরদের অধিকাংশ হল তপশীলিভূক্ত জাতি- উপজাতি ও পশ্চাৎপদ শ্রেনীর মানুষ । আবার এরাই হল রাজ্য বিধান সভা এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটারদের প্রায় ৬০ শতাংশ । কাজেই কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এদের উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছেনা । সুদীর্ঘ কাল এই সমস্যা উপেক্ষিত হবার ফলে বহু রাজ্যেই জাত-পাতের ভিত্তিতে আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে কোয়ালিশনের যুগ শুরু হবার ফলে আঞ্চলিক দল গুলোর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এতকালের বঞ্চিত মানুষেরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে ।

সারা ভারতে এখনো পর্যন্ত বামপন্থীরাই ক্ষেত মজুর সংগঠনের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করেছে । সারা দেশ ব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করছে ।

ক্ষেত মজুরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত প্রকল্প ঘোষণা করেছে ।

১) প্রতিটি ক্ষেত মজুর পরিবারের একজনকে বছরে ১০০ দিন কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে ।
২) নিম্নতম মজুরী স্থির করা হবে ।
৩) স্ত্রী পুরুষের সমান মজুরী দেওয়া হবে ।
৪) শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ।
৫) আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে ।

স্বাধীন ভারতের ৫৫ বছরের ইতিহাসে শোষিত শ্রেণীর কোন দাবীই গণ আন্দোলন ছাড়া আদায় করা বা কার্যকর করা যায়নি।এই আন্দোলনের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলেছে বামপন্থী দলগুলো। ত্রিপুরায় দুই কমিউনিষ্ট পার্টির একই নামের দুই সংগঠন-ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন -কখনো যৌথভাবে কখনো পৃথকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সি.পি. এম প্রভাবিত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন - সভাপতি চিত্ত চন্দ, সম্পাদক ভানুলাল সাহা।
সি.পি. আই প্রভাবিত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন -- সুনীল দাশগুপ্ত, গৌরমোহন সিং ও অমল সাহা।
বর্তমানে প্রধান দাবী হল বছরে ১০০ দিনের কাজ, সর্বনিম্ন মজুরী, প্রত্যেকের জন্য বি পি এল কার্ড, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় আইন ও আবাসন ব্যবস্থা করা।

গৃহপরিচারিকাদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় গৃহ পরিচারিকাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল পরিবার গুলোতে আংশিক বা সর্বক্ষনের কাজের জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করা হয়।

ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, অফিসার, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক সারা বছরই আংশিক সময়ের জন্য বা সর্বক্ষনের জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করেন।এসব পরিবারে পরিচারিকারা অপরিহার্য অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলিত এবং অবজ্ঞার পাত্র।

বর্তমানে ঝি-চাকর-চাকরাণী ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে কাজের মাসী শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সামাজিক মর্যাদা এখনো স্বীকৃত হয়নি।

যখন খুশী নিযুক্ত করা এবং যখন খুশী ছাঁটাই করা এই স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব এখনো খুবই প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুরী বা বেতনের পরিমাণ সামান্য। একদিন কাজে না এলেই বেতন কাটা যায়। অসুস্থ হলে ও বেতন কাটা যায়, আবার চিকিৎসার খরচও দেওয়া হয়না।

এই সব, অবহেলিত ও অসংগঠিত কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হলেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার পর এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। কিন্তু এই সব অসংগঠিত কর্মীরা নানা জনের পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়। কোন আন্দোলনে যুক্ত হলে সামান্য কাজটাও হারাবার ভয়ে কোন সংগঠনে যোগ দিতে চায়না।

বর্তমানে বামপন্থী সরকার স্থায়ী হওয়ায় এবং বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় পরিচারিকাদের একটা বড়অংশই সাহস করে সংগঠন গড়তে এগিয়ে এসেছে।

সিটু অনুমোদিত দিন মজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে ১১ই অক্টোবর ২০০৪ তারিখে দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে ত্রিপুরায় প্রথম পরিচারিকাদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মহকুমা থেকে কয়েকশত প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগ দেন।

বিস্তারিত আলোচনায় পরিচারিকাদের বহু অজানা দুর্দশার কথা জানা যায়। সামাজিক মর্যাদা হীনতা এবং অবজ্ঞা সর্বত্র বিরাজমান।

পরিচারিকা ছাড়া যাদের একদিনও চলেনা তারা একথা মনে রাখে না যে পরিচারিকারাও

মানুষ । এদেরও ঘর সংসার আছে । ছেলে-মেয়ে-স্বামী আছে । তাদেরও অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য সমস্যা আছে । কথায় কথায় ছাঁটাই করার হুমকি দিয়ে এদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয় ।

ত্রিপুরায় পরিচারিকাদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হবে । তারমধ্যে অনেকে আংশিক ভাবে পাঁচ ছয়টি বাড়ীতে পর পর বাসন ধোয়া, ঘর ঝাট দেওয়া ও মোছা, কাপড় চোপড় ধোলাই করা ইত্যাদি কাজ করতে হয় । সারাদিন কাজ করেও সংসারের অভাব দূর করা যায়না । প্রতিদিনই বিভিন্ন বাড়ীতে গিন্নিদের মুখ ঝামটা সইতে হয় । দশ মিনিট দেরী হলেও কৈফিয়ত দিতে হয় । মোট- কথা পরিচারিকাদের প্রতি ব্যবহার অনেকটা ক্রীত দাসের মত ।

সারাভারতে পরিচারিকাদের সংখ্যা কয়েক কোটি । কোন রাজনৈতিক দল এদের সংগঠিত করার কথা ভাবেনি । কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারও এদের কথা ভাবেনা । অথচ এরাও এদেশের নাগরিক । এদেরও সামাজিক মর্যাদা এবং বাঁচার অধিকার আছে । এদের জন্যও কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োজন ।

আইন পাস করলেই অধিকার অর্জন করা যায়না । স্বাধীন ভারতে বিগত ৫৫ বছরের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে । পরিচারিকাদের সংগঠন আগামী দিনে লড়াইয়ের ময়দানে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে আশা করা যায় ।

আপাততঃ চার দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারক লিপি পেশ করা হবে । যেসব বাড়ীতে পরিচারিকারা কাজ করেন সেসব বাড়ীতে লিখিত ভাবে দাবী পত্র প্রেরণ করা হবে । তাছাড়া প্রতিটি পঞ্চায়েতে - নগরপঞ্চায়েতে ও রাজধানীর পুর কাউন্সিলে বিশেষ দাবীপত্র পেশ করা হবে । নিম্নতম মজুরী নির্ধারনের জন্য শ্রমদপ্তরকে চাপ দেওয়া হবে ।

প্রধান ৪ টি দাবী হল ঃ-

১) বর্তমান মজুরী ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে ।
২) সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে ।
৩) অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ।
৪) বছরে একবার পূজা বোনাস দিতে হবে ।

বিশেষ দাবীগুলো হল ঃ-

১) প্রত্যেক পরিচারিকাকে পরিচয় পত্র দিতে হবে ।
২) উৎসবের সময় কাপড় দিতে হবে ।
৩) গৃহহীনদের আবাস গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে ।
৪) প্রত্যেককে বি পি এল কার্ড দিতে হবে ।
৫) কাজের উপর ভিত্তি করে মজুরী বা বেতন নির্ধারনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পিযুষ নাগ, চিত্ত চন্দ, এবং শংকর দত্ত ।
সি পি আই দলেরও একটি ছোট সংগঠন কাজ করছে ।

গৃহ পবিচাবীকাদেব সম্মেলন

চিত্ত চন্দ সরোজ চন্দ শ্যামল চৌধুবী সুনীল দাস

মনোরঞ্জন বসাক বিজয় সরকার রঞ্জিত মজুমদার তরনী বণিক

দশম অধ্যায়

ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ঐতিহাসিক কারনে ত্রিপুরায় অধিকাংশ জনগোষ্ঠী উপজাতি স্তর অতিক্রম করে জাতি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করতে পারেনি ।

রক্তের সম্পর্কে তৈরী হয় উপজাতি গোষ্ঠী । প্রত্যেক গোষ্ঠীর নানা শাখা প্রশাখা মূলত একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় ।

একই ভৌগলিক সীমানায় স্থায়ীভাবে, বসবাসকারী একই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত,একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গড়ে উঠা সামাজিক জীবনধারা, এবং একই ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মিলনে গড়ে উঠে একটি জাতি ।

জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হল লিখিত ভাষা,-সাহিত্য এবং সমবেত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ।

রাজন্যযুগের ত্রিপুরায় লিখিত ভাষার অভাবে জাতি গঠন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটেনি। ১৯৪৯ সালে ভারতভুক্তির পরও ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস শাসনকালে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী গুলোর জন্য লিখিত ভাষার সৃষ্টি করে মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য লিখিত ভাষার সৃষ্টি করে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের কাজটি শাসক গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছে ।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরই প্রথম উপজাতিদের মাতৃভাষায শিক্ষাদানের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে । বাংলা হরপে ককবরক ভাষার পাঠ্যপুস্তক তৈরী করে ব্যাপকভাবে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

কিন্তু লিপি বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় ককবরক ভাষায় শি ক্ষার গতি বার বার বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে । বাংলা হরফ এবং রোমান হরফের সমর্থকবা প্রায় সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দশরথ দেব বাংলা হরফে ককবরক ভাষা চালু করার পক্ষে অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য সহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষন করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থিত করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন । বাংলা ভাষার মাধ্যমে যারা শিক্ষিত হয়েছেন তারা খুব সহজেই দশরথ দেবের যুক্তির দ্বারা প্রবাভিত হয়েছেন ।

অন্যদিকে ইংরেজী মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীতে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন তারা রোমান হরফের পক্ষে নানা যুক্তি দেখাচ্ছেন । বিখ্যাত ভাষাবিদরাও ত্রিপুরার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বাংলা হরফকেই ককবরক ভাষার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মতামত দিয়েছেন ।

সি পি আই দলের উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে ত্রিপুরায় ককবরক ভাষার লিপি নির্মান কাজ শুরু হয় । বিখ্যাত ভাষাবিদ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ও শ্যাম সুন্দর ভট্টাচার্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে টেপকরা মৌখিক ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে এবং রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বাংলা হরফে ককবরক ভাষার লিপি নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন । কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ৪০ বছর ধরে ককবরক ভাষার চর্চা

করছেন। এখনো তিনি বাংলা হরফের পক্ষেই মত প্রকাশ করছেন।

এই বিতর্কের মীমাংসা না হওয়ায় ককবরক ভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য কমিশন গঠন নিয়েও বিরোধ সৃষ্ট হয়েছে। ভাষা কমিশন গঠনে উপজাতি নেতা ও বুদ্ধি জীবীদের মতামত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

এসব সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রিয়াং সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষার পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী করছে। কাজেই ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতি গঠন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক পথে বিকশিত হতে পারছেনা।

জাতি গঠন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় প্রধান শর্ত হল -রাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ। প্রজাতান্ত্রিক ভারতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নীরব এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসই শর্ত পূরণ হয়েছে।

জাতিগঠন প্রক্রিয়ার তৃতীয় শর্ত হল-আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিভিন্ন আধুনিক পেশার বিকাশ ও সমৃদ্ধি।

জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় কৃষি সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি। কংগ্রেস শাসকরা এ বিষয়ে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেননি। অথচ ভারতের সংবিধানে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও হয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের আন্তরিকতার অভাবে এ কাজে সাফল্য লাভ করা যায় নি।

প্রতিবেশী আসাম রাজ্যেও একই ঘটনা ঘটেছে। যার ফলে আসাম রাজ্য থেকে উপজাতি অধ্যুষিত চারটি জেলা পৃথক হয়ে চারটি পূর্ণ রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গেই মৌলিক সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় -এভাবে অগ্রসর হলে আগামী দশ বছর পর ত্রিপুরায় জুমিয়া বা জুমচাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন সম্প্রদায় থাকবেনা।

জাতিগঠন পক্রিয়ার অতিগুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল-আধুনিক নানা পেশায় অভ্যস্ত বিভিন্ন শ্রেনীর সৃষ্টি।

বামফ্রন্ট সরকার এ বিষয়েও অত্যন্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিটি মহকুমায় বিভিন্ন পেশায় শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি ভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

জাতিগঠন পক্রিয়ার আরেকটি মূল্যবান শর্ত হল, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিলন। বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রশংশনীয় অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেস্ব ঐতিহ্য রক্ষা করেই শিল্প সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে উপজাতি সংস্কৃতি বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্থান পাচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিই সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভারতের বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারায় আরেকটি নতুন ধারার সৃষ্টি হচ্ছে। যেমনটি

হয়েছে মনিপুরী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ।

হজাগিরি নৃত্য, জুমনৃত্য, গড়িয়া নৃত্য, লেবাংনৃত্য ইত্যাদি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে । এগুলো এখন আর শুধু উপজাতি নৃত্য নয় । এগুলো এখন ত্রিপুরার সংস্কৃতি এবং ত্রিপুরাবাসীর গর্ব বলেই গণ্য হচ্ছে । শিল্পীরা ও শুধু উপজাতি নয় । বহু বাঙ্গালী যুবক-যুবতী এসব নৃত্যকলা শিখে ত্রিপুবার সাংস্কৃতিক দলে যোগ দিচ্ছে ।

জাতি বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হল জাতীয়তাবাদ । একটা জাতির প্রতিটি অংশই যাতে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায় তার চাহিদা থেকেই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সূত্রপাত হয় । এই সংগ্রামের প্রধান সৈনিক হল কৃষক সমাজ । সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এই চাহিদা পূরণ করতে পারেনা বলেই সামাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়তাবাদী চাহিদা পূরণ করতে হয় ।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে ।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পব জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং দেশীয় রাজাদের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে ।

ত্রিপুরায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে।

১৯৩৮ সালে মহারাজা বীর বিক্রম প্রশাসনিক সংস্কারের ঘোষণা দেন । একটি সংবিধান তৈরী করে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি আইনসভা গঠনের পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয় । এছাড়া গ্রাম মন্ডল গঠন করে গ্রামীন উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ।

এই আধা-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ঘোষণাকে দ্রুত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রভাত রায় এবং বংশীঠাকুর উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে-ত্রিপুরা রাজ্য জন মঙ্গল সমিতি-গঠন করেন । এটাই ছিল ত্রিপুরায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ।

কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি । এ জন্য ১৯৫০ সালে চিনিহা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রভাত রায় গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন ।

ঐ সময় মহারাজার ঘোষনাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে রকময় হোক একটা গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সেটাই পরবর্তী কালে বিধানসভারূপে গণ্য হতো ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় মহারাজার ঘোষণা কার্যকর হয়নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সারা ভারতের তীব্র গণ-আন্দোলনের জোয়ার ত্রিপুরায়ও আলোড়ন সৃষ্টি করে । ভারতভুক্তির মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং প্রজাতন্ত্রের যুগ শুরু হয় ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর বংশীঠাকুর, প্রভাত রায় এবং বীরচন্দ্র দেব বর্মার নেতৃত্বে **প্রজামন্ডল**-গঠন এবং দশরথ দেব , অঘোর দেববর্মা ও সুধন্বা দেববর্মার নেতৃত্বে **জনশিক্ষা সমিতি** গঠন ত্রিপুরায় উপজাতি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে । এরা সকলেই ছিলেন বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, এই ধারা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সমগ্র উপজাতি সমাজে । ১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি

গঠনের পর উপজাতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভাজন ঘটে ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল প্রজাতান্ত্রিক যুগে প্রজাদের কল্যানে রাজ্যের শাসক দল সঠিক ভূমিকা না নেওয়ায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপথ গামী হল । উগ্র জাতীয়তাবদের জন্ম হল এবং উপজাতি যুবকেরা সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে পা বাড়ালো ।

সৌভাগ্যের বিষয় হল - এই জটিল ও সংকটজনক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি শক্তিশালী বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিতি হল, এবং সুস্থ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বেষ্টনীর মধ্যেই অধিকাংশ উপজাতি জনগণকে ধরে রাখতে সক্ষম হল ।

গ্রামস্তর পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিস্তার এবং সবস্তরের জনগণকে সরকারী ক্ষমতার অংশীদার করার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকাশের এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কিন্তু বিদেশী মদতে কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবক এখনো সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করতে রাজী হচ্ছেনা । প্রতিবেশী দেশগুলোতে ঘাঁটি করার সুযোগ না পেলে এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে অথবা সন্ত্রাসবাদী পথ থেকে সরে যাবে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ।

বামফ্রন্ট বিরোধী আঞ্চলিক দল গঠন করে যে সব উপজাতি নেতারা সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা সুস্থ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই অংশীদার। সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তারাও সংগ্রাম করে চলছেন । দুর্ভাগ্যের বিষয় বামপন্থীদের একটা বড় অংশই এই সত্যটুকু এখনো উপলব্ধি করতে পারছেন না ।

ভারত বহুভাষা ও বহুজাতির দেশ । একটিমাত্র জাতির আধিপত্য কেউ মেনে নেবেনা । কেন্দ্রে ও রাজ্যে বহু দলীয় কোয়ালিশন সরকার গড়ে প্রতিটি জাতীকে ক্ষমতার অংশীদার হবার সুযোগ করে দিতে হবে । এটাই বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ভারতের প্রধান দাবী।

১৯৮৮ সালে ভারতের সংবিধানের উপর গভীর আস্থা রেখেই রাজ্যের প্রথম উপজাতি আঞ্চলিক দল উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস দলের সঙ্গে জোট বেধে ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট বিরোধী জোট সরকার গঠন করেছিল । কিন্তু মিত্রশক্তি প্রকৃত মৈত্রীর পরিচয় দিতে পারেনি । ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ও দলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত হয়েছে জোট সরকার।

জোট সরকার জনপ্রিয় হয়নি এবং উপজাতিদের উন্নয়নে ও যথোচিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি ।

কিন্তু সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হয়ে উপজাতি নেতারা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । এবং তারাও যে সরকারী প্রশাসন চালাতে সক্ষম এ বিষয়ে আত্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠেচেন।

এর ফলে ত্রিপুরায় উপজাতিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা নতুনধারা সৃষ্টি হয়েছে । বহু বিভ্রান্ত যুবক সন্ত্রাসবাদী পথ ছেড়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে । এই ধারার সৃষ্টি করেছেন-শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, রতিমোহন জমাতিয়া, হরিনাথ দেববর্মা, অমিয় দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, সরলপদ জমাতিয়া, গৌরী শংকর রিয়াং, বুদ্ধ দেববর্মা, অনিমেশ

দেববর্মা প্রমুখ উপজাতি নেতারা । তাদেরই আকর্ষনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বহু যুবক যোগদান করেছেন ।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন এবং বিদেশী বিতাড়নের শ্লোগান দিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তাদের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন বিজয় রাংখল এবং অনন্ত দেববর্মা । কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগেই তারা সন্ত্রাসবাদী পথ ছেড়ে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হন । ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর পরামর্শেই রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে জোট বাঁধতে বাধ্য হয়েছিলেন ।

ইতি পূর্বে উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা এবং জেলা পরিষদ গঠনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্যেব কংগ্রেস নেতারা তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং উপজাতি যুব সমিতির চারটি প্রধান দাবীরই বিরোধীতা করেছিলেন । তখনই উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রশ্নে এবং স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । তবুও উপজাতি নেতারা বিশেষ পরিস্থিতির চাপেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে জোট বেঁধে ষষ্ঠতপশীলের দাবী আদায় করেছিলেন । জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনে জনশক্তির মূল উৎস হল-ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন । ভারতের জাতীয়দাবাদী আন্দোলনে ঐক্য ছিলনা বলেই স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে দেশ বিভাজন মেনে নিতে হয়েছিল ।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় মতাদর্শগত ঐক্য এবং দার্শনিক ভিত্তি ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন মতাদর্শের তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল । প্রধানত গান্ধীবাদ এবং মার্কবাদের মধ্যে ছিল তীব্র দ্বন্দ্ব ও মতভেদ । এছাড়াও ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার প্রভাব এবং মতভেদ ছিল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে । মুসলিম লীগের কোন মতাদর্শই ছিলনা । স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের কোন ভূমিকাও ছিলনা । মৌলবাদীদের অন্ধ হিন্দু বিদ্বেষ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল মুসলিম লীগ ।

ত্রিপুরায় উপজাতি জাতীয়তাবাদীদের একটা অংশ বাঙ্গালী বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তারাই সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মদত দিচ্ছে । যার ফলে উপজাতি জাতীয়তা বাদীদেব মধ্যেও ঐক্য গড়ে উঠছেনা । প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যোগ্য ভূমিকা নেবার মত ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনও সৃষ্টি হচ্ছেনা ।

উপজাতি যুব সমিতি রাজ্যের প্রথম আঞ্চলিক দল হিসেবে যে গ্রহন যোগ্যতা অর্জন করেছিল তা নেতাদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে নষ্ট হয়েছে । বারবার নতুন নতুন আঞ্চলিক দল গঠন করে নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন । সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি জনগণের স্বার্থও বিপন্ন হচ্ছে । মনে রাখা দরকার উপজাতিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নয় । প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতার অংশীদার হওয়াই বর্তমানে গণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ট গুন হল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতা ও কর্মীদের

৫) প্রমোশনের জন্য নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সতীন গুপ্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি ছাত্রদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে রাজনীতি করতেন। বহু ছাত্র যখন ২০০ নম্বর পেয়েও প্রমোশন পায়নি তখন মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয়পাত্রদের সন্তানরা সব বিষয়ে ফেল করেও প্রমোশন পেয়ে যেত। ছাত্র এবং অভিভাবকদের এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় ক্ষুব্ধ প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের সমস্যার মীমাংসার জন্য এক সভার নাম করে অভিভাবক পরিচয় দিয়ে ৫০-৬০ জন গুন্ডা ডেকে এনে ছাত্র-নেতাদের উপর আক্রমণ চালান। ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন কিছু শিক্ষকের উপরও আক্রমণ চালানো হয়। বিদ্যালয়ে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে বেশকিছু ছাত্র ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।

এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি সারা রাজ্যে ২৪ ঘন্টার বন্ধ ডেকে সর্বত্র জঙ্গী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ত্রিপুরা বন্ধ সম্পূর্ণ সফল হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটা মীমাংসা করেন। সমস্ত মামলা তুলে নিয়ে বন্দীদের মুক্তি দেন।

এই সাফল্যে সরকারী শিক্ষক সমিতির ভিত্তি শক্তিশালী হয়। হাজার হাজার কংগ্রেস অনুগামী শিক্ষক এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতির সদস্যভুক্ত হন এবং সারা রাজ্যে শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠে। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, যার ফলে সব মতের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের শরীক হয়েছিল। **এটাই ছিল ত্রিপুরায় শিক্ষক আন্দোলনের এক ঐতিহাসিক ঘটনা - যা ভবিষ্যতের গণআন্দোলনের পথ নির্দেশ করেছিল।** কিন্তু রাজনৈতিক হঠকারিতা এই পথের বিকাশে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত খন্ড খন্ড ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে।

কল্যাণপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের জঙ্গী আন্দোলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ উপযুক্ত শিক্ষা নিয়ে যথাসময়ে একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করেছিলেন। নতুবা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে কংগ্রেস দলের কোন অস্তিত্বই থাকত না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত সম্পূর্ণ বিপরীত পথ নিলেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজের ক্ষমতার দম্ভকে উচ্চাসনে স্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন, যে পথ সামন্ততান্ত্রিক এবং এক নায়কত্ব সুলভ নির্যাতনের দৃষ্টান্ত রেখে গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করেছে। কংগ্রেস সংগঠনকেও চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে।

মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত তিনবার স্বেচ্ছাচারী দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করেছেন।

প্রথমবার ১৯৭৪ সালে শিক্ষক কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবীতে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেন। এই ধর্মঘটের ব্যাপক সাফল্য দেখেও মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত শিক্ষক কর্মচারী নেতাদের সঙ্গে কোন রকম আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করলেন না। অথচ শিক্ষক কর্মচারীরা একটা আপোষের জন্য প্রস্তুত ছিল।

দ্বিতীয়বার ১৯৭৪ সালের ৩রা জুলাই সারা রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা একদিনের ক্যাজুয়েল লীভ নিয়ে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু সুখময় সেনগুপ্ত আপোষ মীমাংসার পরিবর্তে ভয়ংকর তেজে জ্বলে উঠলেন। বিভিন্ন সভায় শিক্ষক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করতে থাকেন।

তৃতীয়বার ১৯৭৫ সালের ১৯ মার্চ থেকে বকেয়া ডি এ এবং অন্যান্য দাবী পূরণের ব্যবস্থা না হওয়ার প্রতিবাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য লাগাতর ধর্মঘটের ডাক দেয় শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন। সারা রাজ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। নগণ্য সংখ্যক কংগ্রেস অনুগামীরা ছাড়া সর্ব স্তরের শিক্ষক-কর্মচারীরা আন্দোলনে যোগ দেন। শুধুমাত্র কয়েকটি বকেয়া ডি এ মঞ্জুর করেই আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত এই সুযোগকে ব্যবহার করে প্রথম সারীর সব নেতাদের শাস্তি দিয়ে আন্দোলনকে ধ্বংস করার পথ বেছে নিলেন।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না যে কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী সংগঠক ক্ষমতাচ্যুত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ এই সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্তকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। বিধানসভায় ১৮জন কংগ্রেস বিধায়ক শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবীগুলো মেনে নিয়ে অবিলম্বে মীমাংসার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানান। তারা বামপন্থী বিধায়কদের সঙ্গে একই সুরে শিক্ষক-কর্মচারীদের লাগাতর আন্দোলনকে সমর্থন করেন।

সুখময় সেনগুপ্ত ক্ষিপ্ত হয়ে রাতের বেলায় সমীর বর্মণ সহ বেশ কয়েকজন বিধায়ককে মিসা আইনে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করেন। লাগাতর ধর্মঘটের বেশ কয়েকজন নেতাকে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ৩১১ ধারা প্রয়োগ করে অনেক নেতাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

অন্যদিকে যারা ধর্মঘটে যোগ দেয়নি তাদেরকে ডাবল ইনক্রিমেন্ট দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

লাগাতর আন্দোলনের মাঝামাঝি সময়ে বীর বল্লভ সাহার নেতৃত্বে এ টি টি এ সংগঠনভুক্ত শিক্ষকরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাপক দমননীতি শুরু হওয়ায় এবং ডাবল ইনক্রিমেন্ট ঘোষিত হওয়ায় বহু শিক্ষক নিজেদের সংগঠনের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেই আন্দোলন থেকে সরে যেতে থাকে। ফলে বীর বল্লভবাবুকেও ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সময় এ টি টি এর সম্পাদক ছিলেন অমরেশ ভৌমিক, তিনি ২৬ বছর সাধারন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠায় ১লা এপ্রিল ১৯৭৫ তারিখে লাগাতর ধর্মঘট প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

২৫ শে জুন ১৯৭৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এই সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত মিথ্যা সাজানো মামলায় শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনের নেতাদের মিসা আইনে গ্রেপ্তার করে বিভিন্ন জেলে আটক করেন। বহু নেতাকে দূর দূরান্তে শাস্তিমূলক বদলী করা হয়।

এসব ঘটনায় ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাসের মোড় ঘুরে যায়। কারণ শাস্তিপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে বহু কংগ্রেস অনুগামীও ছিলেন। তারা আর কখনো কংগ্রেসে ফিরে যাননি। যার পরিণতিতে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ত্রিপুরা বিধানসভায় একজন কংগ্রেস প্রার্থীও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারেননি। সুখময় সেনগুপ্তকেও রাজনীতির আসর থেকে চির বিদায় নিতে হয়।

ইতিহাস বদলে গেলে ও ত্রিপুরায় শিক্ষকদের ভাগ্যে বঞ্চনাই শুধু মিলেছে। বেতন বৈষম্য দূর হয়নি। ১৯৭৪ সালের প্রথম বেতন কমিশন ত্রিপুরার সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নিম্নমুখী করেছে। সম পর্যায়ের কর্মচারীদের তুলনায় শিক্ষকদের বেতন ছিল অনেক কম। স্টোরকীপার এবং ভি এল ডাব্লিউদের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কম ছিল। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের বেলায় ও এরূপ বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল।

১৯৭৮ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার শপথ নেবার পরই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য দূর করার জন্য দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যকে চেয়ারম্যান করে একটি পে রিভিউ কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কিছুসংখ্যক কর্মচারী নেতা ও আমলাদের চাপে শিক্ষকরা এখানেও সুবিচার পেলেন না। এর কিছুকাল পরই দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য মৃত্যুসয্যায় শায়িত অবস্থায় স্বীকার করেন যে শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর না করা খুবই ভুল হয়েছে। এই স্বীকারোক্তি ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছে।

১৯৮৩ সালে দ্বিতীয়বার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষক-কর্মচারীদের নায্য দাবীগুলোর মীমাংসার জন্য দ্বিতীয় বেতন কমিশন গঠন করে। কিন্তু দ্বিতীয় বেতন কমিশনও শিক্ষকদের নায্য দাবী মেনে নেয়নি। অন্যদিকে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে সব শিক্ষক একাধারে ১৫ বছর কাজ করেছেন তাদের জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট দেবার নীতিও বামফ্রন্ট সরকার মেনে নেয়নি। ফলে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার তা মেনে নেয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী কেরালা এবং অন্ধ্রের রাজ্য সরকারগুলো শিক্ষকদের জন্য গ্রেডেড স্কেল চালু করে সত্তরের দশকে। কিন্তু ত্রিপুরায় শিক্ষকদের এই দাবী বার বার অবহেলিত হয়।

১৯৮৭ সালে বামফ্রন্টের নিযুক্ত তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। তখন কংগ্রেস ও যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত। এই কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর হওয়ায় ত্রিপুরায় শিক্ষকরা কিছুটা লাভবান হন। এবারই প্রথম শিক্ষকদের জন্য গ্রেডেশানের দাবী মেনে নেওয়া হয়। ১০ বছর চাকুরীর পর নতুন গ্রেডের ব্যবস্থা হয়। জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার ছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের নেতা। তিনি শিক্ষকদের অনেক দাবী পূরণ করেন। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের পেনশন স্কীম তার মধ্যে অন্যতম।

১৯৯৬ সালে ৪র্থ বেতন কমিশনের সুপারিশে শিক্ষকদের প্রতি অনেকটা সুবিচার করা হয়েছে। যে সব বৈষম্য দূরীকরণের দাবীতে শিক্ষকরা বিধানসভা অভিযান করেছিলেন তা মেনে নেওয়া হয়েছে। অর্জিত ছুটির দাবী আংশিক মানা হয়েছে। কর্মচারীরা যেখানে বছরের ৩০দিন অর্জিত ছুটি পান। শিক্ষকদের বেলায় তা বছরে ১০দিন কবা হয়েছে। গ্রীষ্মের ছুটি এবং পূজার ছুটি কমানোর পরও অর্জিত ছুটি কর্মচারীদের সমান করার দাবী মানা হয়নি।

সুদীর্ঘ ৫০ বছর ধরে শিক্ষক আন্দোলনে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে তা রাজনৈতিক সংকীর্ণতার কারণে নষ্ট হয়েছে। সারা রাজ্যের শিক্ষকদের দাবী হল অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে শিক্ষক সংগঠন পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। কোন একটি রাজনৈতিক দলের শাখা হিসেবে শিক্ষক সংগঠনকে ব্যবহার করা গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিরোধী।

১৯৬৬ সালের পর থেকে সারা রাজ্যের সর্বস্তরের শিক্ষকরা একটি মাত্র সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারলেন না। এটা শিক্ষক আন্দোলনের পক্ষে বেদনাদায়ক। সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের উন্নয়নের জন্যই শিক্ষা। শিক্ষক সংগঠনকে এই সার্বিক কল্যাণমূলক সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হয়। তাই সর্বশেষ স্লোগান হল **বিভেদ নয় ঐক্য চাই**। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই জয় নিশ্চিত করে।

বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের আন্দোলন

১৯৪৬ সালে নোয়াখালির দাঙ্গাপীড়িত উদ্বাস্তুরা নিঃস্ব অবস্থায় ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই দেশ ভাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়। ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।

এসব উদ্বাস্তু পরিবারের খাদ্য-বস্ত্র এবং আশ্রয়ের যেমন তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। তেমনি উদ্বাস্তু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সংকটও তীব্রভাবেই দেখা দিয়েছিল। এই শিক্ষা সংকট মোচনের জন্য একদল শিক্ষানুরাগী বেসরকারী উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন উদ্বাস্তু হয়ে আসা পূর্ব বাংলার বিখ্যাত স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীগণ।

১৯৪৮ সালে ত্রিপুরায় চারটি বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আগরতলায় ১) নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন, ২) প্রগতি বিদ্যাভবন এবং ৩) ধর্মনগরে ডি এন বিদ্যা মন্দির ও খোয়াই শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন। ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় **আগরতলায় -প্রাচ্যভারতী বিশালগড়ে - বিশালগড় উচ্চ বিদ্যালয়, বিলোনীয়া-বিদ্যাপীঠ**। ১৯৫১ সালে গড়ে উঠে **আগরতলায় মহাত্মাগান্ধী মেমোরিয়াল স্কুল, বড়দোয়ালী হাইস্কুল, খয়েরপুর পল্লীমঙ্গল স্কুল, উদয়পুর রমেশ হাইস্কুল, জোলাইবাড়ী হাইস্কুল, ফটিকরায় হাইস্কুল, কাতলামারা হাইস্কুল, করইমুড়া হাইস্কুল, ঈশানচন্দ্র নগর পরাগনা হাইস্কুল।**

এভাবে পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় ৩০টি বেসরকারী বিদ্যালয়। পরবর্তী সময়ে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যে সব ইংলিশ মিডিয়াম বেসরকারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর তুলনায় প্রথম যুগের বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল পৃথক।

কপর্দক শূন্য অবস্থায় কতিপয় উৎসাহী যুবক ও শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করা, আসবাবপত্র সংগ্রহ করা, বিনা বেতনে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে নাম মাত্র বেতনে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী নিয়োগ করা, রীতিমত একটা দুঃসাহসী কাজ। বহু সহৃদয়

ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ভূমিদান করেছেন। চাঁদা সংগ্রহ করে বাঁশছনের গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বাড়ী থেকে ধার করে চেয়ার টেবিল সংগ্রহ করে শিক্ষকেরা ক্লাশ করেছেন। নতুন ঘরের স্যাঁত স্যাঁতে কাঁচা মাটিতে চাটাই বিছিয়ে ছাত্ররা ক্লাশ ঘরে বসেছে। সব স্কুলই প্রথমে প্রাথমিক স্তরে ক্লাশ চালু করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে দ্রুত গতিতে হাইস্কুলে ক্রমবিস্তার লাভ করেছে। ফলে বিদ্যালয় অনুমোদনের উপযোগী পরিকাঠামো তৈরী করতে হয়েছে।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত মেট্রিকুলেশান পরীক্ষার নেওয়া হতো কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। স্কুলের অনুমোদন ও দিত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সাল থেকে নব প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যক্ষিা পর্ষদ স্কুল ফাইন্যাল কোর্স চালু করে। তখন থেকে বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়ার কাজ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের দায়িত্বে আসে।

বেসরকারী বিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য দরকার হতো পরিকাঠামোর রিপোর্ট, বিজ্ঞান শিক্ষক সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা এবং নগদ ছয় হাজার টাকা। বহু বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা নিজেদের দানে এসব চাহিদা পূরণ করেছেন। শিক্ষক নিয়োগের অর্থ না থাকায় বিনা বেতনে উদ্যোক্তারা শিক্ষকের কাজ করেছেন। বিদ্যালয় অনুমোদন পাওয়ার খবর প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় সব স্তরের মানুষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত।

গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। সামান্য বেতন তাও আবার অনিশ্চিত। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্যরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করতেন। ছাত্র এবং অভিভাবকরাও এভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে দিত। এসব কাজে শত্রুতারও অভাব ছিল না। বহু স্কুল রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দিয়েছে এমন ঘটনা আগরতলা শহরেও ঘটেছে। নেতাজী স্কুল কুঁড়ে ঘর থেকে বর্তমান জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর আগুনে পুরে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

সেই সব দুর্দিনে সরকারী সাহায্যে প্রায় কিছুই পাওয়া যেত না। আমলাদের মধ্যে কিছু দরদী মানুষ ছিলেন, যারা উদ্যোগী হয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ত্রিপুরায় বেসরকারী পরিচালনায় কোন স্কুল ছিল না। তাই আর্থিক সাহায্য করার মত কোন নিয়মনীতি বা দপ্তরও ছিল না।

ভারতভুক্তির পরে পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে ত্রিপুরায় বেসরকারী স্কুলকে সাহায্য করার জন্য গ্র্যান্ট-ইন-এইড দপ্তর খোলা হয়। এর জন্য চাপ সৃষ্টি করতেই **শিক্ষক সমিতির জন্ম হয়।**

১৯৪৯ সালে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক হীরেন্দ্র নাথ নন্দী এবং প্রগতি বিদ্যাভবনের প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে একটি সভায় মিলিত হন। এই সভা থেকে --**ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি** নামে একটি বেসরকারী শিক্ষক সংগঠন গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাথ সাহা। ত্রিপুরার চীপ কমিশনার ও এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরায় বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের উদাসীনতার সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হীরেন্দ্র নাথ নন্দী।

ত্রিপুরা তখনো চীফ কমিশনারের শাসনে ছিল। সরকারের সমালোচনায় চীপ কমিশনার খুব ক্ষুব্ধ হন, এবং বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর অনুমোদনে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সহ্য করতে না পেরে সব স্কুলকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

অধিকাংশ বিদ্যালয় সরকারের হাতে তুলে দিতে পরিচালন কমিটিগুলো মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু নেতাজী ও প্রগতি স্কুল শিক্ষার উন্নয়নে বেসরকারী পরিচালনায় স্বাধীন উদ্যোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পর সরকারের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার তুলে দেবার বিরুদ্ধে ঐক্যমত গড়ে উঠে। এই সম্মেলনে হীরেন্দ্র নাথ নন্দীকে সভাপতি ও রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। নাগরিকদের শিক্ষার দায়িত্ব যেহেতু জাতীয় সরকারের সেহেতু সরকারী শিক্ষানীতি মেনে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নত শিক্ষার আয়োজন করতে পারবে সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করতে সরকার বাধ্য।

ত্রিপুরা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদের অধীনে, সেহেতু পশ্চিমবঙ্গের গ্র্যান্ট ইন এইড এর নিয়মাবলী ত্রিপুরাতেও প্রয়োগ করতে হবে। এটাই ছিল প্রথম সম্মেলনের সর্বসম্মত দাবী।

পরবর্তী সময়ে ডাঃ মেঘনাথ সাহা রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও ত্রিপুরার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফলে ত্রিপুরায় বেসরকারী বিদ্যালয়কে সাহায্য করার জন্য গ্র্যান্ট ইন এইড দপ্তর খোলা হয়। কিন্তু পশ্চিবঙ্গের নিয়মনীতি সম্পূর্ণভাবে মানা হয়নি। গ্র্যান্ট ইন এইডর তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষকদের মোট বেতনের ৯০ শতাংশ সরকার দিত। বাকী ১০ শতাংশ বেতনের ব্যবস্থা করতে হতো পরিচালন কমিটিকে। অশিক্ষক কর্মীদের বেতনের দায়িত্বও ছিল পরিচালন কমিটির উপর। মোট বেতনের ৩০ শতাংশ কনটিনজেন্সি খরচের জন্য সরকার থেকে পাওয়া যেত। এই টাকা থেকে অশিক্ষক কর্মীদের বেতন ভাতা প্রদান এবং বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করতে হতো। প্রতি তিন মাসে একবার গ্র্যান্ট দেওয়া হতো।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বিদ্যালয় সম্প্রসারণের কাজও জরুরী হয়ে উঠে। নতুন নিয়মে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি অভিভাবকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি সহ শিক্ষক প্রতিনিধি, প্রধান শিক্ষক, সরকারী প্রতিনিধি ও একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সহ একজন স্থানীয় বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী নিয়ে গঠিত হতে থাকে। এখানে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলতে থাকে। নির্বাচন মানেই দলাদলি। ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরনের প্রার্থীদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। পরিচালন কমিটির সদস্যরা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজেদের পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনকে চাকুরী দেবার সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে।

আদর্শবান শিক্ষানুরাগীরা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে যে পরিমাণ উৎসাহী ও উদ্যোগী ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে সেই পরিমাণ উৎসাহ বোধ করেননি। নানা জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় অনেকে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এই কারণে বহু বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটিতে সুযোগ সন্ধানীদের আবির্ভাব ঘটে। সময়মত শিক্ষকদের বেতন না দেওয়া, বেতনের কিছু অংশ নানা অজুহাতে কেটে নেওয়া, বিদ্যালয়ের ফান্ড সুদে বা ঠিকেদারী কাজে খাটিয়ে লাভ করা ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম শুরু হয়। কোন শিক্ষক প্রতিবাদ করলে কোন কারণ না দেখিয়ে ছাঁটাই করা হতো। আদালতে গিয়েও বিচার পাওয়া যেত না। কারণ গ্র্যান্ট-ইন-এইডের আইন অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতের কোন এক্তিয়ার ছিল না। অর্থাৎ পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল শেষ কথা।

এই পরিস্থিতিতে গ্র্যান্ট-ইন-এইড রুলের সামন্ততান্ত্রিক বিধি-বিধান পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসবণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতিকে আন্দোলন শুরু করতে হয়। বিদ্যালয় যত বড় হতে থাকে, সমস্যাও ততই বাড়তে থাকে। কাজেই আবেদন-নিবেদন ও ডেপুটেশানের মাধ্যমে বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা কঠিন হযে উঠতে থাকে।

তাই নবীন প্রজন্মের নবীন-শিক্ষকরা ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতিকে রাজ্যভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ সংগঠন হিসেবে মজবুত করে তুলে অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে নেতৃত্ব দেন অমল দাসগুপ্ত, ব্রজগোপাল রায়, ধীরেন দত্ত, অনন্তকৃষ্ণ ধর, সুরেন্দ্র ভৌমিক, উপেন্দ্র সাহা, সুরেশ সাহা, শৈলেন চৌধুরী প্রমুখরা। ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় মহকুমা শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন স্কুলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে মজবুত সংগঠন গড়ার ভিত্তি তৈরী হয়।

১৯৭০ সাল পর্যন্ত নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন ছিল-ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির প্রধান কেন্দ্র। সারা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে সমস্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সমন্বয় কমিটি গঠন ও ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতিকে সমন্বয়ভুক্ত সংগঠনে পরিণত করার প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। ফলে ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি ভেঙ্গে গিয়ে নতুন সংগঠন ত্রিপুরা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান কেন্দ্র হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন। ক্রমে ক্রমে শিক্ষক সমিতির অরাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ চরিত্র বদলে গিয়ে রাজনৈতিক চেহারা নিতে থাকে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষক সংগঠন গড়ে উঠে।

দুটি শিক্ষক সংগঠনের দাবীগুলো ছিল প্রায় এক রকম। কারণ সমস্যাগুলো সকলের জন্যই ছিল একই রকম। বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান দাবীগুলো ছিল ঃ

১) গ্র্যান্ট-ইন-এইড রুলের পরিবর্তন চাই।

২) বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য ক্যাপিটেল গ্র্যান্টের প্রবর্তন করতে হবে।

৩) অশিক্ষক কর্মীদের গ্র্যান্ট-ইন-এইডের আওতাভুক্ত করতে হবে।

৪) সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বেতন বৈষম্য দূরীকণ করতে

হবে।

৫) বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাঁটাই বন্ধ করতে হবে।

৬) বেসরকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী বিদ্যালয়ের মত স্টাইপেন্ড, বুকগ্র্যান্ট ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

৭) বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের মত পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৮) সরকারী কর্মচারীদের মত সব স্তরের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের জন্য অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) চাকুরীর সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষক ও সহ প্রধান শিক্ষক পদে প্রমোশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০) দুর্নীতিগ্রস্ত পরিচালন কমিটি বাতিল করে দুর্নীতির তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১) শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক পাঠ্যসূচী, পাঠদান ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রচলিত পরীক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

১২) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে সর্ব স্তরে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব দাবীর ভিত্তিতে টি টি এ এবং টি টি ই এ দুটি শিক্ষক সংগঠনই পৃথক পৃথকভাবে গণঅবস্থান, সেমিনার ইত্যাদি বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন পরিচালিত করেছে। সারা ত্রিপুরার বেসরকারী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা দুটি সংগঠনে প্রায় সমানভাবে বিভক্ত হয়েছিল।

১৯৭৩ সালে টি টি ই এর জন্ম হয়। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে বিপুল সমাবেশে বেসরকারী শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা শিক্ষক সংগঠনের পৃথক অস্তিত্ব এবং স্বাধীন আন্দোলনের ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে মত দেন। প্রত্যেক বেসরকারী বিদ্যালয় থেকে দুজন শিক্ষক ও একজন অশিক্ষক প্রতিনিধি নিয়ে **ত্রিপুরা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি** নামে নতুন সংগঠন গঠন করা হয়। অস্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন প্রগতি বিদ্যাভবনের শিক্ষক দীনেশ চন্দ্র সাহা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অনিল দাস। সহ সভাপতি ও সহ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন সুধীর মজুমদার এবং বনোয়ারী লাল ভট্টাচার্য।

এক বছরের মধ্যেই সমস্ত বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সংগঠন গড়ে উঠার পর নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে নতুন সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। টি টি ই এর প্রথম সম্মেলনে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করে বোঝা গিয়েছিল অধিকাংশ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী শিক্ষক সংগঠনকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন রূপে বাঁচিয়ে রাখতে চান।

সমন্বয় কমিটির দাবী তালিকায় অনেকগুলি রাজনৈতিক দাবী স্থান পেয়েছিল। শিক্ষকদের দাবী বিশেষতঃ বেসরকারী শিক্ষক ও অশিক্ষকদের অনেক দাবী উপেক্ষিত হয়েছিল।

টি টি ই এর সম্মেলনে শিক্ষক-শিক্ষা কর্মী ও শিক্ষা সম্পর্কিত দাবী-দাওয়ার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই সম্মেলনে একটি সংবিধান ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত

হয়েছিল।

এই সম্মেলনে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক দীনেশ দত্তকে সভাপতি এবং প্রগতি বিদ্যাভবনের শিক্ষক দীনেশ চন্দ্র সাহা ও রাণীর বাজার বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক সুধীর মজুমদারকে সহ সভাপতি এবং গান্ধী মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের শিক্ষক শচীন নাথকে সাধারণ সম্পাদক ও প্রাচ্যভারতীর শিক্ষক বনোয়ারী লাল ভট্টাচার্য্যকে সহ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পরবর্তী সময়ে সভাপতি দীনেশ দত্তের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কালিপদ চক্রবর্তীকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। নব্বই-এর দশক পর্যন্ত একই নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত সমিতির বিভিন্ন আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন দাবী আদায় করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের নিম্নমুখী বেতনক্রম চালু করার ফলে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস-যুব সমিতির জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন টি টি ই-এর সহসভাপতি সুধীর মজুমদার। তিনি শিক্ষকদের অনেকগুলো দাবী পূরণ করার ব্যবস্থা করেন। বেসরকারী শিক্ষকদের ও শিক্ষা কর্মীদের সরকারী কর্মচারীদের মত পেনশান ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেন। আমলাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের পেনশানের দাবী বিভিন্ন অজুহাতে স্থগিত রেখেছিলেন। কিছু কর্মচারী নেতা এবং আমলাদের একাংশের বাধাদানের ফলেই মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী এবং শিক্ষামন্ত্রী দশরথ দেব বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের পেনশানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। শিক্ষকদের বেতন কাঠামো সমপর্যায়ের কর্মচারীদের তুলনায় নিম্নমুখী করার পেছনেও কিছু কর্মচারী নেতা এবং আমলাদের একাংশের হাত ছিল বলে শিক্ষক সম্মেলনে অভিযোগ উঠেছিল।

শিক্ষক আন্দোলনের চাপে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দাবী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রভাবের ফলে আদায় করা সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বামফ্রন্টের অবদান ঐতিহাসিক বলা চলে।

বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের বেতন শতকরা একশ ভাগ গ্র্যান্ট হিসেবে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বামফ্রন্ট সরকারের একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বিদ্যালয়ভবন নির্মাণ ও মেরামতের একশ ভাগ দায়িত্বই সরকার গ্রহণ করেছেন। আসবাবপত্র সরবরাহ এবং মেরামতের দায়িত্বও সরকার গ্রহণ করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড এবং বুকগ্র্যান্ট সরকারী হারে দেবার ব্যবস্থাও বামফ্রন্ট সরকারই করেছেন।

পঞ্চাশের দশকে বেসরকারী বিদ্যালয়কে উদারভাবে সাহায্য করেছে কেন্দ্রীয় ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর। যেসব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মোট সংখ্যার অর্দ্ধেকের বেশী উদ্বাস্তু পরিবারভুক্ত সেইসব স্কুলকে উদারভাবে সাহায্য করার নীতি গ্রহণ করেছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর। তার ফলেই বহু বেসরকারী বিদ্যালয় ছন বাঁশের ঘর ভেঙ্গে সুদৃঢ় পাকা বাড়ী নির্মাণ করতে পেরেছে। বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ নির্মাণেও সাহায্য করেছে ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর। ১৯৫৮ সালে এ দপ্তর উঠে যাবার পর বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো গ্র্যান্ট-ইন-এইড দপ্তরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

বেসরকারী বিদ্যালয়ের মৌলিক চাহিদাগুলোর পূরণ হবার পর বর্তমানে শিক্ষক সমিতিগুলোর প্রধান কর্তব্য হলো বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে শান্তি-শৃঙ্খলা ও শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা। এক্ষেত্রে অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার ফলে টি টি ই এর সভ্যরা এক সঙ্গে কাজ করার উৎসাহ প্রকাশ করছে।

কিন্তু একটি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংকীর্ণতা টি টি এ কে ভেঙ্গে হগব পন্থী টি টি এ নামে পৃথক একটি শিক্ষক সংগঠন তৈরী করেছে।

অথচ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের অন্তরের দাবী হল সব বিভেদ ভুলে গিয়ে শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হোক। নতুন প্রজন্মের সামনে নতুন আদর্শ গড়ে উঠুক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভাবনা ভাবী প্রজন্মকে আলোড়িত করুক।

শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনে বিভাজন প্রক্রিয়া

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনে বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। সরকারী শিক্ষকরা একটি মাত্র সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। বেসরকারী শিক্ষকদের পৃথক সমস্যাবলীর জন্য পৃথক সংগঠন গড়তে হয়েছে। কিন্তু সব মতের শিক্ষকেরাই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। সরকারী কর্মচারীদের সংগঠনেও কর্মচারীরা ছিল ঐক্যবদ্ধ। তাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও বহু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৬৬ সালে কংগ্রেস দলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠে। সুখময় সেন গুপ্ত কংগ্রেস দল ত্যাগ করে ত্রিপুরা কংগ্রেস নামে নতুন দল গঠন করেন। ফলে কংগ্রেস অনুগামীদের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেনগুপ্ত বামপন্থীদের সঙ্গে মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা শুরু করেন। এই সময় শচীন্দ্র লাল সিংয়ের অনুগামীরা সরকারী শিক্ষক সমিতি ত্যাগ করে নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি গঠন করেন। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও ভাঙ্গন প্রক্রিয়া শুরু হয়। সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন নামে নতুন সংগঠন গড়ে তুলেন। সি পি আই দলে ভাঙ্গন হবার পর ও গণসংগঠনে তখনো ভাঙ্গন প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

১৯৭১ সালে শচীন্দ্র লাল সিংহকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। কারণ বিধানসভায় শচীন্দ্র লাল সিংহের সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল। ফলে অনাস্থা প্রস্তাবের মাধমে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব ছিল না। কেন্দ্রে কংগ্রেস দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি হবার পর শচীন্দ্র লাল সিংহ ইন্দিরা বিরোধী সংগঠনপন্থী নেতাদের সমর্থন করেছিলেন। এই বিরোধের ফলেই শচীন্দ্র লাল সিংহকে নেতৃত্ব থেকে সরাবার সিদ্ধান্ত হয়।

এই সুযোগে সুখময় সেনগুপ্ত ইন্দিরাভক্ত হয়ে ত্রিপুরা কংগ্রেসের বিলুপ্তি ঘটিয়ে আবার জাতীয় কংগ্রেসে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দলের নেতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন। এরপরেই শুরু হয় কংগ্রেসের সমস্ত সংগঠনে ভাঙ্গন প্রক্রিয়া। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব-মহিলা শিক্ষক-কর্মচারী সর্বস্তরে বিভাজন ঘটে। কংগ্রেস দলের বিভাজন প্রক্রিয়াকে

দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে সদ্য গঠিত সি পি এম ও সিটু নেতৃত্ব সমস্ত গণসংগঠনকে শক্তিশালী অবস্থান নিতে সক্ষম হন।

১৯৭০ সালে গঠিত হয় সিটু। ১৯৭৪ সালের মধ্যেই শিক্ষক-কর্মচারী-ছাত্র-যুব ও শ্রমিক সংগঠনে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় সিটু নেতৃত্ব। অবশ্য ১৯৬৯ সালের কল্যাণপুরের শিক্ষক-ছাত্র আন্দোলন থেকেই তার সূত্রপাত হয়।

উপযুক্ত সময়ে যথাযথ রণকৌশল নিয়ে যৌথ গণআন্দোলন সৃষ্টি করার কৃতিত্ব যাদের প্রাপ্য তারা হলেন, অজয় বিশ্বাস, ভবেশ দাস, অনিল সরকার, অমল দাসগুপ্ত, ভূবনেশ্বর দে প্রমুখ শিক্ষক-কর্মচারী নেতৃবৃন্দ।

এই সময় বামপন্থী সংগঠন শক্তিশালী যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হলে কংগ্রেস নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং কোন্দলের ফলে ত্রিপুরায় শিক্ষক-কর্মচারী ও শ্রমিক আন্দোলন ছিন্নভিন্ন হয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যেত।

১৯৭৭ সালের দুটি সুবিধাবাদী কোয়ালিশন সরকার যৌথ গণআন্দোলনকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সহায়ক হয়েছে।

এভাবে ১৯৬৯ এবং ১৯৭২-৭৪, ১৯৭৭-৭৮ এই তিনটি টার্নিং পয়েন্ট সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেস দলের ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে কোন্দলের ফলে। কংগ্রেস অনুগামীরা তিনবারই ভেঙ্গে এসেছে বামপন্থী শিবিরে। ১৯৭৫-৭৬ সালের জরুরী অবস্থা আরেকটা বুস্টারের কাজ করেছে। তার ফলেই ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস দল বিধানসভায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক কর্মচারী ও শ্রমিক আন্দোলনেরই অবদান একথা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস একটিও আসন পায়নি। ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে কিছুসংখ্যক কংগ্রেস অনুগামী শিক্ষক-কর্মচারী কংগ্রেস শিবিরে ফিরে যাবার ফলে কংগ্রেস ১২টি আসনে জয়ী হয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজাতি যুব সমিতিও ২টি আসন বেশী পেয়ে যায়। আমরা বাঙ্গালী দলও একটি আসন লাভ করে, ২জন কংগ্রেস প্রার্থী নির্দল দাঁড়িয়েও জিতে যায়। ১৯৮০ সালে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের সাফল্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার গঠন ১৯৮৩ সালের ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৬৬ সালে সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে নতুন দল ত্রিপুরা কংগ্রেস গঠন করার ফলে কংগ্রেস অনুগামী শিক্ষক কর্মচারীদের মধ্যে যে ভাঙ্গনের প্রক্রিয়া শুরু হয় তা শচীন লাল সিংহের ক্ষমতাচ্যুতির পর তীব্র গতি লাভ করে। ফলে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস অনুগামী শিক্ষক কর্মচারীরা নতুন নতুন সংগঠন গড়ে পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা কল্পনাও করতে পারেন নি, যে ত্রিপুরায় অচিরেই বামপন্থীরা ক্ষমতা দখল করে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

অন্যদিকে বামপন্থী গণসংগঠন গড়ে তীব্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনমত প্রভাবিত করে যারা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন তারাও ভাবতে পারেন নি

যে বামফ্রন্ট নেতারাই বামপন্থী গণসংগঠনগুলোতে বিভাজন ঘটাবেন।

সরকার-পার্টি ও গণসংগঠনের সম্পর্ক কি রকম হবে। সামগ্রিক ঐক্য রক্ষার জন্যে ট্রেড ইউনিয়নের নীতি ও ভূমিকা কি রকম হওয়া উচিত, এই প্রশ্নে তীব্র মতভেদ সৃষ্টি হবার ফলে ত্রিপুরায় কর্মচারী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। ফলে বামপন্থী গণসংগঠনেও বিভাজন অনিবার্যভাবেই দেখা দিল। শিক্ষক সংগঠনের বিভাজন প্রক্রিয়ার চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ-

সরকারী—

১) ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (টি জি টি এ) প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭।
২) ত্রিপুরা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি - ১৯৫৭ ।
৩) নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি - ১৯৬৬ ।
৪) ত্রিপুরা অনার্স এন্ড পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক সমিতি - ১৯৭০।
৫) নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি (বীর বল্লভ সাহার) ১৯৭২ ।
৬) প্রাথমিক এবং উচ্চ বুনিয়াদী প্রধান শিক্ষক সমিতি-১৯৭৩।
৭) ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (হগব)- ১৯৯৩।
৮) উপজাতি শিক্ষকদের একাংশ উপজাতি কর্মচারী সমিতিতে যোগ দেন।

বেসরকারী—

১) ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯।
২) ত্রিপুরা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী সমিতি — ১৯৭৩।
৩) ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি (হগব) - ১৯৯৪।

এভাবে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠন গুলো বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে খন্ড খন্ড হয়ে নতুন নতুন সংগঠনের জন্ম দিচ্ছে । এই পক্রিয়া শেষ হয়েছে বলা যায়না। কারন রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে । আঞ্চলিক দলের সংখ্যাও বাড়ছে । সেই সঙ্গে বাড়ছে পারস্পরিক বিদ্বেষ ।

হীরেন নন্দী

ধীরেন দত্ত

অমল দাশগুপ্ত

শচীন নাথ

সুধীর মজুমদার

বীর বল্লভ সাহা

শান্তি আচার্য্য

ননীগোপাল সাহা

অমরেশ ভৌমিক

মুকুন্দ লাল দে

ত্রিপুরায় শিক্ষক আন্দোলনের নেতৃত্ব

ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারী আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও তার প্রভাব পড়ে। ফলে আগরতলা শহরের কর্মচারীদের মধ্যে নিজেদের অভাব অভিযোগ, সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি গঠন করা হয়।

রাজন্য যুগে ত্রিপরায় কর্মচারীদের জন্য কোন বেতন কাঠামো ছিল না। মহার্ঘ ভাতা, বাড়ী ভাড়া ভাতা বা চিকিৎসা ভাতাও প্রচলিত ছিল না। বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে মহারাজা নিজেই বেতন ধার্য করে দিতেন।

সাধারণভাবে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা সামান্যই বেতন পেতেন। মাসিক ১৫-৩০ টাকা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষক ও কেরানীদের পরিবার চালানো খুবই কঠিন কাজ ছিল। একমাত্র আগরতলায় স্নাতক স্তরের শিক্ষক ও সম পর্যায়ের কর্মচারীরা ৩০ টাকা থেকে ৭৫ টাকা মাসিক বেতন পেতেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ত্রিপুরায় এই বেতন হার চালু ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সামরিক বাহিনীর একজন কর্ণেলের বেতন ছিল মাসিক চল্লিশ টাকা, সুবেদারের বেতন মাসিক ২০ টাকা, হাবিলদারের মাসিক বেতন ছিল ১০ টাকা, সিপাহীদের মাসিক বেতন ছিল ৬ টাকা।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু বেতন হার মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু এসব ব্যাপারে কথা বলার অধিকার কারো ছিল না।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ত্রিপরা স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হবার পর কর্মচারীরা নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়ে কথা বলার সুযোগ লাভ করলেন।

স্বাধীনতার তিন মাস আগেই ত্রিপরার মহারাজার অকাল মৃত্যু হয়। যুবরাজ নাবালক থাকায় রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবী রাজ প্রতিনিধি মনোনীত হন এবং স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে রাজ্যের দেওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। প্রকৃত পক্ষে এই সময় থেকেই ত্রিপরায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছে।

ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা বছরে একবার সম্মেলন করে নিজেদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য দাবীপত্র তৈরী করে কর্তৃপক্ষের কাজে জমা দিয়ে আলাপ অলোচনা ও আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আদায়ের প্রচেষ্টা চালান। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এসব সম্মেলনে সাধারণতঃ চীপ সেক্রেটারীকে সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসনে রাখা হতো।

১৯৫৩ সালে রাজ্যে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন হবার পর সরকারী কর্মচারীরা উন্নত বেতন কাঠামোর জন্য চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু উপদেষ্টাদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিল না। আমলাতন্ত্রের উপরই নির্ভরশীল ছিল রাজ্যের প্রশাসন। ১৯৫৬ সালে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত

হবার পর রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে প্রথম কিছু ক্ষমতা অর্পিত হয়। এই সময় সরকারী কর্মচারীদের জন্য একটি বেতন কাঠামো গঠন করা হয়। এর ফলে শিক্ষক কর্মচারীদের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন ঘটে।

নতুন বেতন হার অনুযায়ী শিক্ষক কর্মচারীরা নিম্নরূপ বেতন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হন।

প্রাথমিক শিক্ষক ও সম পর্যায়ের কর্মচারী ৫৫-১৩০ টাকা

স্নাতক শিক্ষক ও সম পর্যায়ের কর্মচারী ১০০-১৬০ টাকা

শিক্ষন প্রাপ্ত না হলে শিক্ষকদের স্থির বেতন মাসিক ১০০ টাকা

প্রধান শিক্ষক ও সম মর্যাদার কর্মচারী ২০০-৪০০ টাকা

এই সময়ে নতুন নতুন দপ্তর এবং নতুন নতুন পদ সৃষ্টির কাজ চলছিল কাজেই অন্যান্য রাজ্যের মত বেতন স্কেল নির্মাণ করাও কঠিন ছিল।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং পাক-ভারত যুদ্ধের সময় সরকারী কর্মচারী সমিতি অনেকটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল।

১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই থেকে ত্রিপুরায় সীমিত ক্ষমতা সম্পন্ন বিধানসভা গঠন করার ঘোষণা এবং ১৯৬৬ সালে রাজ্যের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট পার্টির বিভাজন রাজ্যের পরিস্থিতি আমূল বদলে দিয়েছিল।

এর ফলে সরকারী কর্মচারী আন্দোলনেও নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। প্রায় ২০ বছরের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিভিন্ন দলের সমর্থক কর্মচারীরা বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব ঘোষণা করতে থাকে।

ত্রিপুরায় বাঙ্গালীদের মধ্যে কমিউনিষ্টদের বিশেষ প্রভাব ছিল না। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দুই কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান ভিত্তি ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে। তাই কমিউনিষ্ট পার্টিকে বলা হত ট্রাইবেল পার্টি।

এ জন্যই আগরতলা পুর কর্মচারীদের নেতা অজয় বিশ্বাস লাল পতাকা নিয়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে সংগঠন গড়তে রাজী ছিলেন না। কারণ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা তখন প্রকাশ্যেই কমিউনিষ্ট বিরোধী ছিল। এই প্রশ্নে অজয় বিশ্বাসের সঙ্গে নৃপেন চক্রবর্তীর প্রথম বিরোধ সৃষ্টি হয়।

পার্টির নির্দেশ উপেক্ষা করেই অজয় বিশ্বাস বিভিন্ন ক্লাব ও ফিল্ম সোসাইটি মারফতে জনসংযোগের কাজ শুরু করেন। সান্ধ্য কলেজ স্থাপন করে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। ১৯৬৬ সালে পুরসভার কর্মচারী সংগঠনে তড়িৎ দাসগুপ্তকে সভাপতি এবং অজয় বিশ্বাসকে সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয়। ফিকসড পে কর্মচারীদের রেগুলার করার দাবী নিয়ে তড়িৎবাবুর সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সরকার বিরোধী আন্দোলনে তড়িৎবাবু আপত্তি করায় সাধারণ সভা ডেকে তড়িৎবাবুকে সভাপতির আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তিন বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলে সমস্ত অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী পদে নিযুক্ত করার দাবী আদায় হয়। এই ঘটনায় অজয় বিশ্বাসের উপর কর্মীদের আস্থা বেড়ে গেল।

১৯৬৭ সালে ত্রিপুরা মোটর-শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শচীন্দ্র লাল সিংহ শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য লাগাতর ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রতিবাদে সভাপতির পদ

থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ১৪৪ ধারা জারি করে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করেন এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার আহ্বান জানান।

আলোচনা বৈঠকে মালিক পক্ষ কিছু দাবী মেনে নিলেও রাজ্যে শ্রম আইন না থাকার অজুহাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবী উপেক্ষিত হয়। ফলে লাগাতর আন্দোলন শুরু হয়। বহু শ্রমিক গ্রেপ্তার করেও আন্দোলন বন্ধ করতে না পারায় সরকার শ্রমিকদের সব দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এরপরই জনগণের মূল দাবী খাদ্য সংকট থেকে ত্রাণের ব্যবস্থা করার জন্য সর্বদলীয় খাদ্য ত্রাণ কমিটির সমর্থনে অজয় বিশ্বাস ও ভবেশ দাশ কর্মচারীদের এক কনভেনশন ডাকেন। ২২টা কর্মচারী সংগঠন এই ডাকে সারা দিয়ে শিশু উদ্যানে মিলিত হয়। বিশাল মিছিল সারা শহর ঘুরে সাধারণ মানুষের খাদ্যের দাবীকে জরুরী ভিত্তিতে মোকাবেলা করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়। দপ্তরভিত্তিক, পেশাভিত্তিক সংগঠন তৈরী করে ফুড কনভেনশন করা হয়। দপ্তরভিত্তিক সংগঠনগুলো এই কনভেনশনে যোগ দিলেও সরকারী কর্মচারীদের মূল সংগঠন টি জি ই এ যোগ দেয়নি। অজুহাত ছিল শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মচারীরা মিছিল করতে প্রস্তুত নয়। ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী ও শ্রমিক খাদ্যের দাবীতে রাস্তায় ঐক্যবদ্ধ মিছিল ও পরে শিশু উদ্যানে মিলিত হয়ে সভা করায় সরকার ঘাবড়ে গেল। কিন্তু কর্মচারীরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রূপ দেখে দারুণ উৎসাহিত হ'ল।

নৃপেনবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরে অজয় বিশ্বাসকে সমর্থন জানালেন। প্রথমে মজবুত গণ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তারপর পার্টির নীতি ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হবে। ১৯৫৬ সালের পর ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির কোন সম্মেলন হয়নি ১১ বছর ধরে। কাজেই ১৯৬৭ সালে রাজ্য সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের নানা সমস্যার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। কর্মচারীদের সাধারণ দাবীর পাশে প্রতিটি সংগঠনের নিজস্ব দাবী যুক্ত করে দাবীসনদ তৈরী করা হয়। অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আবেদন নিবেদনের পরিবর্তে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে ভবেশ দাসকে সভাপতি এবং অজয় বিশ্বাসকে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়।

রাজ্যব্যাপী ব্যাপক কর্মচারী আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে শিক্ষক-কর্মচারী ও শ্রমিক সংগঠনকে একটি মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য স্থির করা হয়। কারণ প্রশাসনকে অচল করে দেবার শক্তি অর্জন করতে না পারলে সরকারী দমননীতির মোকাবেলা করা যাবে না।

এই প্রশ্নে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। এতকাল যাবত রাজ্যে মাত্র তিনটি সংগঠন ছিল। সরকারী শিক্ষক সমিতি, বেসরকারী শিক্ষক সমিতি এবং সরকারী কর্মচারী সমিতি।

প্রতিটি দপ্তরে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন গড়ে উঠার ফলে সরকারী কর্মচারী সমিতি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এরকম একটি দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হয়। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা শক্তিশালী পৃথক সংগঠন গড়ে তুলে। বিদ্যুৎ কর্মীদের পৃথক সংগঠন হয়, এরকম তেরটা সংগঠন শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় কমিটি গঠনে এগিয়ে আসে। কিন্তু সরকারী কর্মচারী সমিতি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অফিস কর্মচারীদের পক্ষে যে কোন দাবী নিয়ে মিছিল মিটিং করা বা ধর্মঘট করা সম্ভব নয় বলে যুক্তি দেখানো হয়।

ঠিক এই সময় কল্যানপুরের ঘটনায় সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে শিক্ষক কর্মচারীরা ব্যাপক আন্দোলনে সামিল হয়ে দ্রুত সাফল্য লাভ করে। শচীন্দ্র লাল সিংহ বহু শিক্ষক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করে আন্দোলন দমন করতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়েছে বিপরীত। বহু কংগ্রেস অনুগামী শিক্ষক কর্মচারী কংগ্রেস শিবির ত্যাগ করে জঙ্গী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনের পেছনে সুখময় সেনগুপ্তেরও পূর্ণ সমর্থন ছিল। তখন তিনিও কংগ্রেস বিরোধী যুক্তফ্রন্টের নেতা।

সমন্বয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ত্রিপুরায় কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে যুক্ত করার ফলে মতভেদ সৃষ্টি হয়। বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সমন্বয় কমিটি পর পর কয়েকটি বড় বড় আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করার ফলে সাময়িক ঐক্য সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত সমন্বয় কমিটিতেও বিভাজন ঘটে। অবশ্য এর জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই প্রধানতঃ দায়ী।

মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের গোঁড়ামীর জন্যই কল্যানপুরের একটি স্কুলের শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকদের সামান্য একটি অভিযোগ মীমাংসার চেষ্টা না করে কঠোর দমননীতি চালানোর ফলে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কল্যানপুরের ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে একজনও কমিউনিষ্ট ছিল না। কিন্তু দমননীতির ফলে বহু কংগ্রেস কর্মী কমিউনিষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনার পর ১৯৭৪ এবং ১৯৭৫ সালে কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার দাবীকে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত কোন রকম আলোচনায় রাজী না হয়ে কঠোর দমননীতি চালিয়ে ত্রিপুরায় শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলন চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দেবার আশায় বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারী নেতাদের গ্রেপ্তার করেন এবং জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে ৫৫জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয় এবং আরও ৮৫জন কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় গোপনে গোপনে কর্মচারী সংগঠন আরও মজবুত হয়। কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভাজন প্রক্রিয়া জোরদার হয়। যার ফলে জরুরী অবস্থা তুলে নেবার পরই সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষক-কর্মচারীদের বহু দাবী পূরণ করা হয়। কিন্তু মতাদর্শগত সংঘাত বৃদ্ধি পায়। একটি রাজনৈতিক দলের নির্দেশ মেনে চলতে অনেকেই প্রস্তুত ছিল না। প্রতিটি কর্মচারী সংগঠনে এ বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।

সংগঠনের নেতা কে হবেন এবং কোন কোন দাবীতে আন্দোলন হবে বা কবে কিভাবে সংগঠনের সম্মেলন হবে তা নির্ধারণের ক্ষমতা সংগঠনের নেতাদের ছিল না। ফলে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হতে থাকে। ১৯৯২-৯৩ সালে সমন্বয় কমিটি এবং ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতিরও বিভাজন ঘটে।

অন্যদিকে কংগ্রেস অনুগামী শিক্ষক কর্মচারীরাও রাজনৈতিক সংঘাতের শিকার হয়ে বার বার ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নতুন নতুন সংগঠন গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এক সময় যারা সমন্বয়ের বিরোধীতা করেছিলেন তারাই সমন্বয়ের বিশাল সাংগঠনিক শক্তির মোকাবেলা করার জন্য **শিক্ষক-কর্মচারী ফেডারেশান** গঠন করেন। কিন্তু তাও বেশীদিন ঐক্যবদ্ধ থাকতে

পারেনি। কংগ্রেস দলের প্রতিটি বিভাজন প্রক্রিয়া শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনেও বিভাজন সৃষ্টি করেছে।

১৯৭৭ সালের ৮ অক্টোবর তুলসীবতী স্কুলে এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে ১০টি কর্মচারী সংগঠন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যুক্ত আন্দোলন কমিটি নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলেন। রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে নেতৃত্ব দেন বীর বল্লভ সাহা, ননী গোপাল সাহা, নির্মল দেব, সুধীর মুখার্জী, স্বপন দেব, শ্যামসুন্দর ভৌমিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই কমিটি দীর্ঘ স্থায়ী হয়নি।

১৯৬৬ সালে সরকারী কর্মচারী সমিতি ভেঙ্গে নতুন সংগঠন সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছেন কানন বিহারী গোস্বামী, শিবেন্দ্র ভট্টাচার্য, নেপাল সেন চৌধুরী, মানিক দেব, বীর বল্লভ সাহা, শিশিরেন্দ্র সাহা, বীশ্বেশ্বর সেন, সাধন সিংহ প্রমুখরা।

কংগ্রেস দলের কোন্দলেব ফলে এই সব সংগঠন চারবার ভেঙ্গেছে। নতুন জোট গড়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বার বার নানা ধরনের বাধা এসেছে।

১৯৮৫ সালে অবাম সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী মোর্চা নাম দিয়ে সমন্বয়ের পাল্টা সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এই মোর্চা মহার্ঘ ভাতার দাবীতে কয়েকটা বড় বড় মিছিল-মিটিং সংগঠিত করে সারা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অজয় বিশ্বাসও মহার্ঘ ভাতার দাবীকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস ও যুব সমিতির জোট সরকার গঠনে শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী মোর্চার বিরাট অবদান ছিল। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার শিক্ষক কর্মচারীদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবী পূরণ করেছিলেন। তৃতীয় বেতন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী সুধীর মজুমদার আর্থিক দায় বহনের অনুমোদন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছ থেকে আদায় করেন।

অবাম শ্রমিক-শিক্ষক কর্মচারী মোর্চার নেতৃত্ব দেন ধীরেশ দত্ত, মানিক দেব, শচীন নাথ ও সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হবার পর এই মোর্চাতেও ভাঙ্গন ধরে। ফলে কর্মচারী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৯৯৩ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর বামপন্থী কর্মচারী সংগঠনগুলোতেও ভাঙ্গন শুরু হয়। হরিগঙ্গা বসাক রোডের অফিস থেকে সরকার অনুগামী শিক্ষক-কর্মচারীদের যেসব নতুন সংগঠন পরিচালনা করা হয় তারা হগব পন্থী বলে নিজেদের পরিচয় দেন। এসব সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন-- ভুবণেশ্বর দে, সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,দিলীপ দাস, অশেষ দেব রায়, মধু সেনগুপ্ত প্রমুখরা।

শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনে এসব বিভাজনের ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলন খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশের পরিস্থিতি যখন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জরুরী প্রয়োজনীয়তা দাবী করছে তখন সব মতভেদ ভুলে শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিভাবে ঐক্যমঞ্চ গড়ে তোলা যায় তার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে হবে।

<u>ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারী সংগঠনে বিভাজন প্রক্রিয়ার চিত্রটি নিম্নরূপ ঃ-</u>

	প্রতিষ্ঠা বছর
ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি	১৯৪৭
ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন	১৯৬৬
ত্রিপুরা শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় কমিটি	১৯৬৮
ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক-কর্মচারী যুক্ত আন্দোলন কমিটি	১৯৭৭
ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতি	১৯৮১
ত্রিপুরা শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারী মোর্চা	১৯৮৫
ত্রিপুরা সরকারী শিক্ষক সমিতি (হ্গব)	১৯৯৩
ত্রিপুরা শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (হ্গব)	১৯৯৩

ত্রিপুরার ৫০টি কর্মচারী সংগঠন অবাম-বাম ও হ্গব পন্থী মোর্চায় বিভক্ত হয়ে আছে। অথচ কেন্দ্রে অবাম ও বাম জোটের সরকার গড়ে উঠেছে। তার প্রভাবে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে উঠলে সুস্থ আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। ত্রিপুরায় জঙ্গী শ্রমিক-কর্মচারী ও শিক্ষক আন্দোলনের ফলে শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারীরা শুধু বেতন কাঠামোরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাননি, সামাজিক মর্যাদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

কংগ্রেস শাসনের ত্রিশ বছর যাবত শিক্ষক-কর্মচারী ও শ্রমিকদের সঙ্গে মন্ত্রী ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা অত্যন্ত অমর্যাদাকর ব্যবহার করতেন। অনেকে অধীনস্থ কর্মচারীদের বাড়ীর গৃহভৃত্যের মতো গণ্য করতেন।

সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে মন্ত্রী ও আমলাদের সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয় শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারীদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া ক্ষমতার আসনে টিকেঁ থাকা যায় না এই শিক্ষাও রাজনৈতিক নেতারা পেয়েছেন। তাই সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কর্মচারী মোর্চা। শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারী আন্দোলনেও সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীলতা। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পক্ষেও এখন আর শ্রমিক-শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও মর্যাদাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

আন্দোলনের ফলে বেতন হার পরিবর্তনের ধারা লক্ষণীয়

প্রাথমিক শিক্ষক ও সম পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন কাঠামো

কংগ্রেস শাসনকালের বেতন কাঠামো			বামফ্রন্ট আমলে	
১৯৪৭-৫৮	**১৯৫৯-৬১**	**১৯৬২-৭৪**	**১৯৭৫-৮১**	**১৯৮২-৮৭**
১৫-৩০ টাকা	**৫৫-১৩০**	**১২৬-২০০**	**২৪০-৪৪০**	**৪৩০-৮৫০**

স্নাতক শিক্ষক ও সম পর্যায়ের কর্মচারীদের বেতন হার

কংগ্রেস শাসনের সময়			বামফ্রন্ট আমলে	
১৯৪৭-৫৮	**১৯৫৯-৬১**	**১৯৬১-৭৪**	**১৯৭৫-৮১**	**১৯৮২-৮৭**
৩০-৫০	**১০০-১৬০**	**১৭৫-৩২৫**	**৩২৫-৬৬৫**	**৫৬০-১৩০০**

ইতিমধ্যে অনেক নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হযেছে। উর্দ্ধতন কর্মচাবীব সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেযেছে। সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ বেতনেব পার্থক্যও বিবাট বৈষম্যেব সৃষ্টি কবেছে। প্রশাসন সংস্কাবেব নামে বিপুল পবিমাণে মাথাভাবী প্রশাসন সৃষ্টি হযে চলেছে।

তৃতীয ও চতুর্থ বেতন কমিশনেব সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বেতন হাব লক্ষ্য কবলেই বিষযটা পবিষ্কাব হবে।

	তৃতীয় বেতন কমিশন (১৯৮৮)	**চতুর্থ বেতন কমিশন (১৯৯৬)**
সর্ব নিম্ন বেতনেব হাব ঃ-	৭৭৫-১১৩০	২৫৫০-৩৫৪০
সর্বোচ্চ বেতন হাব ঃ-	৫৯০০-৬৭০০	১৮৪০০-২২৪০০

বেতন হাবেব সংখ্যাও বাডছে। তৃতীয কমিশনেব সময ছিল ১৯টি, চতুর্থ কমিশনেব বেতন হাব হযেছে ২৫টি।

শিক্ষকদেব জন্য গ্রেডেশান এবং কর্মচাবীদেব জন্য ক্যাডাব স্কেল চালু হওযায প্রতিবাব ফিক্সেশেনেব সময কযেকটি কবে স্কেল অতিক্রম কবা যাচ্ছে। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য বাডছে । অসন্তোষও বাডছে । ভাবতে বেতন হাব নির্মানেব ক্ষেত্রে বিশ্বাযনেব প্রভাবও পডছে । বিশ্বব্যাংক বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি কবছে ।

ভবেশ দাস

পবেশ বিশ্বাস

জ্ঞানানন্দ বায

শিবেশ বিশ্বাস

দিলীপ দাস

অশেষ দেবরায়

ভুবনেশ্বর দে

সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরায় কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব

সুকোমল সেন

অষ্টম অধ্যায়

ত্রিপুরায় শ্রমিক আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ত্রিপুরায় শ্রমিক আন্দোলনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাজন্য যুগের একমাত্র শিল্প চা-বাগানগুলো গড়ে উঠেছিল ১৯১৬ সাল থেকে। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য চা-শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চা-শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। রাজ্যের আয় বৃদ্ধির পক্ষে চা-শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিতে পারে এই উপলব্ধি থেকে চা-বাগান স্থাপনের জন্য বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকদের উৎসাহিত করেন।

ত্রিপুরা গেজেট নোটিফিকেশন থেকে জানা গেছে যে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য চা-বাগানের জন্য বিশেষ আইন তৈরী করেছিলেন যাতে ইংরেজ বা অন্য বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ রাজ্যে বাগান করার সুযোগ না পায়। কারণ আসাম ও পশ্চিম বাংলার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যেখানে যেখানে চা-বাগান করা সম্ভব ঐ সব জঙ্গল এলাকা বৃটিশ ব্যবসায়ীরা আগেই দখল করে নিয়েছে। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যারা চা-বাগান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তারা জমির অভাবে পিছু হটেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ত্রিপুরার মহারাজার কাছে চা-বাগান করার ইচ্ছা জানিয়ে আবেদন করেছেন।

ত্রিপুরায় গভীর জঙ্গল সাফ করে বাগান করার প্রধান বাধা ছিল শ্রমিক সমস্যা। ত্রিপুরার কোন উপজাতি বা বাঙ্গালী চা-বাগানে কাজ করতে রাজী ছিল না। অন্য রাজ্য থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে এনে বাগান চালু করা হয়। ক্রমে ক্রমে ৫০টি চা-বগান গড়ে উঠে।

১৯৪৭ সালের আগে ত্রিপুরায় চা-শ্রমিকদের বলা হত কুলি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও চা-বাগানের শ্রমিকদের কুলি বলা হত। তাদের কাজ ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগান সাফ করা এবং চা-পাতা সংগ্রহ করা। বাগানের মালিকরা তাদের ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করতো। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কথা বলার জন্য কেউ ছিল না। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন আইন ও ছিল না।

ভারতে রাজনৈতিক দল সৃষ্টি হবার আগেই শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। তখন শ্রমিক বলতে কলে-কারখানায়-খনি বন্দরে ও রেলে যারা কাজ করতো তাদেরই শ্রমিক বলা হত। ভারতের বিভিন্ন কারখানায় বন্দরে ও খনিতে ইংরেজ মালিকরা শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালাতো। সে যুগের শ্রমিকরা ছিল গ্রামের নিঃস্ব ভূমিহীন, নিরক্ষর, অসহায় কৃষকদের একটা অংশ। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস তাদের ছিল না। তবুও মাঝে মাঝে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ, বিদ্রোহ দেখা দিত শ্রমিকদের মধ্যে। কঠোরভাবে দমন করা হতো এসব বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কংগ্রেস দলের বামপন্থী নেতারা শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একটি সংগঠন গড়ার জন্য উদ্যোগী হলেন। ইউরোপে এবং আমেরিকায় তখন শুরু হয়েছিল

শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার। রাশিয়ায় বিপ্লবী শ্রমিকরা ক্ষমতায় দখল করে সৃষ্টি করল একটা শ্রমিক রাষ্ট্র। ইউরোপেও বেশ কয়েকটা দেশে শ্রমিক দলগুলো ক্ষতায় প্রতিষ্ঠিত হল। ভারতের রাজনীতিতে তারই স্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল।

১৯২০ সালের ৩১ শে অক্টোবর বোম্বাই শহরে ভারতের প্রথম শ্রমিক সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-- (এ আই টি ইউ সি) গঠন করা হয়। দেশের ৬৪টি ইউনিয়নের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার শ্রমিক সদস্যের এই প্রথম সম্মেলন বৃটিশ সরকারকে আতংকিত করে তুলেছিল। কারণ ইউরোপে তখন চলছে শ্রমিক বিপ্লবের যুগ।

এ আই টি ইউ সি-র প্রথম সভাপতি হন লালা লাজপত রায। তারপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ভি ভি গিরি, জহরলাল নেহেরু এবং সুভাষ চন্দ্র বসু এই সংগঠনের সভাপতি হন।

শ্রমিকদের একটি শ্রেণী হিসেবে গণ্য করা, সারা দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ একটি সংগঠনে যুক্ত করা এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী আইন তৈরী করার দাবী করা, এসবই ছিল প্রথম শ্রমিক সম্মেলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।

শ্রমিক আন্দোলনের চাপে অচিরেই কয়েকটি শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার উপযোগী আইন পাস করা হয়। **১৯২২ সালে পাস হয় কারখানা আইন ১৯২২ (The Factory-Act 1922)**
১৯২৩ সালে পাস হয় - শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন -১৯২৩ এবং ভারতীয় খনি আইন - ১৯২৩
১৯২৫ সালে পাস হয় - ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন - ১৯২৬

এই আইন পাশ হবার আগে শ্রমিকদের ধর্মঘটকে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র নাম দিয়ে দমন করা হতো। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এরূপ দমননীতির প্রতিবাদ করে এবং ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস করার দাবী জানায়।

শ্রমিকদের প্রধান দাবীগুলো ছিল ঃ--

১) আট ঘন্টার কাজ আইনসঙ্গত করতে হবে।
২) নিম্নতম মজুরী আইন পাশ করতে হবে।
৩) রেলের চাকুরীকে ভারতীয়করণ করতে হবে।
৪) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্যবীমা করতে হবে।
৫) মহিলা শ্রমিকদের প্রসূতিকালীণ ছুটি দিতে হবে।
৬) শ্রমিকদের জন্য বার্ধক্য ভাতা দিতে হবে।
৭) শ্রমিকদের বাৎসরিক বোনাস দিতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষদিন পর্যন্তও এসব দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরায় এসব আন্দোলনের সুযোগ ছিল না। প্রকৃত পক্ষে আইনের দৃষ্টিতে এ রাজ্যে কোন শ্রমিকও ছিল না।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর ভারতীয় শ্রমিক আইন ত্রিপুরাতেও প্রযোজ্য হয়েছে। ফলে শ্রমিক আন্দোলনেরও সূত্রপাত হয়েছে ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শ্রমিক সংগঠনে তিনবার ভাঙ্গন ধরেছিল। একটি কারখানায়

একটি মাত্র ইউনিয়ন গঠন করে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এ আই টি ইউ সি।

কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংঘাত ও তীব্র মতভেদ সৃষ্টি হওয়ায় বহু কারখানায় এই নীতি কার্যকর করা যায়নি।

শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি গান্ধীজীর আন্তরিক সমর্থন ছিল না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত ভারতীয় শিল্পপতির সমর্থন না পেলে স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শ্রমিক আন্দোলন ভারতীয় শিল্পপতিদের শত্রু শিবিরে ঠেলে দেবে।

অন্যদিকে বামপন্থী কংগ্রেস নেতারা মনে করতেন ভারতের অধিকাংশ শিল্পপতি হল ইংরেজ। শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী না হলে শ্রমিকদের উপর শোষণ ও নির্যাতন বেড়ে যাবে তাতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বেশী ক্ষতি হবে। কমিউনিষ্ট নেতারাও বামপন্থী কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে মিলে শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ফলে ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাটাই শুরু হয়। মজুরীও কমানো হয়; অর্থনৈতিক মন্দার অজুহাতে শ্রমিকদের বহু আইনসঙ্গত সুযোগ সুবিধা বাতিল করা হয়। এর ফলে সারা দেশে শ্রমিক অসন্তোষ তীব্র রূপ নিতে থাকে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বহু যুবক শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে। প্রতিটি কারখানায় শ্রমিক আন্দোলনের নতুন যুগ সৃষ্টি হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবীতে সাড়া দিয়ে ইতিপূর্বে আলাদা হয়ে যাওয়া দুটি শ্রমিক সংগঠন -- একটি কংগ্রেস প্রভাবিত - ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন - অন্যটি হল হঠকারী অতি বামপন্থী -- রেড ট্রেড ইউনিয়ন, আবার এ আই টি ইউ সি সংগঠনে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করে।

ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা হবার পর প্রতিটি রাজনৈতিক দল আলাদা আলাদা শ্রমিক সংগঠন গড়তে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস দলের অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন আই এন টি ইউ সি গঠিত হয়। এ আই টি ইউ সি'র নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন কমিউনিষ্ট নেতারা।

ত্রিপুরায় ১৯৪৬ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় কংগ্রেস দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ত্রিপুরায় কিছুসংখ্যক ড্রাইভার ছাঁটাই হবার ফলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কংগ্রেস নেতা তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত এবং সুখময় সেনগুপ্ত ছাঁটাই ড্রাইভারদের নিয়ে তখনকার জনপ্রিয় রাজকর্মচারী ব্রাউন সাহেবের কাছে এক ডেপুটেশান দেন। ব্রাউন সাহেব ১২জন ছাঁটাই ড্রাইবারকে কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে একটা মীমাংসা করে দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আগরতলা ও আখাউড়া রাস্তা তৈরী হয় এবং কয়েকটি যাত্রীবাহী বাস ও ট্রাক চলাচল শুরু হয়। তখন রাজ্যের আর কোথাও যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ছিল না। যুদ্ধের সময় সামরিক প্রয়োজনে যাদের চাকুরী হয়েছিল যুদ্ধের শেষে তাদের অধিকাংশই চাকুরী থেকে ছাঁটাই হয়ে যায়। বিকল্প কাজের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

চা-বাগানে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল পায়ে হেঁটে পথ চলা। কোন কোন এলাকায় গরুর গাড়ী চলাচল শুরু হয়েছিল। ভারতভুক্তির আগে ত্রিপুরায় প্রকৃত পক্ষে কোন শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠেনি।

চা শ্রমিকদের আন্দোলন

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় চা শ্রমিকদের জীবন ছিল ক্রীতদাসের মত। শ্রমিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতিও ছিল না। তাদের বলা হত চা-বাগানের কুলি।

স্বাধীন ভারতে কুলি শব্দটির ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। চা-বাগানের কুলিরা শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ফলে ভারতীয় শ্রম আইনের আওতায় আসে চা-বাগানগুলো।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় কোন শ্রম দপ্তর ছিলনা। কোন লেবার অফিসারও ছিলনা। চা-বাগানের আভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে মহারাজারা কখনো হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। বার্ষিক রাজস্ব আদায় করেই নিশ্চিন্ত থাকতেন। চা-বাগানে সংকট দেখা দিলে রাজস্ব মকুপের কোন আবেদন মঞ্জুর করা হত না। বকেয়া পরিশোধ করার জন্য প্রয়োজনে এক বছর পর্যন্ত বাড়তি সময় মঞ্জুর করা হতো।

১৯৪৭ সালের ১৭ই মে মহারাজা বীরবিক্রমের অকাল মৃত্যুর পব মহারাজার ইচ্ছা অনুযায়ী ত্রিপুরা ভারতভুক্তির আবেদন জানায়। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার একজন উচ্চ পদস্থ আই সি এস অফিসারকে ত্রিপুরার দেওয়ান নিযুক্ত করে পাঠায়। ত্রিপুরার চা-বাগানে এই সময় সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। দেশ বিভাগের ফলে বহু বাগানের মালিক বাগান বিক্রী করে রাজ্য থেকে চলে গিয়েছিল। ত্রিপুরায় আগে থেকেই ব্রিটিশ আইন প্রচলিত থাকায় প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনায় ভারত সরকারের রীতি নীতি প্রয়োগে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি।

এই সময় ত্রিপুরা সহ সারা ভারতের সব চা-বাগানেই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। চা বিক্রীর বাজার না থাকায় বাগানের শ্রমিকদের বেতন দেওয়া বন্ধ হতে থাকে। খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারন করে। বহু মালিক শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নিজেদের ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখে।

আসাম প্রদেশ জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শে ত্রিপুরার কংগ্রেস নেতারা চা-বাগানে সংগঠন গড়ার জন্য উদ্যোগী হন। শচীন্দ্র লাল সিংহ-সুখময় সেনগুপ্ত, তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে বিভিন্ন চা-বাগানে ঘুরে ঘুরে শ্রমিকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। বাগানের মালিকও ম্যানেজারদের সঙ্গে আলোচনা করে-- শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার জন্য অনেক মামলা করা হয়। মালিকরা মামলা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য উকীল নিযুক্ত করে। মামলা যত দেরী হবে ততই সুদ মালিকের ঘরে আসবে।

চা-বাগানের শ্রমিকরা নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেত। কারণ তাদের সমস্যা প্রকাশ করলে বাগান কর্তৃপক্ষ কঠোর শাস্তি দিত। নেতারা বছরে দু'য়েকবার মাত্র বাগানে যেতেন। তারপর যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা থাকতো না। খোয়াই বিভাগে যদুপ্রসন্ন ভট্টাচার্য কয়েকটি বাগানে সংগঠন গড়ে তুলেন।

রাজ্যের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে কংগ্রেস দলের কর্মী সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। চা-বাগানে সর্বক্ষণের কর্মী নিযুক্ত করা সম্ভব ছিল না।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টিও প্রকাশ্যে সংগঠন গড়ার অবস্থায় ছিল না। কমিউনিষ্ট পার্টিতেও বাঙ্গালী কর্মীর সংখ্যা ছিল নগণ্য।

১৯৪৭ সালে লক্ষ্মী লুঙ্গা চা-বাগানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজে যোগ দেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি কোলকাতায় কংগ্রেস দলের শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই শ্রম আইন এবং শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

লক্ষ্মী লুঙ্গা বাগানের ম্যানেজার নিকট আত্মীয় হওয়ায় প্রথমদিকে অমরেন্দ্রবাবু অবাধে কাজকর্ম করার সুযোগ পান।

সে সময় চা-শ্রমিকদের যে বস্তি ছিল তাকে প্রায় নরককুন্ডই বলা যায়। নিরক্ষর শ্রমিকরা ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ। বিহার-উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ-মধ্যপ্রদেশ-পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের চা-বাগানগুলো থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করা হতো। ত্রিপরার কোন শ্রমিকই চা-বাগানে ছিল না।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে আসাম ও কাছাড়ের বহু চা-শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছিল। অনেকে বন্দী হয়েছিল। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোব মাণিক্য রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্টের সাহায্যে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বন্দী সব চা-শ্রমিকদের ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ী পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেন। বহু শ্রমিক এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে ত্রিপুরার চা-বাগানে কাজ করতে রাজী হয়। চা-বাগানের কাছাকাছি জমি বরাদ্দ করে শ্রমিকদের জন্য বসতি গড়ে তোলা হয়। এভাবে ত্রিপুরায় সাঁওতাল, মুন্ডা, ভিল, ওরাং, ভুটিয়া ইত্যাদি বহিরাগত জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এরাও পরবর্তীকালে ত্রিপুরার উপজাতি তালিকায় স্থান পেয়ে যায়। এসব শ্রমিকরা বাগানের বস্তিতে আসতো না। অবসর সময়ে চাষবাসও করতো।

ক্রমে ক্রমে বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নতুন নতুন শ্রমিক আমদানী করতে হয়েছে। তাদের জন্য বাগানেই বস্তি স্থাপন করতে হয়েছে। ছন-বাঁশের তৈরী ছোট ছোট ঘরে এক একটি শ্রমিক পরিবারকে একটি ঘরে বসবাসের জন্য দেওয়া হতো। স্থায়ী পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। পানীয় জলেরও সুব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষা বা চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বাজার এবং জনবসতি ছিল বাগান থেকে অনেক দূরে। সপ্তাহে একদিন পাঁচদিনের মজুরী দেওয়া হতো। দুদিনের মজুরী আটকে রাখা হত। কারণ বহু শ্রমিক সুযোগ পেলেই বাগান থেকে পালিয়ে যেত।

নানা অজুহাতে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করা হতো। কারণ ম্যানেজারবাবুরা বিশ্বাস করতেন কড়া শাসনে রাখলে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং শ্রমিকরা কাজে ফাঁকিদিতে সাহস পায় না।

ত্রিপুরা ছিল ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকা। চা-বাগানের প্রায়সব শ্রমিকই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হতো। খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেও ছুটির কোন ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণ অসুখে পড়ে কাজে না এলে শাস্তি দেওয়া হতো। বেশী অসুস্থ হয়ে কাজ বন্ধ করলে বেতন কাটা হতো। অথচ চিকিৎসার কোন সুযোগ পাওয়া যেত না। বাবুরা অসুস্থ হয়ে আগরতলায় এসে চিকিৎসা করাতেন। অবশ্য

আগরতলায়ও তখন পর্যন্ত চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ছিল না।

চা-শ্রমিকদের বেতন এত কম ছিল যে, সেকালে সস্তা দামের পণ্য দ্রব্য কিনে খাওয়া ও সম্ভব হত না। শ্রমিকরা বনের শাক-সব্জি ফলমূল সংগ্রহ করে সংসাব চালাতো। জ্বালানী কাঠও বন থেকে সংগ্রহ করত। চরম দারিদ্র্যের জ্বালা ভুলে থাকার জন্য সন্ধ্যার পর সপরিবারে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে থাকতো। চারদিকে ছিল নোংরা পরিবেশ। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে কোন কান্ডজ্ঞান ছিল না।

অন্যদিকে মালিক ও ম্যানেজারদের জন্য ছিল সুদৃশ্য বাংলোবাড়ী। মাঝে মাঝে অতিথিরা আসতেন। তাদের জন্য ছিল সুন্দর অতিথিশালা। শ্রমিকদের যুবতী মেয়েদের ধরে আনা হতো বাবুদের ভোগ ও মনোরঞ্জনের জন্য। বাংলো বাড়ী পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ঝি-চাকরের কাজ করার জন্যও তাদের ব্যবহার করা হতো। বহিরাগত কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা এবং বাগানের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা নিষিদ্ধ ছিল।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ট্রেড ইউনিয়নে কিছুকাল কাজ করেছেন এবং আগরতলায় এসে ক্ষীরোদ সেনের মত সর্বত্যাগী গান্ধীবাদী নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থেকেছেন। কাজেই তিনি চা-শ্রমিকদের দুর্দশা দূর করার জন্য উদ্যোগী হলেন। শ্রমিকদের অবস্থা ভালভাবে জানার জন্য শ্রমিক বস্তিতে গেলে কেউ কোন কথা বলতো না। ম্যানেজারের আত্মীয় হবার ফলে সবাই ভয় করতো।

শ্রমিকদের মনের ভয় দূর করার জন্য প্রথমেই দরকার শিক্ষা। অমরেন্দ্রবাবু শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন। ম্যানেজার এটা পছন্দ করলেন না। অমরেন্দ্রবাবুকে ডেকে নিয়ে সাবধান করে দিলেন। অনেকটা উপদেশের সুরে বললেন কুলিদের শিক্ষা দিলে ওরা বাগানে কাজ করবে না।

কিন্তু অমরেন্দ্রবাবু ম্যানেজারের উপদেশ মানতে পারলেন না। শ্রমিকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ম্যানেজারের কাছে আবেদনপত্র জমা দিলেন। শ্রমিকদের শিক্ষা দিলে বাগানে শৃংঙ্খলার উন্নতি হবে - চা উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে বলে যুক্তি দেখালেন। একটি প্রাথমিক স্কুল খোলার দাবী জানালেন।

ম্যানেজারবাবু জবাব দিলেন-- ত্রিপুরার কোন বাগানেই শ্রমিকদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। এককভাবে এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। মালিক পক্ষের কাছে বিষয়টা পেশ করা হল।

এই ব্যাপারে বস্তির সব শ্রমিকরাই ঐক্যবদ্ধ হল। সকলেই অমবেন্দ্রবাবুর নেতৃত্ব মেনে নিল। শুরু হল ত্রিপরায় চা-শ্রমিকদের আন্দোলন। অমরেন্দ্রবাবুকে বাগানের চাকুরী ছাড়তে হল। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে **ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন** -গঠন করা হল। ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি করা হয় বাগানের ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক-জয়রাম কন্দকে এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।

বাগানে চাকুরী না থাকলে বাগানে বসবাস করা যায় না। ফলে অমরেন্দ্রবাবু আগরতলায় এসে একটি ছোট্ট অফিস ভাড়া করলেন। একটি সাইকেল কিনে প্রতিদিন বিভিন্ন বাগানে ঘুরে ঘুরে চা-মজদুর ইউনিয়নের শাখা সংগঠন গড়ে তুলতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে যাবার ফলে এবং মহারাজার অকাল মৃত্যুর ফলে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ায় ত্রিপুরার সব কয়টি চা-বাগানের মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গীও বদলে গেল। অনেকে কংগ্রেসে যোগ দিলেন আবার অনেকে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্টতা স্থাপন করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিছু কিছু চা-বাগানে প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চাকুরী নিয়ে কাজে যোগ দিলেন। তারাও শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ার কাজে আন্তরিকভাবে সাহায্য করলেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকাংশ চা-বাগানে ত্রিপুরা-চা-মজদুর ইউনিয়নের-সংগঠন গড়ে উঠলো।

১৯৪৯ সালে লক্ষ্মী লুঙ্গা বাগানে চা-শ্রমিকদের জন্য আদর্শ পাঠশালা নামে প্রথম একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। অমরেন্দ্রবাবু কিছুদিন মাসিক ৩০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করেন। স্কুল কমিটির প্রথম সভাপতি ও ছিলেন তিনি। সম্পাদক ছিলেন বামুটিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্র চন্দ্র পাল। অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটির দায়িত্ব গ্রহণ করে ত্রিপুরা সরকার।

ইউনিয়নের প্রথম কাজ হল শ্রমিকদের মদ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা, নিজেদের মজুরীর হিসেব যাতে নিজেরা বুঝে নিতে পারে তার জন্য শিক্ষিত করে তোলা।

কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা বোনাস আদায় করাই হল ইউনিয়নের প্রথম সাফল্য। কিন্তু আনন্দে মাতোয়ারা শ্রমিকরা মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল বোনাসের টাকা। এ জনাই শ্রমিকদের নিয়ে মদ বিরোধী কমিটি গঠন করতে হয়। মাতাল শ্রমিকদের সব কাজে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে মদ খাওয়ার নেশা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে।

শ্রমিকদের দাবী দাওয়া নিয়ে আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে লড়াই শুরু করার জন্য ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রিও করার দরকার হল। অধিকাংশ বাগানে ইউনিয়নের শাখা কমিটি গড়ে উঠায় কাজকর্ম বেড়ে গেল। কাজেই নতুনভাবে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত হল। নতুন কমিটির সভাপতি হলেন কগ্রেস নেতা তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক হলেন-অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, সহ সম্পাদক হলেন নীরদ বরণ দাস। ৯জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হল। ক্ষীরোদ সেন, ত্রিপুর সেন ছিলেন ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা।

১৯৫০ সালে ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রি করা হল। ইউনিয়নের দাবী অনুযায়ী ত্রিপরা সরকারের সেক্রেটারী ননী কর্তা একজন লেবার অফিসার নিযুক্ত করলেন এবং শ্রম দপ্তর খোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রি হবার ফলে প্রতিটি বাগানে ম্যানেজারবাবুরা এবার সতর্ক হয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নতুন উৎসাহ। ত্রিপুরায় ট্রেড ইউনিয়ন করার মত কংগ্রেস কর্মী ছিল না। তাই বাগান থেকে উৎসাহী যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রতিটি বাগানে সভা করে শ্রমিকদের বুঝানো হল -- ইউনিয়ন কি এবং কেন তার প্রয়োজন। শ্রমিকদের যে কোন সমস্যা সমাধানের দাবীতে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার আইনসঙ্গত অধিকার আছে ইউনিয়নের। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়ার মীমাংসা করতে বাগানের কর্তৃপক্ষ

ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করতে বাধ্য। শ্রমিক আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, বাসস্থান,স্বাস্থ্য পরিষেবা-শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বাগানের মালিক আইনত বাধ্য।

এসব কথা শোনার পর শ্রমিকদের মধ্যে ভয়ভীতি কাটতে থাকে। পরবর্তী সভাগুলোতে উপস্থিতির সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ম্যানেজারবাবুরা ইউনিয়নকে দুর্বল করার জন্য নানা রকম প্রচেষ্টা শুরু করেন।

কৈলাসহর, ধর্মনগর, খোয়াই, কমলপুর ও সদর এই পাঁচটি মহকুমাতে অধিকাংশ বাগানেই অতিক্রত ত্রিপুরা চা-শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা সংগঠন গঠিত হয়। বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমায় অল্প কয়েকটি বাগান ছিল। পরবর্তী সময়ে সেগুলোতেও ইউনিয়ন গঠিত হয়।

আন্দামান ফেরত স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য চা-মজদুর ইউনিয়নে যোগ দেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সৎ এবং কর্তব্য পরায়ণ। তারই পরামর্শে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য-**কল্যাণ সমিতি**-গঠন করা হয়। খাদি কমিশনের সহযোগিতায় বাঁশ-বে ও অন্যান্য বনজ সম্পদ ব্যবহার করে নানা রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তৈরী ও বিক্রীর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। শ্রমিকরা অবসর সময়ে কাজ করে বাড়তি আয়ের সুযোগ পায়। প্রতিটি বাগানে এই ব্যবস্থা জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

ইউনিয়নের মুখপাত্র হিসেবে- অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায় **ভারত কল্যাণ**-নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। চা-মজদুরদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের আইনসঙ্গত পথ পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ত্রিপুরায় কংগ্রেস দল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রত্যেক বাগানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। কোথাও বগানে, কোথাও কাছাকাছি জনপদে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেধাবী ছাত্রদের জন্য নানা রকম স্টাইপেন্ড-এর ব্যবস্থা করে মাধ্যমিক স্তরের স্কুলে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ভারত কল্যাণ পত্রিকাটি আজও টিকে আছে। বর্তমান সম্পাদক হলেন নীরদ বরণ দাস।

কাছাড় থেকে চা-বাগানের নেতারা ত্রিপুরায় এসে চা-শ্রমিক আইন ও ইউনিয়নের অধিকার সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। ডি তেওয়ারী, মহীতোষ পুরকায়স্থ, জগন্নাথ সিং ও তারক দাস রায় কয়েকবারই ত্রিপুরায় এসেছেন। ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়নের কাজকর্মের রিপোর্ট পেয়ে দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতারাও খুব উৎসাহী হয়ে উঠেন। দিল্লী থেকে এক প্রতিনিধিদল এসে কয়েকটি বাগান পর্যবেক্ষণ করে কাজকর্মের সুবিধার জন্য ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়নকে একটি গাড়ী ও একটা ভাল অফিস ঘরের ব্যবস্থা করে দেন । সাইকেলে চড়ে এতগুলো বাগানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই সমস্যাটা কেন্দ্রীয় নেতারা উপলব্ধি করেন।

ইউনিয়ন পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের জন্য কোলকাতা ও দিল্লীতে লিডারশীপ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এবং নীরদ বরণ দাসকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে চার মাসের লিডারশীপ ট্রেনিং-এর জন্য ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়। নীরদ বরণ দাসকেও এশিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কলেজে এক বছরের ট্রেনিং-এ পাঠানো হয়।

এ রাজ্যের প্রথম শ্রমিক সংগঠন ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা বহু

জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত করেছে। শ্রকিমদের জন্য -- নিম্নতম মজুরী, নিয়মিত রেশন, বাৎসরিক বোনাস, স্থায়ী কাজের গ্যারান্টি, শিক্ষা, বাসস্থান এবং চিকিৎসার সুযোগ, দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ ইত্যাদি দাবী আদায় করা সম্ভব হয়েছে। কখনো আদালতে মামলা করে আবার কখনো ধর্মঘট করে এসব দাবী আদায় করা হয়েছে।

১৯৬৬ সালে কংগ্রেস দলের বিভাজন প্রক্রিয়ার প্রভাব শ্রমিক সংগঠনেও পড়েছে। ক্রমে ক্রমে নেতৃত্ব দখলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরের সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। শ্রমিক ইউনিয়নের সার্বিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়ন ছেড়ে চলে আসেন। শ্রমিকরা চোখের জলে নেতাকে বিদায় দেন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন । তিনি ছেড়ে আসার পর নীরদ বরণ দাসকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। তিনিও দীর্ঘ ত্রিশ বছরের বেশী সময় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। এখনো পর্যন্ত ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউয়িন - চা শ্রমিকদের অধিকাংশের মধ্যে আস্থা ও মর্যাদার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

চা-শ্রমিকদের দ্বিতীয় সংগঠনটি গড়ে উঠে ১৯৫৫ সালে বীরেন দত্তের নেতৃত্বে। **ত্রিপুরা টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের** অন্যান্য নেতারা ছিলেন -- পানু মজুমদার, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, ভানু ঘোষ, বৈদ্যনাথ মজুমদার, রঞ্জন রায় প্রমুখরা।

প্রকৃতপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার আগে চা-শ্রমিকদেব মধ্যে বামপন্থীদের প্রভাব ছিল খুবই কম। কারণ সব কয়টি বাগানেই কংগ্রেস দলের প্রভাবিত ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়নের মজবুত সংগঠন গড়ে উঠেছিল।. বাগানের মালিকদের সঙ্গেও কংগ্রেস নেতাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বীরেন দত্ত শ্রমমন্ত্রী হন। তখন থেকে শ্রমিক স্বার্থে সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করে চা-শ্রমিকদের আইনসঙ্গত দাবী দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে **ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন** -- গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে বামপন্থী ইউনিয়ন মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। এই সময় দুটি শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে বিভন্ন জায়গায় সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। অনেক সময় দুই ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবেও কাজ করেছে।

চা-শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়ে বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে যৌথ আন্দোলন সহায়ক হয়েছে।

সত্তরের দশকে ৭/৮টি চা-বাগান আর্থিক কারণে অচল হয়ে পড়ে। এসব বাগানে সমবায় গঠন করে বাগান চালু রাখার প্রস্তাব দেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। লেবার অফিসারকে আসামে পাঠিয়ে চা-শ্রমিকদের সমবায় গঠন সম্পর্কিত সমস্যা এবং তা সমাধানের উপায় জানার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তখন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার অচল বাগানগুলো অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী শ্রমমন্ত্রী বীরেন দত্তের সঙ্গে দেখা করে বাগানগুলি অধিগ্রহণ না করে শ্রমিকদের নিয়ে সমবায়

গঠন করে বাগান চালু করার প্রস্তাব দেন। শ্রমমন্ত্রী বীরেন দত্তের উদ্যোগে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় বিস্তৃত আলোচনার পর চা-বাগানে সমবায় সমিতি গঠন করে বাগান পরিচালনায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড় অঞ্চলে ছোট ছোট ব্যক্তি মালিকানায় চা-বাগান সাফল্য লাভ করেছে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চা-বাগান সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়। ছোট ছোট বাগানে ফ্যাক্টরী করা সম্ভব নয়। সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত বাগানের ফ্যাক্টরীতে ছোট ছোট বাগানের কাঁচা চা-পাতা বিক্রীর ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপুরায় এই পরিকল্পনা সাফল্যের সঙ্গেই পরিচালিত হচ্ছে। জুমিয়াদের মধ্যে নতুন আশা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে ২৬৮৬টি ছোট বাগান চা-পাতা বিক্রী করে পরিবার প্রতিপালন করছে। প্রধানত বাগানের মালিকই সপরিবারে পরিশ্রম করে বাগান পরচালনা করছে। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে দিন মজুর নিয়োগ করা হচ্ছে।

এই ব্যবস্থায় শ্রম আইনের সুযোগ সুবিধা কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। কাঁচা চা-পাতা ন্যায্য মূলে বিক্রীর গ্যারান্টি সৃষ্টি করতে পারলে এই ব্যবস্থার প্রসাব ঘটবে।

ত্রিপুরার ভৌগোলিক পরিবেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি মালিকানায় চা-বাগান একটি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। দীর্ঘ ৬০ বছর যাবত ত্রিপুরার কোন উপজাতি বা বাঙ্গালী চা-বাগানে কাজ করতে রাজী ছিল না।

অথচ বর্তমানে নিজস্ব মালিকানায় নিজের বাগানে শ্রমিকের কাজে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষক ও শ্রমিকদের নতুন মনসিকতার জন্ম হচ্ছে এই ব্যবস্থায়। শ্রমিকদের কাজ মর্যাদাহানিকর নয় এই চেতনা জাগছে। আসলে সমস্যা দেখা দেবে চা-প্রসেসিং ফ্যাক্টরীর অভাবে। আধুনিক প্রসেসিং ফ্যাক্টরী থাকতে হবে কাছাকাছি এলাকায়। সারা বিশ্বেই এখন চলছে অর্থনৈতিক মন্দা। ভারতে নব্বই-এর দশকে নরসিমা রাও উদার অর্থনীতি চালু করার ফলে হঠাৎ করে ভারতের বাজারে বিদেশী চা আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চা-শিল্পে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বাজপেয়ীর সরকার আমদানীর সব বাধা তুলে দিয়ে সংকট আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ত্রিপুরার চা-শিল্পে ও এই সংকটের প্রবল প্রভাব পড়েছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে উগ্রপন্থী সমস্যা।

সদর মহকুমার ১৮টি চা-বাগানে বড় সমস্যা হল নিরাপত্তার। অনেক বাগানের মালিক বাগানে প্রবেশ করতে পারে না। অফিস এবং ফ্যাক্টরী ঠিকভাবে চালানো যাচ্ছে না। হিসেব নিকেষও ঠিকভাবে চলছে না। বহু শ্রমিক বাগান ছেড়ে পালাচ্ছে। বছরে কয়েকবার বিভিন্ন বৈরীদলকে চাঁদা দিতে হয়। চাঁদা বাকী পড়লেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিকরা হঠাৎ করে বেকার হয়ে পড়ে। এসব সমস্যার ফলে বাগানগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু বাগান পাতা বিক্রী করে শ্রমিকদের সচল রাখার চেষ্টা করছে। বৈরী বাধায় তাও বন্ধ হচ্ছে। নিয়মিত বৈরী চাঁদা দিয়েও কয়েকটি বাগানের মালিক ও ম্যানেজার বৈরীদের হাতে নিহত হয়েছে।

শ্রমিক ইউনিয়নগুলো এক্ষেত্রে খুবই অসহায় অবস্থায় রয়েছে, শ্রম দপ্তরের কর্মীরাও বাগানে যেতে পাবছে না। ১২টি বাগান প্রায় বন্ধ। ৪০টি বাগানে মাঝে মাঝে কাজ হয়। কিন্তু শ্রমিকবা নিয়মিত বেতন পায় না, বেশন পায় না, প্রভিডেন্ট ফান্ডেব টাকা জমা হয় না।

ত্রিপুরায় চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরী মাত্র ২৬ টাকা। অথচ বাইরে ক্ষেত মজদুববা - মজুবী পায় ৬০ থেকে ৮০ টাকা। কাজেই সম্প্রতি চা-শ্রমিকদের নিম্নতম মজুবী দৈনিক ৩৫ টাকা কবাব দাবী উঠেছে। দুটি ইউনিয়নই এই দাবী যুক্তিসঙ্গত মনে কবে। বাগানের নিবাপত্তা এবং নিয়মিত কাজ পাওযার ব্যবস্থা করা হল বর্তমানে চা-শ্রমিকদেব অন্যতম জরুবী দাবী। বাজ্য ও কেন্দ্রীয সরকার যুক্তভাবে এই দাবী পূরণ করতে ব্যর্থ হলে ত্রিপুবায বহু চা-বাগান বন্ধ হযে যাবে। ত্রিপুবায চা-শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দুটি মাত্র ইউনিয়ন কাজ করছে।

১) ত্রিপুবা চা-মজদুর ইউনিযন - সদস্য সংখ্যা - ৩০৭৬

২) ত্রিপুবা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন - সদস্য সংখ্যা- ১০,০০৫

বর্তমান পরিস্থিতিতে দুটি ইউনিয়ন যৌথ উদ্যোগে চা-শ্রমিকদেব স্বার্থ বক্ষাব জন্য যৌথ নেতৃত্বে আন্দোলন করতে পারে। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয় যেমনটি প্রযোজন তেমনটি ঘটছে না।

ত্রিপুরায় চা-শিল্পেব উন্নতির জন্য রয়েছে তিনটি সংস্থা।

১) টি এসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া।

২) টি রিসার্চ এসোসিয়েশন।

৩) টি ডেভলাপমেন্ট কর্পোবেশন।

শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য রয়েছে লেবার কমিশনার এবং শ্রম দপ্তর। নিবাপত্তাব প্রশ্নে কেউ সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না।

আন্তর্জাতিক বাজারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহাব কবা কৃষি পণ্যেব চাহিদা নেই। এই কারণে ভারতীয় চা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছু হটছে।

অথচ প্রতিটি চা-বাগানে বনজ লতাপাতা ও আগাছা ব্যবহাব করে জৈব সার তৈরী করা সম্ভব। বাজারে ব্যবহৃত চা-পাতা সংগ্রহ করেও ভাল সবুজ সার তৈরী করা সম্ভব। এ বিষয়ে শ্রমিক ইউনিয়নকেও বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

চা-বাগানের উপযুক্ত পরিচর্যা এবং গাছের পুষ্টির ব্যবস্থা না করলে উৎকৃষ্ট চা উৎপাদন সম্ভব নয়। এ বিষযে ত্রিপুরার বাগানগুলো যথেষ্ট পিছিয়ে আছে।

শ্রমিক স্বার্থেই ইউনিয়নগুলোকে এ বিষয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। নতুবা চা-শিল্পের সংকট আরো তীব্রতর হবে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ব্যবহার শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে।

চা শ্রমিকদের সম্মেলন

মোটর শ্রমিকদের আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ত্রিপুরায় কোন যানবাহন ছিল না। যানবাহনের উপযোগী রাস্তাঘাটও ছিল না। সামরিক প্রয়োজনে সোনামুড়া আগরতলা এবং আগরতলা-আখাউড়া রোড নির্মাণ করা হয়। সামরিক যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ১২জন ড্রাইভারকে ছাঁটাই করা হয় । সুখময় সেনগুপ্ত এবং তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ব্রাউন সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দেন। আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ড্রাইভারদের কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে একটা মীমাংসা করা হয়। তখনও শ্রমিকদের কোন সংগঠন গড়া হয়নি।

ছাঁটাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে একটি সংগঠন গড়ার চিন্তাভাবনা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা দলে দলে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। উদ্বাস্তুদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক ড্রাইভার ছিল। কিন্তু ত্রিপুরায় গাড়ী আমদানী করার মত কোন রাস্তাঘাট ছিল না।

আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার পর জরুরী ভিত্তিতে আসাম-আগরতলা এবং আগরতলা-সাব্রুম রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নির্মাণ শ্রমিকের অভাবে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা যায়নি।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকে নতুন নতুন যানবাহনের আমদানী হতে থাকে। তখনো সারা বছর চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট তৈরী হয়নি। কাঁচা রাস্তায় বছরের অধিকাংশ সময় কাদা এবং পাহাড়ে ধ্বস নেমে রাস্তা চলাচলের বাধা সৃষ্টি করতো।

১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় সামরিক প্রয়োজনে রাস্তাঘাটের দ্রুত উন্নতি ঘটাতে হয়েছে। রাজধানীর সঙ্গে প্রতিটি মহকুমা শহরের যোগাযোগের রাস্তাও এই সময় উন্নত হয়েছে।

রাস্তাঘাটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। জীপ-বাস-ট্রাক ড্রাইভারদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। অবশ্য যাত্রী সংখ্যার তুলনায় যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমই ছিল।

প্রথমদিকে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ক খুব ভাল থাকায় একই সংগঠনে থেকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা সহজ হয়েছে। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মোটর শ্রমিক এবং মালিকদের প্রায় সকলেই ছিল কংগ্রেস দলের অনুগামী। ক্রমে ক্রমে শ্রমিক থেকে মালিক হয়ে যারা ক্রমশঃশ্রমিকের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের নানা বিষয়ে সংঘাত দেখা দিতে থাকে। ফলে মোটর শ্রমিকদের পৃথক সংগঠন গড়ে উঠে।

ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

১৯৬৪ সালে ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন নাম দিয়ে পৃথক শ্রমিক সংগঠন গড়া হয়। মালিকরাও ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট, বাস ওনার্স সিন্ডিকেট, জীপ ওনার্স সিন্ডিকেট ইত্যাদি পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে তুলেন।

মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন -- শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত, তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, অমর গুপ্ত, অনিল ভট্টাচার্য, ত্রিপুর সেন, রতন চক্রবর্তী, নীরদ বরণ দাস, শৈলেন চক্রবর্তী, মানিক সোম, কার্তিক ভট্টাচার্য, শান্তি চৌধুরী, মধুজিৎ দেববর্মা প্রমুখ নেতারা।

মালিকদের সিন্ডিকেটগুলোতেও নেতৃত্ব দিয়েছেন কংগ্রেস অনুগামী নেতারাই। ফলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশ সমস্যার সমাধান কবা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের মৌলিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে বামপন্থীদের প্রচার শ্রমিকদের মধ্যে নতুন চেতনার সঞ্চার করে। শ্রমিকদের মধ্যে দাবী উঠে ঃ--

১) প্রত্যেক শ্রমিককে নিয়োগপত্র দিতে হবে।
২) যখন খুশী ছাঁটাই করা চলবে না।
৩) শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ধার্য করতে হবে।
৪) শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কাজ করার অধিকার কার্যকর কবতে হবে।
৫) শ্রমিকদের সাপ্তাহিক সবেতন ছুটি দিতে হবে।
৬) পুলিশী জুলুম বন্ধ করতে হবে।
৭) শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার কবতে হবে।
৮) শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯) শহরের বাইরে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকদের বিশেষ ভাতা দিতে হবে।
১০) বছরে ১৫ দিন মেডিক্যাল লীভ দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের উদ্যোগে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে অধিকাংশ দাবী পূরণ করা হয়। এসব দাবীতে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বর্তমান সভাপতি দীপক রায়। এই সময় সুখময় সেনগুপ্ত এবং শচীন্দ্র লাল সিংহের নেতৃত্ব দখলের তীব্র সংঘাত শুরু হয়।

১৯৬৬ সালে সুখময় সেনগুপ্ত কংগ্রেস দল ছেড়ে ত্রিপুরা কংগ্রেস দল গঠন করে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে কংগ্রেস বিরোধী প্রচার শুরু করেন কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হবার পর কংগ্রেস দলে ফিরে আসার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কমিটিতে বিভাজনের ফলে ইন্দিরা কংগ্রেস এবং সংগঠন কংগ্রেস দুটি দল সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ কেন্দ্রীয় কমিটিতে ইন্দিরাজীর বিরুদ্ধে ভোট দেন । ফলে

রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে ইন্দিরাজী শচীন্দ্র লাল সিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শে সুখময় সেনগুপ্তকে ইন্দিরা কংগ্রেসের নেতা নির্বাচিত করেন।

এই ঘটনায় কংগ্রেস দল দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। শচীন্দ্র লাল সিংহের অনুগামীরা কংগ্রেস দলের সমস্ত সংগঠন দখল করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর সুখময় সেনগুপ্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিরোধীদের উপর কঠোর দমননীতি চালাতে থাকেন। এতে ফল হয় বিপরীত।

৭০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় শ্রমিক কর্মচারীদের সমস্ত সংগঠনেই কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ছিল। বামপন্থীরা বহু চেষ্টা করেও পৃথক সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি।

কংগ্রেস দলে বিভাজনের সুযোগ নিয়ে পুর কর্মচারীদের নেতা অজয় বিশ্বাস মোটর শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত ক্ষিপ্ত হয়ে মীমাংসার কোন উদ্যোগ না নিয়ে দমন নীতির পথ ধরেন। আন্দোলনের চারজন নেতাকে মিসা আইনে গ্রেপ্তার করেন। এতেই রাজ্যব্যাপী জঙ্গী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।

মোটর শ্রমিকরা নিম্নতম মজুরী সহ অন্যান্য দাবীতে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মালিক পক্ষ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটা মীমাংসা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ইতিপূর্বে ১৯৬৬ সালে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে মালিক পক্ষ মোটর ড্রাইভার ও কনডাক্টরদের নিয়োগপত্র ও বেতনের স্কেল চালু করেন। সাপ্তাহিক ছুটিও মেনে নেন। শহরের বাইরে কর্মরত অবস্থায় বিশেষ ভাতার দাবীও মেনে নেওয়া হয়। বছরে ১৫ দিন মেডিক্যাল লীভের দাবীও মেনে নেওয়া হয়। শ্রম আইনের আওতায় না থাকায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের দাবী পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

শ্রমিক-মালিক ও শ্রম দপ্তরের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের এই চুক্তি ১৯৬৬ সালের ১৯ শে নভেম্বর থেকে কার্যকর হবার কথা ছিল। শচীন্দ্র লাল সিংহ ছিলেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী। শ্রম দপ্তর কতকগুলো সমস্যার কারণে চুক্তি কার্যকর করতে পারছিল না।

প্রধান অসুবিধা ছিল প্রত্যেক মালিক সিন্ডিকেটের সদস্য ছিল না। সিন্ডিকেটের বাইরে যে সব মালিকরা ছিলেন তাদের কোন প্রতিনিধিকে আলোচনায় ডাকা হয়নি। তাই তারা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানতে রাজী ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং দশ দফা দাবীতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির আরেকটি দুর্বলতা ছিল, এই চুক্তি শুধু ট্রাক ও বাস ড্রাইভারদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছিল। জীপ সিন্ডিকেট এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আমন্ত্রিত ছিল না। কাজেই জীপ ড্রাইভার ও কনডাক্টররা এই চুক্তির সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিকদের দাবীগুলোর মীমাংসা করার জন্য আহ্বান জানান। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করারও অনুরোধ জানান। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই বলে ঘোষণা দেন। আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার সুযোগ বাতিল করে রাজনৈতিক

উদ্দেশ্যে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনা করা উচিত নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শেষ পর্যন্ত সভাপতি কার্তিক ভট্টাচার্যের মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হয় এবং মোটর শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

১৯৬৬ সালের আন্দোলনে শ্রমিকদের ১০ দফা আন্দোলনের অধিকাংশ দাবী মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ এবং শ্রমমন্ত্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্তের সংযত ও আন্তরিক উদ্যোগের ফলে তা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৭৩ সালে আন্দোলনের প্রধান দাবী ছিল নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ এবং সব স্তরের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টরদের জন্য তা প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত আন্তরিক উদ্যোগ নিলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই শ্রমিকদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করা যেত। অথচ রাজনৈতিক কারণে দমননীতি চালাবার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। অন্যান্য বহু সংগঠন মোটার শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে।

ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি

১৯৭৩ সালে **ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি** নামে নতুন সংগঠন গড়ে ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অফিসটি দখল করে নেয় আন্দোলনকারী মোটর কর্মীরা। ফলে সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। বিরাট পুলিশ বাহিনীর সাহায্য নিয়ে ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাইনবোর্ড পুনরায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। দু'বছর পরই জরুরী অবস্থার সময় ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির বহু নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারের এই ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রায় সব-শ্রমিক ঐক্যবদ্ধ হয়ে জরুরী অবস্থার শেষ সময়ে ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতিতে যোগদান করে। কয়েক মাস পরেই জরুরী অবস্থা তুলে নেবার পর বিধানসভায় অনাস্থা ভোটে সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। ত্রিপুরায় শুরু হয় অকংগ্রেসী জোট সরকার গড়ার নতুন যুগ।

কোয়ালিশন সরকর প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতি তাদের অফিসটি স্থায়ীভাবে দখল করে নেয়। এই সময়ে মোটর শ্রমিকদের মধ্যেও বড় রকমের বিভাজন ঘটে। সৃষ্টি হয় বামপন্থী নতুন সংগঠন **ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন**।

বর্তমানে মোটর কর্মী সমিতির নেতৃত্বে রয়েছেন সভাপতি দীপক রায়, কার্যকরী সভাপতি বরোদাচরণ দাস, সহ সভাপতি রঞ্জিত দত্তগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক সাধন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক বিপ্লব রায়, অফিস সম্পাদক নিমাই দত্ত। কোষাধ্যক্ষ অজিত সাহা, অন্যান্য সদস্যরা হলেন, দিলীপ সাহা, মনীন্দ্র সাহা, স্বদেশ দে, মেঘু মজুমদার, বেণু লাল দাস, কালীচরণ দেবনাথ, শংকর সাহা, বিজয় পাল, বাবুল রায়, সুবোধ বণিক, তিমির ঘোষ, স্বপন রায়, বিমান রায়, নিতাই রায়, চন্দন নাহা ও সমর রায়।

বর্তমানে সারা ত্রিপুরায় (মোটর কর্মী সমিতির ১৫টি ব্রাঞ্চ রয়েছে। আই এন টি ইউ সির

অনুমোদন পেয়েছে। ইউনিয়ন পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন কার্তিক ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য, প্রিয়দাস চক্রবর্তী, ত্রিপুর সেন ও মানিক সোম। ১৯৭৩ সালের ৯ই মার্চ এই সমিতির রেজিষ্ট্রেশন করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা হল -৫৬০০

বর্তমান সমস্যা হল --শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী সময় মত বাড়ে না। যখন বাড়ে তখন জিনিষপত্রের দামও বেড়ে যায়। ফলে নতুনভাবে মজুরী বৃদ্ধির দাবী উঠে। উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত বা অপহৃত হলে সরকারী প্রতিশ্রুতিমত ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। সংগঠন ভাঙ্গার চেষ্টার ফলে মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়।

ত্রিপুরা মোটর কর্মী সমিতির সভাপতি দীপক রায় ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে কিছুকাল মন্ত্রীত্ব করেছেন। সাধারণ সম্পাদক সাধন দাস পুরসভায় নির্বাচিত হয়ে নাগরিক সেবায় দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন।

ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ত্রিপুরায় মোটর শ্রমিকদের মধ্যে বামপন্থী কোন সংগঠন গড়ে উঠেনি। বামপন্থী সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেছে।

১৯৮২ সালের ১১ই জুলাই মোটর শ্রমিকদের এক সম্মেলন করা হয়। এই সম্মেলন থেকেই প্রথম বামপন্থী মোটর শ্রমিক সংগঠন --- **ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন** গঠন করা হয়।

ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন -- বিভূভূষণ দে, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন অমূল্য চরন দে এবং যুগ্ম সম্পাদক হন মানিক দে ও বিশু সাহা।

রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে মোটর শ্রমিকদের আন্দোলনের গতিও বৃদ্ধি পায়। বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রথমেই মোটর শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে নথিভুক্ত ৩৫ হাজার ওভারলোড ও অন্যান্য অভিযোগের মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কারণ এসব মামলার অধিকাংশই ছিল রাজনৈতিক কারণে সাজানো মামলা। শ্রমিক আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যেই এসব মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। শ্বেতমহলে তদন্ত কমিশনের সাক্ষ্য প্রমাণে এসব তথ্য জানা গেছে।

বামফ্রন্ট আমলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল মোটর শ্রমিকদের মৌলিক দাবীগুলো যেমন চাকুরীতে বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র দেওয়া, নিম্নতম মজুরী ও ভাতা দেওয়া, ৮ ঘন্টা কাজ, সাপ্তাহিক সবেতন ছুটি, বাৎসরিক বোনাস ও মেডিক্যাল লীভ ইত্যাদি বিষয়ে আইন পাশ করা। কংগ্রেস আমলে এসব বিষয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছিল এবং তাও সব শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না।

বামফ্রন্ট সরকারের তৃতীয় পদক্ষেপ হল --- নানা অজুহাতে শ্রমিকদের উপর পুলিশী জুলুম বন্ধ করা। শুধু ত্রিপুরায় নয় আসাম-আগরতলা রোডে আসাম-মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের পুশের জুলুম বন্ধ করারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বামফ্রন্টের চতুর্থ পদক্ষেপ হল -- মোটর শ্রমিকদের ঋণ দিয়ে এবং সমবায় গঠন

করে গাড়ী কেনার ব্যবস্থা করে দেওয়া। সহজে পারমিট পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং দশজন শ্রমিক কাজ করে এমন সংস্থার শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা।

বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবার ফলে রাজ্যের অধিকাংশ মোটর শ্রমিক সিটু অনুমোদিত শ্রমিক সংগঠন ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হয়েছে।

রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের শাখা কমিটি রয়েছে। অধিকাংশ মহকুমায় ইউনিয়নের পাকা অফিসঘর নির্মাণ করা হয়েছে। জোট সরকারের সময় ইউনিয়নের বহু অফিস ধ্বংস করা হয়েছিল। সেগুলো সবই নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হল - ১২,১২৬

রাজ্যভিত্তিক ইউনিয়নের মূল নেতৃত্বে রয়েছেন বিভূভূষণ রায়, দিলীপ রায়, তুষার রায়, প্রাণ গোপাল চৌধুরী, রাণু নাগ, রসিদ আলি, রাখাল শর্মা, হারাধন শর্মা, চঞ্চল মজুমদার, হুমায়ুন কবীর, সৌমিত্র চক্রবর্তী ও বিশু সাহা। বর্তমানে ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মানিক দে বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে পঞ্চম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হয়েছেন।

শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা, সামাজিক নিরাপত্তা দান করা, উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিহত, আহত বা অপহৃত শ্রমিকদের পরিবারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজে বামফ্রন্ট যেমন খুবই সহানুভূতিশীল - ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন নিজস্ব উদ্যোগেও এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

কংগ্রেস সরকার শ্রমিক স্বার্থে উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারেনি। কারণ বাস-ট্রাক ও জীপ মালিকদের অধিকাংশই ছিল কংগ্রেসের অনুগামী। কাজেই সর্বদা একটা আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কংগ্রেস নেতারা শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা করেছেন। শ্রমিক স্বার্থে আইন পাস করার মত বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পারেনি কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীরা। শ্রমিকদের দাবী ছিল শ্রমিক সংগঠনে মালিক থাকতে পারবে না। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশ ছিল শ্রমিক-মালিক মিলে মিশে চলতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে মোটর শ্রমিকরা অনেক সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক স্বার্থে আইন পাস করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছে। ফলে ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়েছে ।

ত্রিপুরায় অটো রিক্সা শ্রমিকদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় ৭০-এর দশকে অটো রিক্সা চালু হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে বামফ্রন্ট শাসনের শুরু থেকে। হাজার হাজার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক ব্যাংক ঋণ নিয়ে অটো রিক্সা চালনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতি বছরই এদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মহকুমায় অটো রিক্সা চালু হয়েছে। প্রধানত সিটু অনুমোদিত অটো- রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে অধিকাংশ অটো শ্রমিক সংগঠিত হয়েছে।

১৯৯৩ সালের ৪ঠা জুন রবীন্দ্র ভবনে রাজ্যের সমস্ত অটো রিক্সা শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের

এক সম্মেলনে -- অটো রিক্সা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হয়। সারা রাজ্যের ৬৯টি ইউনিটের ৬২৪২জন সদস্য এই ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত হয়।

রাজ্যের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনে অটো রিক্সা শ্রমিকরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিযন এবং সিটুর রাজ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনায় নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে ইউনিযনকে শক্তিশালী করে তুলেছেন। অটো রিক্সা শ্রমিকদের পেশাগত অনেক সমস্যা আছে। পেট্রো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বার বার অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। বিভিন্ন সময় পুলিশের হাতে হয়রানী ভোগ করতে হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে রয়েছে উগ্রপন্থী সমস্যা। জাতি-উপজাতির সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়েও ধৈর্য্য এবং সংযম রক্ষা করে চলার অভ্যেস গড়ে তুলতে হচ্ছে। বহু উপজাতি যুবক এই পেশা গ্রহণ করেছে এবং দক্ষতা র সঙ্গেই অটো চালাচ্ছে।

বার বার অটো ভাড়া বৃদ্ধি করতে বাধ্য হবার ফলে যাত্রীসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে। অথচ ভাড়া না বাড়িয়ে শ্রমিকদের বাঁচার কোন উপায় নেই। তেলের দাম ঘন ঘন বৃদ্ধি করা হচ্ছে । সবদিন সমান রোজগার হয় না। ঋণ পরিশোধ করা, অটো মেরামত করা ও অন্যান্য খরচও দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

অধিকাংশ অটো রিক্সার মালিক নিজেই ড্রাইভার। এজন্যই প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও কোনও রকমে টিকে থাকা যাচ্ছে। শ্রম আইনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আন্দোলনে যেতে হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জনাই অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে। বছরে কয়েকবার পেট্রো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটছে। মেরামতি যন্ত্রপাতির খরচও বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বীমা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্যও সংঘবদ্ধ আন্দোলন করতে হয়। সিটু নেতৃত্ব শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্য নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করছেন।

২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে ইউনিয়নের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলনে ৫৩জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৪জনের একটি সম্পাদক মন্ডলীও গঠিত হয়েছেন। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন -- চঞ্চল মজুমদার, সহ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন --- ১) স্বপন বৈষ্ণব, ২) ব্রজলাল চক্রবর্তী, ৩) অশোক দে। সাধারণ সম্পাদক -- সুব্রত সরকার সম্পাদক মন্ডলীর অন্যান্য সদস্যরা হলেন -- বিজয় তিলক, নরেন্দ্র পাল, গোলাম মোস্তফা, নিরঞ্জন নাথ চৌধুরী, দীলিপ পাল, সুভাষ সাহা, অহিভূষণ ঘোষ, হরিপদ দত্ত, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, দুলাল সাহা, কাজল দেব রায়, স্বপন দেব ও কিশোর গোপ। সিটু অনুমোদিত ত্রিপুরা অটোরিক্সা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হল - ৪৫৬৪

এছাড়াও আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত একটি সংগঠনও একই লক্ষ্যে কাজ করছে। বিভিন্ন মহকুমায় শাখা সংগঠন গড়ে উঠেছে ।

ত্রিপুরায় রিক্সা শ্রমিকদের আন্দোলন

ষাটের দশক থেকে ত্রিপুরায় প্রতিটি মহকুমায় রিক্সা চলাচল শুরু হয়েছে। রাস্তাঘাটের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ এলাকায়ও রিক্সা চলাচল শুরু হয়েছে। কিন্তু রিক্সা শ্রমিকরা মালিক হতে পারেনি।

রিক্সার মালিকরা পর গাছার মত ঘরে বসেই রিক্সা ভাড়া দিয়ে সংসার চালান। সময় মত রিক্সা মেরামত করার দায়িত্বটুকুও পালন করেন না। ফলে রিক্সা শ্রমিকদের অতিরিক্ত পরিশ্রম করে রিক্সা চালু রাখতে হয়। সাধারণ মেরামতের খরচ শ্রমিকদেরই বহন করতে হয়। শ্রম আইন এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ এরা কেউ স্থায়ী শ্রমিক নয়।

রিক্সা শ্রমিকদের দৈনিক আয়ের চার ভাগের এক ভাগ রিক্সার মালিকের ভাড়া বাবত খরচ হয়। আরো এক ভাগ দুই বেলা টিফিনের বাবত খরচ হয়। বাকী অর্দ্ধেক আয়ের দ্বারা সংসার চালানো সম্ভব হয় না। হতাশাগ্রস্ত শ্রমিকদের সামনে বিকল্প কোন কাজ থাকলে রিক্সার কাজ ছেড়ে দেয়। যাদের কোন বিকল্প নেই তারা মদ-গাজা খেয়ে নিজেদের দুর্দশা ভুলতে চেষ্টা করে। সামান্য অসুখ বিসুখ হলেই বিপন্ন হয়ে পড়ে। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গেলে দৈনিক রোজগার বন্ধ হয়। ঔষধ কেনার জন্য ঋণ করতে হয়। চিকিৎসা করতে গিয়ে সপরিবারে অনাহারে থাকতে হয়।

ত্রিপুরায় কংগ্রেস নেতারা ষাটের দশকে রিক্সা সমবায় গঠন করে নতুন পথ দেখাতে চেষ্টা করেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে রিক্সা কেনা হয়। প্রতিদিন এক টাকা করে জমা দিয়েও ঋণ শোধ করে রিক্সার মালিক হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। আস্তাবল বাজারে এবং বটতলায় সস্তা দরে খাবার ক্যান্টিন খোলা হয়। কিন্তু রিক্সা শ্রমিকরা ঋণ পরিশোধেব পরিবর্তে ঋণ মকুবের আন্দোলনে বেশী অকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে বিক্সা কেনার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ঋণ বন্ধ হয়। সমবায় সমিতি অচল হয়ে যায়। রিক্সা শ্রমিকরা আবার মহাজনেব খপ্পবে চলে আসে। সারা রাজ্যে রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা কত তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। প্রতি মাসেই রিক্সা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। এই অসংগঠিত শ্রমিক বাহিনীকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছে সিটু নেতৃবৃন্দ। বামফ্রন্ট সরকার নানাভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

শহরে ও গ্রামের বাজার অঞ্চলে বিক্সাব চাহিদা বাড়ছে। রিক্সা শ্রমিকদের দুর্দশা দুর করার জন্য সিটু অনুমোদিত রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন ---- সারা রাজ্যে বিভিন্ন দাবীতে মহকুমা শাসক ও বিডিও অফিসগুলোতে স্মারকলিপি পেশ করেছে। আন্দোলনে সামিল হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেব প্রভাবিত রিক্সা শ্রমিক সংগঠন গড়ে উঠছে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মাধ্যমে স্বরোজগার যোজনায় রিক্সা শ্রমিকদের সমস্যা দূর করা এবং শিক্ষা-- চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় করে স্বনির্ভর করার চেষ্টা চলছে। ১৯৭০ সালে রিক্সা শ্রমিকদের কল্যাণে একটি সমবায় গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে রিক্সা শ্রমিকদের জন্য ৩২টি সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সিটু অনুমোদিত ত্রিপুবা রিক্সা ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হল -৩৯২২

বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে বহু দক্ষ বিড়ি শ্রমিক ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন বিড়ি কারখানায় দীর্ঘদিন কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু ত্রিপুরায় কোন বিড়ি কারখানা ছিল না। স্থানীয় বাজারে বিড়ির চাহিদা মেটাবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন

মহকুমায় বিড়ির কারখানা গড়ে উঠে। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোণীতে বিড়ি শ্রমিকদের.সমবায় গঠন করে বিড়ি কারখানা স্থাপন করে বিড়ি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বহু শ্রমিক নিজস্ব উদ্যোগেও ছোট ছোট কাবখানা গড়ে তুলে সপরিবারে বিড়ি তৈরী করে বাজারে বিক্রী করে জীবিকা অর্জনের পথ করে নেয়। সর্বত্র স্থানীয় টাটকা বিড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সত্তরের দশক পর্যন্ত স্থানীয় সবকটি কারখানা সচল ছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বাইরের বড় বড় বিড়ি কোম্পানীগুলো ত্রিপুরার বাজার দখল করার জন্য ছুটে আসে। প্রতিযোগিতায ছোট ছোট কারখানাগুলো টিকে থাকতে পারেনি। সরকারী সহযোগিতা পেলে হয়তো অনেক কারখানাই টিকে থাকতে পারতো। শুধু কম দামে বিড়ির পাতা-তামাক ও কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেই ছোট কারখানাগুলো টিকে যেত।

অন্যদিকে সি পি আই নেতা ভানু ঘোষের নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন-গঠন করে মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। বর্তমানে সংগঠিত বিড়ি কারখানা রাজ্যে নেই বললেই চলে । বিড়ি শ্রমিকবা - বাড়ীতে পাতা ও তামাক নিয়ে কাজ করে ।

তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি মজুরী বৃদ্ধির অনুকূল ছিল না। রাজ্যের ছোট ছোট বিড়ি কাবখানার মালিকরা নিজেরাও ছিল শ্রমিক। শ্রমিকের সঙ্গে বসেই কাজ করতো। বাইরের বড় বড় বিড়ি কোম্পানীব সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমেই কোণঠাসা অবস্থায় কোন বকমে টিকে ছিল।

বর্তমানে সিটুর নেতৃত্বে অসংগঠিত শ্রমিকবা - বিড়ি শ্রমিক সংঘের সদস্য হয়ে কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ কবছে । বর্তমানে সদস্য সংখ্যা হল ২৫১৪

একদিকে পাতা ও তামাকের মূল্য বৃদ্ধি অন্যদিকে মজুরী বৃদ্ধি ও বোনাসের দাবীতে জোবদার আন্দোলন ত্রিপুবা রাজ্যের সম্ভাবনাময বিড়ি শিল্পকে অকাল মৃত্যুব দিকে ঠেলে দিয়েছে। দক্ষ শ্রমিক এবং বাজার প্রস্তুত ছিল। বিড়ি শিল্পে অন্ততঃ ৫০ হাজার শ্রমিক পবিবারের কর্মসংস্থান হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল।

বহু ছোট ছোট বিড়ি কারখানার মালিক পুনবায শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মহাজনের দেনা শোধ করতে না পেরে অনেকে বিক্সা শ্রমিক এবং দিনমজুর হয়েছে।

অল্প কয়েকজন মালিক ত্রিপুবায় কাবখানা বন্ধ করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি মহকুমা শহরে বিড়ির কারখানা খুলেছে। ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গ দুদিকের বাজাবে প্রতিযোগিতা করেও টিকে বয়েছে। সরকারী ঋণ ছাড়াও কলকাতায় বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধারে কাঁচামাল কিনে কারখানা মালিকরা অনেকটাই সচল হয়েছে।

বর্তমানে সিটু অনুমোদিত বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নেব অধিকাংশ শ্রমিক বাড়ীতে বসে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে চুক্তিতে কাজ করে। ইউনিয়ন বেজিষ্টার্ড হওয়ায় শ্রম আইনের সুযোগ সুবিধাও ভোগ করে। বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সবকার বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ঘোষণা করেছে। বাজ্য সবকারের মাবফতে শ্রমিকরা সেসব সুযোগ ভোগ কবতে পারে। তবে মজুরী বৃদ্ধি এবং বোনাসের দাবীতে দর কষাকষি করার সুযোগ খুবই কম। কারণ বর্তমানে বিড়ির কারখানাগুলো অনেকটা রুগ্ন কারখানা হিসেবেই গণ্য হতে পাবে। এখানে চাপ সৃষ্টি করলে সব বিড়ি কারখানাই

বন্ধ হয়ে যাবে।

বাস্তব পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেই নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করা এবং মজুরী বৃদ্ধির দাবী করা যেতে পারে। শ্রম দপ্তরের মারফতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া পারে।

বর্তমানে সিটু অনুমোদিত ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নই - সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। অধিকাংশ বিড়ি শ্রমিক এই সংগঠনের সদস্যভুক্ত হয়েছে।

জুট মিল শ্রমিকদের আন্দোলন

ত্রিপুরার একমাত্র মাঝারি শিল্প জুটমিলটি স্থাপিত হয়েছে ১৯৭৩ সালের ২রা অক্টোবর। মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। কিন্তু কারখানার নির্মাণকার্য শেষ হবার আগেই সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার পতন ঘটে।

১৯৭৯ সালে কারখানার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হবার পর ৩০ শে নভেম্বর তারিখে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী কারখানাটি উদ্বোধন করেন।

রাজ্যের কৃষকেরা আশা করেছিল অর্থকরী ফসল হিসেবে রাজ্যে উৎপাদিত পাট ও মেস্তার ন্যায্য মূল্য পাওয়া যাবে। এতকাল যাবত রাজ্যের পাট দাদনদার মহাজন এবং বহিরাগত মজুত দার ও দালালদের শোষণের ক্ষেত্র ছিল। কৃষকেরা খুব সামান্যই মূল্য পেত। তাই পাট চাষে উৎসাহ কমে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষকদের আশা পূরণ হয়নি।

কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা, কাঁচামাল সরবরাহ ব্যবস্থা, বাজারীকরণের সুযোগ সুবিধা ভালভাবে সমীক্ষা না করেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। দক্ষ পরিচালক কখনোই নিয়োগ করা হয়নি। প্রথমদিকে বামপন্থীরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কারখানা পরিচালনার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করেছে। ফলে — যেমন খুশী আসি যাই -- মানসিকতা প্রশ্রয় পেয়েছে।

ত্রিপুরায় যখন জুট মিল তৈরী হয়, পশ্চিমবঙ্গে তখন পাট শিল্পে সংকট শুরু হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে প্লাষ্টিক ব্যাগের ব্যাপক প্রচলন হবার ফলে বাজারে পাটের তৈরী ব্যাগের চাহিদা দারুণভাবে কমে যায়। পশ্চিমবঙ্গের বহু পাট কল বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ।শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও সরিয়ে নেওয়া হয়। রুগ্ন কারখানাগুলোকে আধুনিক করার জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রচুর ব্যাংক ঋণ পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু চতুর মালিকরা ব্যাংক ঋণের টাকা নিয়ে ভিন্ন রাজ্যে অন্য ধরনের কারখানা খুলে বসেন। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ধীরে ধীরে সরিয়ে নেওয়া হয়। রুগ্ন কারখানাগুলো ধীরে ধীরে স্থায়ীভাবে বন্ধ হতে থাকে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা বিদ্রোহ করে। নানা ধরনের সংঘাত হয়।

ত্রিপুরায়ও জুট মিলে একই সংকট দেখা দিয়েছে। সারা বছরের কাজের উপযোগী কাঁচামালের অভাবে কারখানার পূর্ণ ক্ষমতা কাজে লাগানো যায় না। তৈরী মাল বাজারে বিক্রী

ত্রিপুরা প্রদেশ জাতীয় মজদুর কংগ্রেস
(আই.এন.টি.ইউ.সি.)
অভিযান
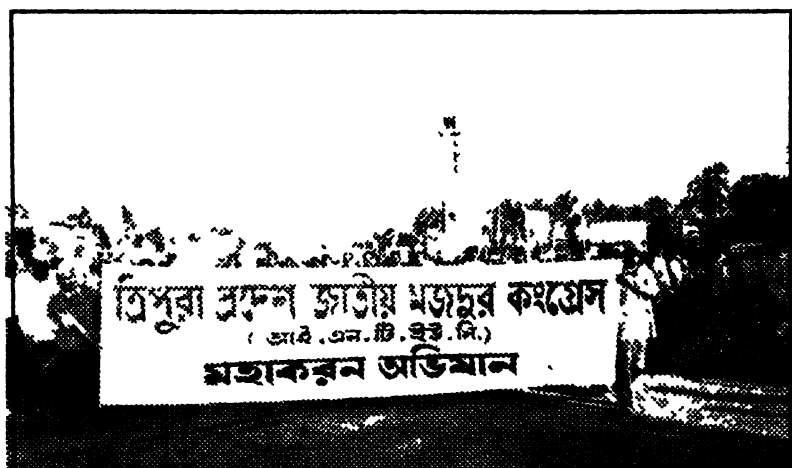
করে উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। প্রথমদিকে ত্রিপুরার কৃষকরা পাট চাষে মনোযোগ দিয়েছিল। কঠোর পরিশ্রম করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি করেছিল। কিন্তু জুট মিলের পক্ষে মজুতভান্ডার গড়ে তোলার সুযোগ ছিল না। অর্থেরও অভাব ছিল,মজুত করার মত গোদামেরও অভাব ছিল।

ত্রিপুরায় জুট মিলের কোন মালিক নেই। সরকারী উদ্যোগেই মিল চালু হয়েছে। বহু টাকা ঋণ করে কিছুকাল সচল রাখা সম্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত রুগ্ন শিল্পে পরিণত হয়েছে ত্রিপুরা জুটমিল।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস-যুব সমিতির জোট সরকার উদ্বৃত্ত শ্রমিক ছাঁটাই করে মিল চালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের মুখে কারখানা বন্ধ করে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রমিকদের বিকল্প কোন কাজের সুযোগ কবে দিতে ব্যর্থ হয়।

১৯৯৩ সালে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা এসে জুট মিল চালু রাখার উদ্যোগ নেয়। কিছুকাল পরীক্ষা নিরীক্ষার পর লোকসানের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় কোলকাতার এক বেসরকারী কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করে কারখানা পরিচালনার দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়। কিন্তু কোম্পানীর লোকেরা জুট মিলের পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাবার কোন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। বরং কর্মসংস্কৃতির অবস্থা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করে পিছু হঠে। কারখানার মালপত্র কোলকাতায় পাঠিয়ে শ্রমিকদের দেনা পাওনার কোন মীমাংসা না করেই কোম্পানীর লোকেরা পালিয়ে যায়। তারপর থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার একমাত্র মাঝারি শিল্পটি কোন রকমে টিকে আছে বামফ্রন্ট সরকারের উদার সাহায্যে।

শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবীতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে নিজেদের স্বার্থ এবং কারখানাব অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থান ধর্মঘট, গণডেপুটেশন, ধর্না ইত্যাদি বহুবার হয়েছে। কিন্তু বেতন-ভাতা বোনাস চাকুরীর নিশ্চয়তা ইত্যাদির মীমাংসা করা সম্ভব হচ্ছে না।

জুট মিলে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এ আই টি ইউ সি অনুমোদিত সংগঠন **ত্রিপুরা চট কল শ্রমিক ইউনিয়ন**। বর্তমান সভাপতি -- ধনমণি সিং, সহ সভাপতি - অনিল দেব, সম্পাদক রবীন্দ্র ভৌমিক। **সিটুর অনুমোদিত সংগঠন - ত্রিপুরা চটকল কর্মী সমিতির** সভাপতি পিযুষ নাগ, সম্পাদক সাধন বসু। এছাড়া রয়ে আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত সংগঠন **ত্রিপুরা জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন**-- নেতৃত্বে রয়েছেন দিলীপ দেবনাথ। জুট মিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং কারখানার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন সব কয়টি ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা।

তারপর থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার একমাত্র মাঝারি শিল্পটি কোন রকমে টিকে আছে বামফ্রন্ট সবকারের উদার সাহায্যে।

শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবীতে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করে নিজেদের স্বার্থ এবং কারখানার অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবস্থান ধর্মঘট, গণডেপুটেশন, ধর্না ইত্যাদি বহুবার হয়েছে। কিন্তু বেতন-ভাতা-বোনাস-চাকুরীর নিশ্চয়তা ইত্যাদির মীমাংসা করা সম্ভব হচ্ছে না।

জুট মিলে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এ আই টি ইউ সি অনুমোদিত সংগঠন ত্রিপুরা চট কল শ্রমিক ইউনিয়ন। বর্তমান সভাপতি -- ধনমণি সিং, সহ সভাপতি - অনিল দেব, সম্পাদক রবীন্দ্র ভৌমিক। সিটুর অনুমোদিত সংগঠন - ত্রিপুরা চটকল কর্মী সমিতির সভাপতি পিযুষ নাগ, সম্পাদক সাধন বসু। এছাড়া রয়ে আই এন টি ইউ সি অনুমোদিত সংগঠন ত্রিপুরা জুট মিল

ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-- নেতৃত্বে রয়েছেন দিলীপ দেবনাথ। জুট মিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং কারখানার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন সব কয়টি ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা।

রাবার শ্রমিকদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় রাবার চাষ সাফল্যের সঙ্গেই এগিয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যের মাটি ও আবহাওয়া রাবার চাষের পক্ষে খুবই উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। রাবারের মানও খুব উন্নত বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সরকারী সমীক্ষায় জানা গেছে ত্রিপুরায় এক লক্ষ হেক্টর জমিতে রাবার চাষ সম্ভব হয়েছে এখন পর্যন্ত ২৭ হাজার হেক্টার জমিতে রাবার চাষ শুরু হয়েছে ।

বর্তমানে রাবার চাষে যুক্ত রয়েছে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিক। এরা অনেকটা ক্ষেতমজুর ধরনের ঠিকা শ্রমিক। সারা বছব এদের কাজ থাকে না। স্থায়ী চাকুরীর সুযোগ নেই। অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে রাবার শ্রমিকদের নানা সমস্যা রয়েছে। নিম্নতম মজুরী এবং নিয়মিত কাজকরার সুযোগ রয়েছে । নিম্নতম মজুরী এবং কাজ করার নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার দরকার ।

অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইনে বিশেষ কোন সুযোগ পাওয়ার ব্যবস্থা নেই। এ জন্যই তাদের প্রধান দাবী হল কেন্দ্রীয় আইন পাস করে অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

রাবার ভিত্তিক কোন শিল্পই ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠেনি। অথচ রাবার থেকে প্রায় ৫০০ রকম জিনিষপত্র তৈরী করা যায়। উপযুক্ত পরিকাঠামো সৃষ্টি করে রাবারভিত্তিক বহু ক্ষুদ্র শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য এবং সক্রিয় উদ্যোগ প্রয়োজন। কয়েক হাজার শিক্ষিত যুবককে রাবার শিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দিলে ত্রিপুরায় রাবার শিল্পে লক্ষাধিক শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে রাবার চাষেও উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। রাবার চাষীরা রাবারের নায্য দাম পেতে পারে। রাবার চাষ ও রাবার শিল্পে ত্রিপুরায় দুই লক্ষ যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । এর জন্য প্রয়োজন গণআন্দোলন ।

ত্রিপুরায় সিটু অনুমোদিত সংগঠন ত্রিপুরা রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮ হাজার রাবার শ্রমিক ইউনিয়নের সমস্যাভুক্ত করেছে । শ্রমিকদের অধিকাংশই এখনো অসংগঠিত অবস্থায় । সিটু অনুমোদিত রাবার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হলেন - মদন দাস, সাদারণ সম্পাদক- কাজল ঘোষ, সহ- সভাপতিরা হলেন - লক্ষ্মীনারায়ন দেববর্মা, মনোরঞ্জন নাথ, অন্ত ত্রিপুরা, বিকাশ দেববর্মা, সহ সম্পাদকরা হলেন -- গোরা চক্রবর্তী, দেবব্রত মজুমদার, বিপ্লব সান্যাল, নীরোদ সাহা । কোষাধক্ষ্য হলেন জীবন চক্রবর্ত্তী । বর্তমানে এই ইউনিয়নই সারা রাজ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে ।

এ আই টি ইউ সি অনুমোদিত রাবার শ্রমিক ইউনিয়ন ও ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে ।

নির্মান শ্রমিকদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় নির্মান শ্রমিকদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও ঠিকেদারদের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবার ফলে সারা রাজ্যের শহরে ও গ্রামে পাকা বাড়ী নির্মানের কাজ ব্যপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের সংখ্যাও বাড়ছে । তাছাড়া সরকারী নানা দপ্তরের পাকা বাড়ীও তৈরী হচ্ছে ।

কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পেও নির্মান শ্রমিকদের কর্মসংস্থান হচ্ছে । শিক্ষিত বেকারদের জন্য দোকান শেড নির্মানেও পাকাঘর তৈরী হচ্ছে ।

কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়লেও সারা বছর সব শ্রমিকের কাজ থাকেনা । বর্ষায় কাজের গতি কমে যায় । নির্মান শ্রমিকদের অনেকেই তখন বেকার হয়ে পড়ে ।

নির্মান শ্রমিকদের স্থায়ী কাজের যেমন নিশ্চয়তা থাকেনা, তেমনি নিম্নতম মজুরীরও নিশ্চয়তা থাকেনা । কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লে বা দুর্ঘটনায় আহত হলে বা মৃত্যু হলে কোন ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা থাকেনা । চিকিৎসারও ব্যাবস্থা অনিশ্চিত।

নির্মান শ্রমিকরাও অসংগঠিত । রাজ্যব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি করে দাবী দাওয়া আদায় করার জন্য প্রয়োজন সংগঠিত ইউনিয়ন ।

ত্রিপুরায় প্রধানতঃ সিটু অনুমোদিত ত্রিপুরা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নই সক্রিয় এবং সংগঠিত । রাজ্যে নির্মান শ্রমিকদের বর্তমান সংখ্যা দশ হাজারের বেশী । সব শ্রমিককে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ার চেষ্টা হচ্ছে ।

প্রধান দাবীগুলো হল ঃ-

১) নির্মান শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় আইন রাজ্যে চালু করতে হবে।

২) নিম্নতম মজুরী নিশ্চিত করতে হবে ।

৩) চিকিৎসার সুযোগ এবং জীবন বীমার সুযোগ দিতে হবে ।

৪) ভূমিহীনদের জন্য গৃহনির্মানের জমি দিতে হবে ।

ত্রিপুরা নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন -- সভাপতি- সুদর্শন দাশ, আন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন - চঞ্চল মজুমদার, হরিপদ দাস, নিখিল সাহা, রবিমোহন দেবনাথ । বিশ্বনাথ দেব, রশিদ আলি এবং জয়রাম দাস । মিছিল - মিটিং ডেপুটেশনের মাধ্যমে দাবী গুলো পেশ করা হয়েছে বিভিন্ন দপ্তরে ।

দোকান কর্মচারীদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় দোকান কর্মচারী সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । বহু শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতী বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা শুরু করছে । নানা ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নানা বয়সের কর্মচারীদের

কাজে লাগানো হয় । প্রথমে শিক্ষানবিসী হিসেবে কাজ শুরু হয় । শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত ১০ থেকে সত্তর বছর বয়সীরা দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজে যোগ দেয় ।

শিক্ষা নবিসে নিযুক্ত কর্মচারীরা কোন মজুরী পায়না । শুধু দুই বেলা খাবার পায় । সকাল ৮ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় । বিনা বাক্যব্যয়ে মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী নানা ধরনের কাজ করা এবং খাঁটি সততার পরিচয় দিতে পারলেই স্থায়ী কাজ ও মজুরী ধার্য্য করার সুযোগ মিলে ।

ব্যবসার ধরন অনুযায়ী দোকান কর্মচারীদের কাজের ধরন নির্ধারিত হয় । বিশ্বস্ত কর্মচারীরা ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া এবং বিভিন্ন লেনদেনের কাজে নিযুক্ত হয় । যারা হিসেব পত্র লিখতে পারে তারা পৃথকভাবে কিছু মর্যাদাও লাভ করে । ১নং-২নং-৩নং খাতা লেখার দক্ষতা অনুযায়ী তাদের মজুরীরও হেরফের হয় । কিন্তু হিসাব লেখার কাজে শুধু দক্ষতা থাকলেও চলবেনা নানা বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার নিশ্চয়তাও থাকতে হবে । এজন্য এই অংশের কর্মচারীদের বেতন মোটামুটি সন্তোষজনক ।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্তরের দোকান কর্মচারীর সংখ্যা বিশ হাজারের কম নয় । এরাও অসংগঠিত সংস্থার কর্মী । তাদের চাকরীর কোন নিরাপত্তা নেই । মালিকের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই তাদের চাকরী নির্ভরশীল । মজুরীরও কোন স্থিরতা নেই । মালিকের সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ কম ।

পঞ্চাশের দশকে প্রিয়দাস চক্রবর্ত্তী, অনিল ভট্টাচার্য্য, অমর গুপ্ত প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা দোকান কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলেন । মালিক পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতেন ।

ষাটের দশকে সি পি আই নেতারা দোকান কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সংগঠন তৈরী করে আন্দোলন শুরু করেন । ১৯৬৭ সালের ২০ শে মার্চ দোকান কর্মচারীদের স্বার্থ দেখার জন্য শ্রম দপ্তরে ৮ দফা দাবী পত্র পেশ করা হয় । পরবর্তী সময়ে দাবীগুলো বিবেচনার জন্য শ্রমমন্ত্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্তের কাছে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয় ।

১৯৭৩ সালে সিটুর উদ্যোগে - ত্রিপুরা দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন- দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে । অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের মতই তাদেরও প্রধান দাবী হল - নিম্নতম মজুরী, চাকুরীর নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র প্রদান, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি । এখনো পর্যন্ত মালিকদের সঙ্গে বড় কোন সংঘাত সৃষ্টি হয়নি । আলাপ আলোচনার ভিত্তিতেই দাবীগুলোর মীমাংসা করা হচ্ছে । বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বছরে একবার বোনাস আদায়েরও ব্যবস্থা হয়েছে ।

ত্রিপুরায় তাঁত শিল্প কর্মীদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক তাঁত শিল্পী ছিল । কিন্তু তাদের অধিকাংশই উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানতো না । গ্রামীন বংশধারায় যে দক্ষতা তারা অর্জন করেছিল তা গ্রামীন চাহিদা পূরণে সক্ষম ছিল । ত্রিপুরার অধিকাংশ উদ্বাস্তুই ছিল গ্রামীন কৃষক । কাজেই তাঁত বস্ত্রের একটা বাজারও সৃষ্টি হয়েছিল । উদ্বাস্তু ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতা প্রায় ছিলইনা । তাঁতীদেরও তাঁতবস্ত্র তৈরী করার মত সরঞ্জাম এবং সূতা ও রঙ কেনার মত পুঁজি ছিলনা ।

উদ্বাস্তু আন্দোলনে তাঁতীদের এই সমস্যা দূর করার জন্য জোরালো দাবী ছিল । রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু ঋণের পরিমান ছিল খুবই কম । মহাজনের খপ্পরে পড়েছিল তাঁতীরা । প্রশিক্ষনের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত । কাজেই অল্প সংখ্যক তাঁতীই উন্নত প্রশিক্ষনের সুযোগ পেয়েছিল তাঁতবস্ত্রাদি বিক্রীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে সরকারী দোকান খোলা হয়েছে বিভিন্ন মহকুমায় । কিন্তু পরিচালনায় তাঁতীদের অংশগ্রহনের সুযোগ না থাকায় অধিকাংশ সরকারী দোকান লোকসান দিয়ে ক্রমশ পটল তুলেছে ।

ত্রিপুরায় কৃষির পরেই সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ তাঁত শিল্পে নিযুক্ত রয়েছে । তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুই লক্ষাধিক তাঁতকর্মী তার মধ্যে ৩২ শতাংশ হল নারী । অর্দ্ধেক হল উপজাতি ।

রাজ্যের প্রতিটি উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে তাঁত রয়েছে । শত শত বছর ধরে তারা পরিবারের প্রয়োজনীয় পোষাক পাছড়া- বেডশীট-চাঁদর ইত্যাদি অবসর সময়ে নিজেরাই তৈরী করে । বাজারে বিক্রী করার জন্য কিছুই তৈরী করা হতোনা । ভারত ভুক্তির আগে ত্রিপুরায় উপজাতি তাঁত শিল্পের কোন বাজারও ছিলনা ।

বর্তমানে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে উপজাতি কর্মীদের দক্ষতা আধুনিক রুচির উপযোগী নানা ধরনের পন্য তৈরীর কাজে লাগানো হচ্ছে । ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার ও উন্নতি ঘটছে ।

তাঁত শিল্পীরা নিজেরাই শ্রমিক নিজেরাই মালিক । কাজেই তাদের মধ্যে শ্রেনী সংঘাত নেই । একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় কুটির শিল্প হল তাঁত শিল্প ।

এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন হল নিয়মিত প্রশিক্ষণ-ঋনের ব্যবস্থা করা, পণ্যদ্রব্য বিক্রীর ব্যবস্থা করা, নায্য মূল্যে সূতা-রং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা, নায্য মূল্যে সূতারাং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা ।

তাঁত শিল্পীরাও অসংগঠিত অবস্থায় রয়েছে । বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে বিভিন্ন সংগঠনে তাঁত কর্মীরা যুক্ত হয়েছে । তবে সিটু অনুমোদিত- **ত্রিপুরা তাঁত শিল্প কর্মী ইউনিয়ন** -হল ত্রিপুরায় সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সক্রিয় সংগঠন । অধিকাংশ - তাঁতশিল্পী এই সংগঠনে যুক্ত রয়েছে । বর্তমানে ১৭৪টি সমবায় সমিতি রয়েছে । নতুন গুচ্ছ প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে বহুকর্মী । কেন্দ্রীয় অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধির জন্যই আন্দোলন করতেহচ্ছে ।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ত্রিপুরায় পেশা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার একটা জোয়ার সৃষ্টি হয় ।

কারন এই সময় পর পর দুটি যুদ্ধের ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ঘটে । বিভিন্ন পেশার মানুষদের মজুরী বৃদ্ধির প্রয়োজনে সংগঠন গড়ে তোলা জরুরী হয়ে উঠে ।

ক্ষৌরকার সমিতির আন্দোলন

ষাটের দশকে এই সময় আগরতলার ক্ষৌরকাররা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে ক্ষৌরকার সমিতি গঠন করে । সংগঠনের সভাপতি করা হয় শিক্ষক ও সাংবাদিক নিধুভূষন হাজরাকে । সম্পাদক নির্বাচিত হন অশ্বিনী কুমার বিশ্বাস । অল্পদিনের মধ্যেই বিভিন্ন মহকুমায় শাখা সংগঠন

গড়ে উঠে।

ক্ষৌরকার সমিতি সাত দফা দাবী নিয়ে রাজস্বমন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যের কাছে ডেপুটেশান দেয়। এটাই ছিল ক্ষৌরকারদের প্রথম ডেপুটেশন।

প্রধান দাবীগুলো ছিল ঃ-

১) প্রত্যেক বাজারে ক্ষৌরকারদের সেলুন করার জায়গা দিতে হবে।

২) ভূমিহীন ক্ষৌরকারদের বাজারের কাছাকাছি গৃহ নির্মানের জন্য ভূমি দিতে হবে।

৩) মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে চুলকাটার মজুরী চার আনার স্থলে আটআনা ধার্য করতে হবে। দাঁড়ি কাটার মজুরী ১০ পয়সার পরিবর্তে চার আনা করতে হবে।

৪) ক্ষৌরকারদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

৫) ক্ষৌরকারদের সেলুন নির্মানের জন্য সহজ শর্তে ঋণ দিতে হবে। ইত্যাদি।

ডেপুটেশানের তারিখ থেকেই ক্ষৌরকারদের নতুন মজুরীর হার কার্যকর করা হয়।

এই ঘটনায় উৎসাহী হয়ে লন্ড্রীর কর্মীরাও একটি সমিতি গঠন করে মজুরী বৃদ্ধি ঘটায় এবং অন্যান্য দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। এগুলো ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহন করেন।

অন্যান্য অসংগঠিত শ্রমিকদের আন্দোলন

ভারতে ৪৫কোটি কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে ৪০ কোটি মানুষই বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে নানা পেশায় কাজ করে। এরাই হল দেশের মূল জন শক্তি। এদের উন্নতির উপরই নির্ভর করে দেশের প্রকৃত উন্নতি।

বর্তমান ইউ.পি.এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেছেন দেশের উন্নয়নের ফসল যাতে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ভোগ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকেই নজর দেবে।

অসংগঠিত শ্রমজীবীদের একটা বড় অংশই হল ক্ষেতমজুর এবং দিন মজুর। এছাড়াও রয়েছে নানা পেশার মানুষ। যেমন মৎসজীবী, চর্মশিল্পী, বাগিচা শ্রমিক, দরজী, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থায় নিযুক্ত কর্মী রং মেস্তরী, কাঠমেস্তরী, মৃতশিল্পী, ইটভাটায় কর্মরত শ্রমিক, কৃষিখামারের শ্রমিক, স- মিল, আটা-কল ময়দা-কল, প্রেস, বেকারী, চানাচুর, খেলনা তৈরী, ইত্যাদি নানা পেশায় নিযুক্ত কর্মী। ক্ষৌরকার, স্বর্ণকার, টিউবওয়েল, খাদ্য-গোদাম, সিনেমা, আসবাব-শিল্প, বাঁশ-বেত-শিল্প, লৌহা ও সিমেন্টের-গ্রীল তৈরী ইত্যাদি হাজারো রকমের পেশায় নিযুক্ত রয়েছে দেশের ৪০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ। এরা সংগঠিত কারখানার শ্রম আইনের সবরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

দেশের কোন রাজনৈতিক দলই এসব নির্বাচনী প্রচারে আন্দোলনে এসব অসংগঠিত শ্রমিকদের অসংগঠিত শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ভাবনা চিন্তা করেনি ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আঞ্চলিক দলগুলো এই সমস্যার সুযোগ নিয়েই গড়ে উঠেছে। ফলে জাতীয় দলগুলোর গ্রামীন ভোট ব্যাংক দ্রুত ভেঙ্গে পড়েছে। হিন্দুত্ব বাদীরাও এই সুযোগ ব্যবহার করে

শক্তিশালী হয়েছে ।

ত্রিপুরায় সত্তরের দশকে এই সমস্যাটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কর্মচারীনেতা অজয় বিশ্বাস । তিনিই প্রথম প্রতিটি দপ্তরে দপ্তরে পৃথক পৃথক সংগঠন গড়ে সর্বস্তরের কর্মীদের দাবী দাওয়া ও সমস্যা পর্যালোচনা করে দাবী সনদ তৈরী করে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে ব্যপক গণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন । তারই ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার ।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর গ্রামীন গরীব মানুষের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে পঞ্চায়েত মাধ্যমে গ্রামীন উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে । তারপর থেকেই গ্রামীন অসংগঠিত শ্রমজীবীদের সংগঠিত করার কাজে সিটু নেতারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছে । বর্তমানে অধিকাংশ অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ সিটু অনমোদিত পেশা ভিত্তিক ইউনিয়নে সংগঠিত হয়েছে ।

অসংগঠিত শ্রমিকদের প্রধান সমস্যা হল বছরের অধিকাংশ সময় কাজ থাকেনা। ত্রিপুরায় বর্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলে এই রাজ্যে সমস্যা আরো তীব্র হয় । পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যেই এটা হল প্রধান সমস্য । ফলে অসংগঠিত শ্রমিকদের অধিকাংশই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে । বছরের অধিকাংশ সময় সপরিবারে অর্দ্ধহারে বা অনাহারে দিন কাটায় । বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে অনাহার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার উপায়ও বর্তমানে নেই ।

সারা ভারতেই বিভিন্ন কারণে অসংগঠিত শ্রমিকরা সারা বছর কাজ পায়না । প্রান্তিক চাষীরাও বছরের একটা সময় দিন মজুরে পরিনত হয় ।

বামপন্থীরাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য সারা দেশ ব্যাপী গণ আন্দোলন সংগঠিত করেছে । আঞ্চলিক দলগুলিও এই সমস্যা সমাধানের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েছে । ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জনকল্যাণমূলক কিছু প্রকল্প ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে ।

১৯৭২ সালে ইন্দিরা গান্ধী গরীবি হঠাও স্লোগান দিয়ে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন । কিন্তু বিরোধীরা ইন্দিরা হঠাও দেশ বাঁচাও স্লোগান দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলায় বিব্রত প্রধানমন্ত্রী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে জনকল্যানমুখী ২০দফা কর্মসূচী ঘোষনা করেন। দেশের গরীব মানুষের স্বর্থে এটাই ছিল প্রথম কর্মসূচী।

রাজীব গান্ধীর সময় পঞ্চায়েত আইন গঠন করে সারা দেশে গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয় । কিন্তু রাজীব গান্ধীর অকালে মৃত্যু ঘটিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রামীণ উন্নয়নের পথ বন্ধ করে দেয় ।

নরসীমা রাওয়ের সময় উদারনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাবে অসংগঠিত শ্রমিকদের জীবনে চরম সংকট সৃষ্টি হয় । ফলে সারা দেশে তীব্র গণ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়।

গণ আন্দোলনের চাপেই পরবর্তী সব সরকারই অসংগঠিত শ্রমিকদের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প সারা দেশে চালু করতে বাধ্য হয় ।

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের মুল লক্ষ্য হল -

১) বছরে ১০০ দিন কাজ নিশ্চিত করা ।

২) স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যবস্থা করা

৩) দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পেশায় উন্নত প্রশিক্ষন দেওয়া

৪) বয়স্ক পেনশন যোজনা

৫) বিধবা পেনশান, যোজনা

৬) মহিলাদের গর্ভকালীন সুযোগ সুবিদা দেওয়া ইত্যাদি ।

প্রকল্প ঘোষিত হলেই তা কার্যকর হয়না । প্রবল গণ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করেই প্রকল্প রূপায়নে সরকারকে বাধ্য কবতে হয় । বামপন্থীরাই সারা দেশে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণী ভিত্তি বদলে যাচ্ছে ।

নবম অধ্যায়

ত্রিপুরায় কৃষক আন্দোলন

রাজন্য যুগের ত্রিপুরায় জুম চাষীরাই ছিল প্রধান । সমতল চাষীরা ছিল সংখ্যায় নগন্য । রাজ্যে কোন জমিদার ছিলনা । কাজেই কৃষি ক্ষেত্রে শ্রেণী সংঘাতও ছিলনা । তালুকদার দের জমি চাষ করার মত লোকই পাওয়া যেতনা । পতিত জমির নগন্য খাজনা দিতে না পারার জন্য বহু তালুক নীলামে বিক্রী হয়ে যেত । মহকুমা অফিসে যারা কাজ করতো তারা এসব নীলামী সম্পত্তি কিনে নিত । অনেক সময় জমির মালিক জানতেই পারতোনা যে তার জমি বকেয়া খাজনার দায়ে নীলামে বিক্রী হয়ে গেছে ।

ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর উদ্বাস্তু কৃষকেরা পুনর্বাসন লাভ করে পতিত জমি উদ্ধার করে সমতল চাষীতে পরি নত হতে ৫০ এর দশক কেটে গেছে । কাজেই ষাটের দশকের আগে ত্রিপুরায় কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেনি ।

১৯৫৮ সালে হঠাৎ করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ বন্ধ করে দেবার ফলে উদ্বাস্তু কৃষকদের জন্য সরকারী খাস জমি দখল করার একটা আন্দোলন কমিউনিষ্ট পার্টি শুরু করেছিল । বেশ কিছু খাস জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল । এই আন্দোলনের নেতাদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল । কিন্তু খাস জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৬০ সালে ত্রিপুরায় প্রথম ভূমি সংস্কার আইন প্রয়োগ করা হয় । ত্রিপুরায় বিধানসভা না থাকায় ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন- ১৯৬০ পার্লামেন্টে পাস করতে হয় । এই আইনে উপজাতিদের জমি অউপজাতিদের কাছে বিক্রী করা নিষিদ্ধ হয়। বিশেষক্ষেত্রে সরকারী অনুমতি নিয়ে বিক্রী করার সংস্থান রাখা হয় ।

এই আইন পাস করাার পরও সারা রাজ্যে উদ্বাস্তুদের কাছে দুঃস্থ উপজাতিরা নানা কারনে জমি হস্তান্তর করতে বাধ্য হয় । অনেক সময় জমি বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়ার জন্যও জমি হস্তান্তর হয়েছে ।

ফলে এসব বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার জন্য আন্দোলন শুরু হয় । এই আন্দোলন শুরু করে সিপি আই । পরে পার্টি ভাগ হবার পর দুই কমিউনিষ্ট পার্টিই কোথাও যৌথভাবে কোথাও পৃথকভাবে এই আন্দোলন করতে থাকে ।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হবার পর তাদের চার দফা দাবীর মধ্যে বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার দাবীটি প্রধান দাবী হয়ে উঠে । দুই কমিউনিষ্ট পার্টি এবং গণ মুক্তি পরিষদও এই দাবীতে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় ।

কিন্তু যুবসমিতি দাবী করে এই আন্দোলনে শুধু উপজাতিরাই অংশ গ্রহন করতে পারবে । তাদের এই দাবী মেনে নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচী বাতিল হয় । প্রত্যেক দল পৃথকভাবে আন্দোলন শুরু করে ।

উপজাতিদের জমি কোন উদ্বাস্তুই জোর করে দখল করেনি । আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে

মূল্য ধার্য্য করে লেনদেন করেছে । কিন্তু আইনগত ভাবে দলিল রেজেষ্ট্রী করা সম্ভব হয়নি ।

আসল সমস্যা দেখা দিয়েছে উপজাতিরা জমি হস্তান্তর করে নতুনভাবে খাস জমি সংগ্রহ করতে না পারায় । জমির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠার ফলে উপজাতি কৃষকরা দারুণ সংকটে পড়ে যায়।

এরাজ্যে উপজাতিরা কখনো জমির অভাব উপলব্ধি করেনি । এক জমি ছেড়ে অন্য জমিতে জুমচাষ করার অভ্যাস দীর্ঘ কাল ধরে চলে আসছে । কোথাও কোন বাধা ছিলনা ।

উদ্বাস্তু আগমনের ফলে পরিস্থিতির অমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে, এটা উপলব্ধি করা উপজাতি চাষীদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । কারন এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন এক অভিজ্ঞতা।

১৯৬০ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বেআইনী জমি ফেরৎ দেবার আন্দোলন সারা রাজ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নানা রকম বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয় । দরিদ্র উদ্বাস্তু কৃষকরা আবার জমি-হারিয়ে ভূমিহীন হবার ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে ।

১৯৪৭ সালে ত্রিপুরা বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধনী বিল পাস করেন । এই আইনের ফলে ১৯৬০ সালের আইন অনুযায়ী বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ পাওয়ার সুযোগ সংকুচিত করা হয় । ট্রাইবেল রিজার্ভ ভেঙ্গে দেওয়া হয় । বেআইনী হস্তারের কাজ ১৯৬০ এর পরিবর্তে ১৯৬৯ এর পর থেকে শুরু করার নীতি ঘোষণা করা হয় । অথচ বেশীর ভাগ বেআইনী হস্তান্তর ঘটেছে ১৯৬৯ সালের আগে । এভাবে সংশোধনীর মাধ্যমে বেআইনী জমি হস্তান্তরের দাবীকে সংকোচিত করা হয় ।

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় আবার ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করা হয় । এবারের লক্ষ্য হলো উপজাতিদের সিলিং বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি দখল করা ।

ত্রিপুরায় উপজাতি সমাজের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী জমি পরিবারের প্রধান কর্তার নামে থাকে । পিতা অথবা পিতার অবর্তমানে বড়ভাইয়ের নামে পরিবারের সব জমি থাকে । পরিবার ক্রমাগত ভাগ হবার পরও জমির দলিল সাধারণত ভাগ করা হয় না । সরকারী দপ্তরের হয়রানীর ভয়ে গ্রামের সর্দারের মধ্যস্থতায় ভাগ বাটোয়ারা হয় ।

সিলিং আইন পাশ করার ফলে উপজাতিরা পরিবারের জমি ভাগ বাটোয়ারা করে দলিল রেজিষ্ট্রী করে নেয় । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত আইন পাস হবার পরবর্তি রেজিষ্ট্রি হওয়া দলিল মানতে রাজী না হয়ে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে সিলিং আইন কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহন করেন ।

লোকসভায় দশরথ দেব অত্যন্ত জোরালো ভাবে মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তের উপজাতি স্বার্থ বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বক্তব্য

. াখেন এবং বহু উপজাতি পরিবারের দৃষ্টান্ত দিয়ে নিজের বক্তব্যকে সকলের পক্ষে গ্র ণ যোগ্য করে তুলেন । ফলে সিলিং আইন স্থগিত রাখা হয় এবং পরবর্তী নির্বাচনে জনতা সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিলিং আইন সংশোধন করেন ।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করে এবং গরীব উদ্বাস্তু কৃষকদের বিকল্প জমি বা নগদ ক্ষতিপূরণ দিয়ে

সমস্যার সমাধানে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

বর্তমানে সমস্ত সমতল চাষীদের সমস্যাই একরকম । কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা, উন্নত জাতের বীজ সার ও জল সেচের ব্যবস্থা করা , প্রয়োজনের সময় ব্যাংক ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা কাঁচামাল সংরক্ষনের জন্য কোল্ড স্টোর স্থাপন কবা । বাঙ্গালী এবং উপজাতি কৃষকদের একই সমস্যা সমাধানে বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে । গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কৃষকদের সমস্য সমাধানের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ কর্মে বিভিন্ন এলাকায় অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে । নিরপেক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে । কিছু কিছু এলাকায় দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । এসবের দ্বারা প্রমাণ হয় সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও গণ আন্দোলন ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও সঠিকভাবে চালানো সম্ভব হয়না ।

ত্রিপুরায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটি কবে কৃষক সংগঠন রয়েছে । কিন্তু বিগত ৫০ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য একমাত্র বামপন্থী দলগুলোই আন্তরিকভাবে গণ আন্দোলন গংগঠিত করে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করে চলেছে ।

কংগ্রেস **অনুগামী-কৃষক কংগ্রেস** কখন কার স্বার্থে আন্দোলন করেছে তার কোন তথ্য ত্রিপুরার কোন পত্রিকায় খুঁজে পাওয়া যায়না ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গান্ধীজী কৃষক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন । কারণ তখনকার কৃষক আন্দোলন ছিল জমিদারদের বিরুদ্ধে । গান্ধীজীর মতে স্বাধীনতা আন্দোলনে কৃষক এবং জমিদার উভয়েরই সমর্থন পাওয়া দরকার । কিন্তু কংগ্রেসদলের বাম পন্থী নেতারা গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করেই কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেন এবং বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারদের অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন।

পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, অন্ধ্র উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের বাম পন্থী কংগ্রেস নেতারা শেষ পর্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে কৃষক আন্দোলনকে জঙ্গী রূপ দেন । এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন রাজ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয় ।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রতিটি রাজ্যেই কংগ্রেস সরকার গুলো কৃষক স্বার্থ বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে। কারণ গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস দলের মুল নেতৃত্বে ছিল জমিদার, তালুকদার, ধনী কৃষক এবং মহাজন শ্রেনী । এরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ছিল বৃটিশের পক্ষে, স্বাধীনতার পরে রাতারাতি কংগ্রেস ভক্ত হয়ে গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস নেতা বণে গেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে জমিদার শ্রেনী ছিলনা । এখানে উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রাক্তন জমিদার, তালুকদার , জোতদার এবং মহাজনরা ছিল । তারা কংগ্রেস দলের সংগঠন তৈরী করে খুব সহজেই কংগ্রেস নেতা বনে গেছেন । উদ্বাস্তু কৃষকেরা বাঁচার তাগিদে তাদের অনুগামী হয়েছিলেন।

ত্রিপুরায় ৩০ বছরের কংগ্রেস শাসনে বাঙ্গালী কৃষকদের মোহমুক্তি ঘটেছে । ১৯৭০ সালে সারা ভারতে সিপিআই অনুগামী সারা ভারত কৃষক সভা ভূমিহীন কৃষকদের জন্য উদ্বৃত্ত জমি, বেআইনী হস্তান্তরিত জমি এবং সরকারী খাস জমি দখল করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করার আন্দোলন শুরু করে । ত্রিপুরায় উদয়পুর বিলোনীয়া এবং সাব্রুম অঞ্চলে এই আন্দোলনের

নেতৃত্ব দেন জুনু দাস, মোহন চৌধুরী, সুনীল দাস এবং শ্যামল চৌধুরী । বেশ কিছু খাস পতিত জমি দখল করে ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয় এবং আইনগত দখলি পাট্টা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় । কৈলাশহর ও কমলপুরে জমি দখলের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন - রাখাল রাজ কুমার, মনোরঞ্জন বসাক, বিজয় সরকার এবং রাসবিহারী ঘোষ ।

কৃষকদের মধ্যেও নানা স্তর রয়েছে । ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, ভূমিহীন ক্ষেত মজুর । প্রত্যেক স্তরের স্বার্থ গত পার্থক্য আছে ।

সব কৃষকই চেষ্টা করে ক্ষেত মজুরদের যাতে কম মজুরী দিয়ে খাটাতে পারে এবং ফসলের দাম যাতে বেশী পেতে পারে ।

এই দুটি ক্ষেত্রেই ক্ষেত মজুরের স্বার্থে আঘাত পড়ে । ক্ষেত মজুররা ন্যায্য মজুরী পায় না , আবার ফসলের দাম বেশী হলে কিনে নিতে পারেনা । এজন্যই ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাদা সংগঠন গড়তে হয়েছে । তাদের জন্যই প্রয়োজন নিম্নতম মজুরী এবং ফসলের ন্যায্যদাম ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যের মূল্য যাতে বৃদ্ধি না ঘটে এবং ন্যায্য মূল্যে যাতে সার, বীজ, সেচ, বিদ্যুৎ এবং কৃষি সরঞ্জাম পাওয়া যায় তার জন্য কৃষকদের আন্দোলন করতে হয় ।

সারা ভারতের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তা প্রধানত ধনী ও মাঝারী কৃষকেরাই ভোগ করে । যেমন জল সেচের জন্য পাম্প মেশিন পেতে হলে দামের একটা অংশ কৃষককে বহন করতে হয় । গরীব কৃষকেরা এই সুযোগ নিতে পারেনা । ফলে কৃষি উৎপাদনের ক্ষতি হয় ।

এই সমস্যা দুর করার জন্য কৃষি সমবায় গঠন করার আন্দোলন করতে হয়েছে। ত্রিপুরায় আন্দোলনকারী নেতারাই সরকারে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে ত্রিপুরার গরীব কৃষকরা এইসব সুযোগ ভোগ করতে পারছে । অথচ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে গরীব কৃষকেরা ঋণের দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে । অনাহারে ও মৃত্যু বরণ করছে । ত্রিপুরায় এমন ঘটনা ঘটেনি ।

অর্থকরী ফসলের ন্যায্য মূল্য না পেয়ে কৃষকরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ত্রিপুরায় পাট চাষীরা ও রাবার চাষীরা এই সংকটে ভুগছে । বিভিন্ন সময় ফসলের দাম উঠানামা করার ফলে প্রান্তিক চাষীরা আত্মরক্ষার জন্য জমি বন্ধক দিয়ে বা বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয় । গ্রামাঞ্চলে এই সংকটের সুযোগ নিয়ে ধনী ও মাঝারী কৃষকেরাও মহাজনী ব্যবসা করছে ।

বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো —

১) প্রান্তিক ও গরীব কৃষকরা যাতে জমি বিক্রী বা বন্ধক দিতে বাধ্য না হয় সে জন্য সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা । প্রত্যেক কৃষকের জন্য কিষান কার্ড ব্যবস্থা করা ।

২) ধনী কৃষক বা গ্রামীন মহজনরা যাতে খাদ্য শস্য মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে সে দিকে নজর দেওয়া ।

৩) অভাবের সময় কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্যে খাদ্য সামগ্রী কিনতে পারে তার জন্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য করা ।

৪) কৃষকরা যাতে কোন কারনেই জমি থেকে উচ্ছেদ না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া ।

৫) মহাজনরা যাতে অভাবী কৃষকদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে অস্বাভাবিক হারে সুদ আদায় করতে না পারে এবং ঋণের দায়ে কৃষকের জমি কেড়ে নিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে ।

৬) কৃষকেরা যাতে ন্যায্যমূল্যে সার-বীজ-বিদ্যুৎ-কীটনাশক ঔষধ ও জলসেচের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

৭) কৃষকদের বাস্তু জমি ও আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । যাদের বাস্তু জমি আছে তাদের বাসগৃহ নির্মান বা মেরামতের ব্যবস্থা করতে হবে ।

৮) কৃষকের ছেলে মেয়েরা যাতে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯) বৃদ্ধ কৃষকদের পেনসনের সুযোগ করে দিতে হবে ।

১০) সামাজিক সর্বপ্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে ।

১১) কৃষিপণ্য বিক্রীর জন্য সব বাজারে শেড নির্মানের ব্যবস্থা করা ।

১২) কৃষকদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি করা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

ত্রিপুরার কৃষকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবিত বিভিন্ন সংগঠনে সদস্য ভুক্ত হয়ে আছে । সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী সংগঠন হল সিপিএম অনুমোদিত সারা ভারত কৃষক সভা । বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সম্পাদক - নারায়ন কর- সহ সম্পাদক- নারায়ন দেবনাথ - সভাপতি- নিরঞ্জন দেববর্মা- সহসভাপতি- পবিত্র কর - সুবোধ দাশ, চিত্ত চন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

অবিভক্ত সিপিআই দলও সারা ভারত কৃষক সভা- নামেই কৃষক সংগঠন গড়ে তুলেছিল, এখনো এই নামেই সংগঠন কাজ করছে । দুই কমিউনিষ্ট পার্টি সারা দেশে যৌথ কৃষক আন্দোলনের পরিকল্পনা করছে । সি পি আই প্রভাবিত সারা ভারত কৃষক সভায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন - সুনীল দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎ মজুমদার, বিজয় সরকার, মনোরঞ্জন বসাক , রাসবিহারী ঘোষ, তরনী বণিক, প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ত্রিপুরায় ক্ষেতমজুরদের আন্দোলন

সারা ভারতে কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ক্ষেত মজুরদের পৃথক সংগঠন গড়ে উঠেছে । স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এরকম পৃথক সংগঠন ছিলনা ।

স্বাধীনতার পরে সুদীর্ঘকাল যাবত ভূমি সংস্কার না হওয়ায় প্রতিটি রাজ্যেই ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে । গরীব কৃষকেরাও নানা কারনে জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিনত হয় ।

ভূমিহীন কৃষকেরা এক সময় দলে দলে শহরের কলে কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দিত । কিন্তু স্বাধীনতার পরে বহু শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্য বিত্ত পরিবারের যুবকেরা-কারখানায় শ্রমিকের কাজে যোগ দিতে থাকায় গ্রামীন ভূমিহীন নিরক্ষর কৃষকেরা কারখানায় কাজ করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয় । ফলে গ্রামের কৃষিক্ষেত্রেই ক্ষেত মজুরের কাজে নিযুক্ত হতে থাকে ।

ভারতের কোন রাজ্যেই কৃষিক্ষেত্রে সারাবছর কাজ থাকেনা । বছরের অধিকাংশ সময় বেকার হয়ে ক্ষেত মজুররা অনাহারে অর্দ্ধাহারে জীবন কাটাতে বাধ্য হয় । সামান্য অসুখেও অকাল মৃত্যু বরণ করে ।

ত্রিপুরায়ও ক্ষেত মজুরদের অবস্থা একই রকম । আসলে এটা একটা জাতীয় সমস্যা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে । ফলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব পূর্ণ প্রকল্প সৃষ্টি করতে হয়েছে । ইন্দিরা গান্ধীর বিশদফা কর্মসূচী এই লক্ষ্যে সারা দেশের জন্য প্রথম কর্মসূচী ছিল।

পরবর্তীকালে সব কয়টি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। রাজীব গান্ধীর সময় জানা গেল এসব প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের বিপুল অংশই মধ্যপথে উধাও হয়ে যায় । তাই ত্রিস্তব পঞ্চায়েত গঠন করে গ্রামীন উন্নয়নের সমস্ত প্রকল্প পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত করার উপযোগী আইন তৈরী করা হয় ।

কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যে এখনো এসব প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ নানাভাবে নয়ছয় হয়ে যাচ্ছে। ফলে বর্তমান ইউ. পি. এ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ঘোষণা করেছেন গ্রামীন উন্নয়ন প্রকল্পে কেন্দ্রীয় তদারকী ব্যবস্থা চালু করা হবে ।

ক্ষেত মজুরদের প্রধান সমস্যা হল নিয়মিত কাজ না পাওয়া । দ্বিতীয় সমস্য হল নিম্নতম মজুরী না পাওয়া । তৃতীয় সমস্যা হল অধিকাংশ ক্ষেতমজুরেব বাসগৃহের অভাব চতুর্থ সমস্য হল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাব । পঞ্চম সমস্যা হল অভাবের দিনে সহজ শর্তে ঋন পাওয়া এবং ন্যায্য মূল্যে খাদ্যশস্য ক্রয়ের অক্ষমতা ।

ক্ষেতমজুরদের অধিকাংশ হল তপশীলিভূক্ত জাতি- উপজাতি ও পশ্চাৎপদ শ্রেনীব মানুষ । আবার এরাই হল রাজ্য বিধান সভা এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটারদের প্রায় ৬০ শতাংশ । কাজেই কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই এদের উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছেনা । সুদীর্ঘ কাল এই সমস্যা উপেক্ষিত হবার ফলে বহু রাজ্যেই জাত-পাতের ভিত্তিতে আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে কোয়ালিশনের যুগ শুরু হবার ফলে আঞ্চলিক দল গুলোর গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এতকালের বঞ্চিত মানুষেরাও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে ।

সারা ভারতে এখনো পর্যন্ত বামপন্থীরাই ক্ষেত মজুর সংগঠনের শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করেছে । সারা দেশ ব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করার ক্ষমতা অর্জন করছে ।

ক্ষেত মজুরদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিম্নলিখিত প্রকল্প ঘোষণা করেছে ।

১) প্রতিটি ক্ষেত মজুর পরিবারের একজনকে বছরে ১০০ দিন কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে ।
২) নিম্নতম মজুরী স্থির করা হবে ।
৩) স্ত্রী পুরুষের সমান মজুরী দেওয়া হবে ।
৪) শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে ।
৫) আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে ।

স্বাধীন ভারতের ৫৫ বছরের ইতিহাসে শোষিত শ্রেণীর কোন দাবীই গণ আন্দোলন ছাড়া আদায় করা বা কার্যকর করা যায়নি । এই আন্দোলনের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলেছে বামপন্থী দলগুলো । ত্রিপুরায় দুই কমিউনিষ্ট পার্টির একই নামের দুই সংগঠন-ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন -কখনো যৌথভাবে কখনো পৃথকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে । সি.পি. এম প্রভাবিত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন - সভাপতি চিত্ত চন্দ, সম্পাদক ভানুলাল সাহা ।
সি.পি. আই প্রভাবিত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব দিচ্ছেন -- সুনীল দাশগুপ্ত, গৌরমোহন সিং ও অমল সাহা ।
বর্তমানে প্রধান দাবী হল বছরে ১০০ দিনের কাজ, সর্বনিম্ন মজুরী, প্রত্যেকের জন্য বি পি এল কার্ড, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় আইন ও আবাসন ব্যবস্থা করা ।

গৃহপরিচারিকাদের আন্দোলন

ত্রিপুরায় গৃহ পরিচারিকাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে । অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল পরিবার গুলোতে আংশিক বা সর্বক্ষনের কাজের জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত কবা হয়।

ত্রিপুরায় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, অফিসার, ঠিকাদার, ব্যবসায়ী এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক সারা বছরই আংশিক সময়ের জন্য বা সর্বক্ষনের জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করেন । এসব পরিবারে পরিচারিকারা অপরিহার্য অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহেলিত এবং অবজ্ঞার পাত্র ।

বর্তমানে ঝি-চাকর-চাকরাণী ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে কাজের মাসী শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে । কিন্তু সামাজিক মর্যাদা এখনো স্বীকৃত হয়নি ।

যখন খুশী নিযুক্ত করা এবং যখন খুশী ছাঁটাই করা এই স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব এখনো খুবই প্রবল । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মজুরী বা বেতনের পরিমাণ সামান্য । একদিন কাজে না এলেই বেতন কাটা যায় । অসুস্থ হলে ও বেতন কাটা যায়, আবার চিকিৎসার খরচও দেওয়া হয়না ।

এই সব, অবহেলিত ও অসংগঠিত কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হলেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে । বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার আসার পর এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু হয় । কিন্তু এই সব অসংগঠিত কর্মীরা নানা জনের পরামর্শে বিভ্রান্ত হয় । কোন আন্দোলনে যুক্ত হলে সামান্য কাজটাও হারাবার ভয়ে কোন সংগঠনে যোগ দিতে চায়না ।

বর্তমানে বামপন্থী সরকার স্থায়ী হওয়ায় এবং বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় পরিচারিকাদের একটা বড়অংশই সাহস করে সংগঠন গড়তে এগিয়ে এসেছে ।

সিটু অনুমোদিত দিন মজুর ইউনিয়নের উদ্যোগে ১১ই অক্টোবর ২০০৪ তারিখে দশরথ দেব স্মৃতি ভবনে ত্রিপুরায় প্রথম পরিচারিকাদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় । বিভিন্ন মহকুমা থেকে কয়েকশত প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগ দেন ।

বিস্তারিত আলোচনায় পরিচারিকাদের বহু অজানা দুর্দশার কথা জানা যায় । সামাজিক মর্যাদা হীনতা এবং অবজ্ঞা সর্বত্র বিরাজমান ।

পরিচারিকা ছাড়া যাদের একদিনও চলেনা তারা একথা মনে রাখে না যে পরিচারিকারাও

মানুষ । এদেরও ঘর সংসার আছে । ছেলে-মেয়ে-স্বামী আছে । তাদেরও অসুখ-বিসুখ এবং অন্যান্য সমস্যা আছে । কথায় কথায় ছাঁটাই করার হুমকি দিয়ে এদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয় ।

ত্রিপুরায় পরিচারিকাদের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হবে । তারমধ্যে অনেকে আংশিক ভাবে পাঁচ ছয়টি বাড়ীতে পর পর বাসন ধোয়া, ঘর ঝাট দেওয়া ও মোছা, কাপড় চোপড় ধোলাই করা ইত্যাদি কাজ করতে হয় । সারাদিন কাজ করেও সংসারের অভাব দূর করা যায়না । প্রতিদিনই বিভিন্ন বাড়ীতে গিন্নিদের মুখ ঝামটা সইতে হয় । দশ মিনিট দেরী হলেও কৈফিয়ত দিতে হয় । মোট- কথা পরিচারিকাদের প্রতি ব্যবহার অনেকটা ক্রীত দাসের মত ।

সাবাভারতে পরিচারিকাদের সংখ্যা কয়েক কোটি । কোন রাজনৈতিক দল এদের সংগঠিত করার কথা ভাবেনি । কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারও এদের কথা ভাবেনা । অথচ এরাও এদেশের নাগরিক । এদেরও সামাজিক মর্যাদা এবং বাঁচার অধিকার আছে । এদের জন্যও কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োজন ।

আইন পাস করলেই অধিকার অর্জন করা যায়না । স্বাধীন ভারতে বিগত ৫৫ বছরের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে । পরিচারিকাদের সংগঠন আগামী দিনে লড়াইয়ের ময়দানে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে আশা করা যায় ।

আপাততঃ চার দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারক লিপি পেশ করা হবে । যেসব বাড়ীতে পরিচারিকারা কাজ করেন সেসব বাড়ীতে লিখিত ভাবে দাবী পত্র প্রেরণ করা হবে । তাছাড়া প্রতিটি পঞ্চায়েতে - নগরপঞ্চায়েতে ও রাজধানীর পুর কাউন্সিলে বিশেষ দাবীপত্র পেশ করা হবে । নিম্নতম মজুরী নির্ধারনের জন্য শ্রমদপ্তরকে চাপ দেওয়া হবে ।

প্রধান ৪ টি দাবী হল ঃ-

১) বর্তমান মজুরী ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে ।
২) সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে হবে ।
৩) অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ।
৪) বছরে একবার পূজা বোনাস দিতে হবে ।

বিশেষ দাবীগুলো হল ঃ-

১) প্রত্যেক পরিচারিকাকে পরিচয় পত্র দিতে হবে ।
২) উৎসবের সময় কাপড় দিতে হবে ।
৩) গৃহহীনদের আবাস গৃহের ব্যবস্থা করতে হবে ।
৪) প্রত্যেককে বি পি এল কার্ড দিতে হবে ।
৫) কাজের উপর ভিত্তি করে মজুরী বা বেতন নির্ধারনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন পিযুষ নাগ, চিত্ত চন্দ, এবং শংকর দত্ত ।
সি পি আই দলেরও একটি ছোট সংগঠন কাজ করছে ।

গৃহ পবিচারীকাদেব সম্মেলন

চিত্ত চন্দ   সরোজ চন্দ   শ্যামল চৌধুরী   সুনীল দাস

মনোরঞ্জন কলাক   বিজয় সরকার   রঞ্জিত মজুমদার   তরুণী বণিক

দশম অধ্যায়

ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ঐতিহাসিক কারনে ত্রিপুরায় অধিকাংশ জনগোষ্ঠী উপজাতি স্তর অতিক্রম করে জাতি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করতে পারেনি ।

রক্তের সম্পর্কে তৈরী হয় উপজাতি গোষ্ঠী । প্রত্যেক গোষ্ঠীর নানা শাখা প্রশাখা মূলত একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় ।

একই ভৌগলিক সীমানায় স্থায়ীভাবে, বসবাসকারী একই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত,একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে গড়ে উঠা সামাজিক জীবনধারা, এবং একই ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মিলনে গড়ে উঠে একটি জাতি ।

জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হল লিখিত ভাষা,-সাহিত্য এবং সমবেত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ।

রাজন্যযুগের ত্রিপুরায় লিখিত ভাষার অভাবে জাতি গঠন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটেনি। ১৯৪৯ সালে ভারতভুক্তির পরও ত্রিশ বছর ধরে কংগ্রেস শাসনকালে ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী গুলোর জন্য লিখিত ভাষার সৃষ্টি করে মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য লিখিত ভাষার সৃষ্টি করে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের কাজটি শাসক গোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছে ।

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরই প্রথম উপজাতিদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে । বাংলা হরপে ককবরক ভাষার পাঠ্যপুস্তক তৈরী করে ব্যাপকভাবে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে।

কিন্তু লিপি বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় ককবরক ভাষায় শিক্ষার গতি বার বার বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে । বাংলা হরফ এবং রোমান হরফের সমর্থকরা প্রায় সমান দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ।

উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দশরথ দেব বাংলা হরফে ককবরক ভাষা চালু করার পক্ষে অত্যান্ত জোরালো বক্তব্য সহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার বিশ্লেষন করে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থিত করে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন । বাংলা ভাষার মাধ্যমে যারা শিক্ষিত হয়েছেন তারা খুব সহজেই দশরথ দেবের যুক্তির দ্বারা প্রবাভিত হয়েছেন ।

অন্যদিকে ইংরেজী মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীতে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন তারা রোমান হরফের পক্ষে নানা যুক্তি দেখাচ্ছেন । বিখ্যাত ভাষাবিদরাও ত্রিপুরার সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বাংলা হরফকেই ককবরক ভাষার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মতামত দিয়েছেন ।

সি পি আই দলের উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে ত্রিপুরায় ককবরক ভাষার লিপি নির্মান কাজ শুরু হয় । বিখ্যাত ভাষাবিদ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ও শ্যাম সুন্দর ভট্টাচার্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে টেপকরা মৌখিক ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে এবং রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে বাংলা হরফে ককবরক ভাষার লিপি নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন । কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী ৪০ বছর ধরে ককবরক ভাষার চর্চা

করছেন । এখনো তিনি বাংলা হরফের পক্ষেই মত প্রকাশ করছেন ।

এই বিতর্কের মীমাংসা না হওয়ায় ককবরক ভাষায় শিক্ষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে । ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য কমিশন গঠন নিয়েও বিরোধ সৃষ্ট হয়েছে । ভাষা কমিশন গঠনে উপজাতি নেতা ও বুদ্ধি জীবীদের মতামত নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে ।

এসব সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে । রিয়াং সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষার পৃথক বৈশিষ্ট্যের দাবী করছে । কাজেই ত্রিপুরায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতি গঠন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক পথে বিকশিত হতে পারছেনা।

জাতি গঠন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় প্রধান শর্ত হল -রাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ। প্রজাতান্ত্রিক ভারতে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নীরব এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসই শর্ত পূরণ হয়েছে।

জাতিগঠন প্রক্রিয়ার তৃতীয় শর্ত হল-আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং বিভিন্ন আধুনিক পেশার বিকাশ ও সমৃদ্ধি ।

জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় কৃষি সমস্যার সমাধান এখনো হয়নি । কংগ্রেস শাসকরা এ বিষয়ে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেননি । অথচ ভারতের সংবিধানে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এ বিষয়টিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল । প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও হয়েছিল । কিন্তু রাজ্য সরকারের আন্তরিকতার অভাবে এ কাজে সাফল্য লাভ করা যায় নি ।

প্রতিবেশী আসাম রাজ্যেও একই ঘটনা ঘটেছে । যার ফলে আসাম রাজ্য থেকে উপজাতি অধ্যুষিত চারটি জেলা পৃথক হয়ে চারটি পূর্ণ রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুণাচল তারই সাক্ষ্য বহন করছে ।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আন্তরিকতাব সঙ্গেই মৌলিক সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় -এভাবে অগ্রসর হলে আগামী দশ বছর পর ত্রিপুরায় জুমিয়া বা জুমচাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল কোন সম্প্রদায় থাকবেনা ।

জাতিগঠন পক্রিয়ার অতিগুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল-আধুনিক নানা পেশায় অভ্যস্ত বিভিন্ন শ্রেনীর সৃষ্টি ।

বামফ্রন্ট সরকার এ বিষযেও অত্যন্ত আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । প্রতিটি মহকুমায় বিভিন্ন পেশায় শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এমনকি ভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে যুবক যুবতীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানেব সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে ।

জাতিগঠন পক্রিয়ার আরেকটি মূল্যবান শর্ত হল, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মিলন । বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রশংশনীয় অগ্রগতি ঘটিয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেস্ব ঐতিহ্য রক্ষা করেই শিল্প সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ফলে উপজাতি সংস্কৃতি বর্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে স্থান পাচ্ছে । এর ফলে ভারতীয় সংস্কৃতিই সমৃদ্ধ হচ্ছে। ভারতের বহুবিচিত্র সাংস্কৃতিক ধারায় আরেকটি নতুন ধারার সৃষ্টি হচ্ছে । যেমনটি

হয়েছে মনিপুরী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ।

হজাগিরি নৃত্য, জুমনৃত্য, গড়িয়া নৃত্য, লেবাংনৃত্য ইত্যাদি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিবেশিত হচ্ছে । এগুলো এখন আর শুধু উপজাতি নৃত্য নয় । এগুলো এখন ত্রিপুরার সংস্কৃতি এবং ত্রিপুরাবাসীর গর্ব বলেই গণ্য হচ্ছে । শিল্পীরা ও শুধু উপজাতি নয় । বহু বাঙ্গালী যুবক-যুবতী এসব নৃত্যকলা শিখে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক দলে যোগ দিচ্ছে ।

জাতি বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর হল জাতীয়তাবাদ । একটা জাতির প্রতিটি অংশই যাতে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায় তার চাহিদা থেকেই জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সূত্রপাত হয় । এই সংগ্রামের প্রধান সৈনিক হল কৃষক সমাজ । সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এই চাহিদা পূরণ করতে পারেনা বলেই সামাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়তাবাদী চাহিদা পূরণ করতে হয় ।

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে ।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং দেশীয় রাজাদের স্বেরাচারী শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে ।

ত্রিপুরায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ভিত্তিতে রাজার অধীনে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে।

১৯৩৮ সালে মহারাজা বীর বিক্রম প্রশাসনিক সংস্কারের ঘোষণা দেন । একটি সংবিধান তৈরী করে নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে একটি আইনসভা গঠনের পরিকল্পনাও ঘোষণা করা হয় । এছাড়া গ্রাম মন্ডল গঠন করে গ্রামীন উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ।

এই আধা-গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ঘোষণাকে দ্রুত কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রভাত রায় এবং বংশীঠাকুর উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে-ত্রিপুরা রাজ্য জন মঙ্গল সমিতি-গঠন করেন । এটাই ছিল ত্রিপুরায় জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূত্রপাত ।

কিন্তু তখনকার রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি । এ জন্য ১৯৫০ সালে চিনিহা পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে প্রভাত রায় গভীর ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন ।

ঐ সময় মহারাজার ঘোষনাকে অভিনন্দন জানিয়ে যে রকময় হোক একটা গণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সেটাই পরবর্তী কালে বিধানসভারূপে গণ্য হতো ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় মহারাজার ঘোষণা কার্যকর হয়নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সারা ভারতের তীব্র গণ-আন্দোলনের জোয়ার ত্রিপুরায়ও আলোড়ন সৃষ্টি করে । ভারতভুক্তির মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান হয় এবং প্রজাতন্ত্রের যুগ শুরু হয় ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর বংশীঠাকুর, প্রভাত রায় এবং বীরচন্দ্র দেব বর্মার নেতৃত্বে **প্রজামন্ডল**-গঠন এবং দশরথ দেব , অঘোর দেববর্মা ও সুধন্বা দেববর্মার নেতৃত্বে **জনশিক্ষা সমিতি** গঠন ত্রিপুরায় উপজাতি জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে । এরা সকলেই ছিলেন বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী, এই ধারা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সমগ্র উপজাতি সমাজে । ১৯৬৭ সালে **উপজাতি যুব সমিতি**

গঠনের পর উপজাতি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভাজন ঘটে ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হল প্রজাতান্ত্রিক যুগে প্রজাদের কল্যানে রাজ্যের শাসক দল সঠিক ভূমিকা না নেওয়ায় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপথ গামী হল । উগ্র জাতীয়তাবদের জন্ম হল এবং উপজাতি যুবকেরা সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে পা বাড়ালো ।

সৌভাগ্যের বিষয় হল - এই জটিল ও সংকটজনক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে একটি শক্তিশালী বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিতি হল, এবং সুস্থ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বেষ্টনীর মধ্যেই অধিকাংশ উপজাতি জনগণকে ধরে রাখতে সক্ষম হল ।

গ্রামস্তর পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিস্তার এবং সবস্তরের জনগণকে সরকারী ক্ষমতার অংশীদার করার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকাশের এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কিন্তু বিদেশী মদতে কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত যুবক এখনো সন্ত্রাসবাদী পথ ত্যাগ করতে রাজী হচ্ছেনা । প্রতিবেশী দেশগুলোতে ঘাঁটি করার সুযোগ না পেলে এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে অথবা সন্ত্রাসবাদী পথ থেকে সরে যাবে এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ।

বামফ্রন্ট বিরোধী আঞ্চলিক দল গঠন করে যে সব উপজাতি নেতারা সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা সুস্থ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেরই অংশীদার। সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তারাও সংগ্রাম করে চলছেন । দুর্ভাগ্যের বিষয় বামপন্থীদের একটা বড় অংশই এই সত্যটুকু এখনো উপলব্ধি করতে পারছেন না ।

ভারত বহুভাষা ও বহুজাতির দেশ । একটিমাত্র জাতির আধিপত্য কেউ মেনে নেবেনা । কেন্দ্রে ও রাজ্যে বহু দলীয় কোয়ালিশন সরকার গড়ে প্রতিটি জাতীকে ক্ষমতার অংশীদার হবার সুযোগ করে দিতে হবে । এটাই বর্তমান প্রজাতান্ত্রিক ভারতের প্রধান দাবী।

১৯৮৮ সালে ভারতের সংবিধানের উপর গভীর আস্থা রেখেই রাজ্যের প্রথম উপজাতি আঞ্চলিক দল উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেস দলের সঙ্গে জোট বেধে ত্রিপুরায় প্রথম বামফ্রন্ট বিরোধী জোট সরকার গঠন করেছিল । কিন্তু মিত্রশক্তি প্রকৃত মৈত্রীর পরিচয় দিতে পারেনি । ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ও দলীয় কোন্দলে বিপর্যস্ত হয়েছে জোট সরকার।

জোট সরকার জনপ্রিয় হয়নি এবং উপজাতিদের উন্নয়নে ও যথোচিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি ।

কিন্তু সরকারী ক্ষমতার অংশীদার হয়ে উপজাতি নেতারা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন । এবং তারাও যে সরকারী প্রশাসন চালাতে সক্ষম এ বিষয়ে আত্ম বিশ্বাসী হয়ে উঠেচেন।

এর ফলে ত্রিপুরায় উপজাতিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটা নতুনধারা সৃষ্টি হয়েছে । বহু বিভ্রান্ত যুবক সন্ত্রাসবাদী পথ ছেড়ে দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে । এই ধারার সৃষ্টি করেছেন-শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নগেন্দ্র জমাতিয়া, রতিমোহন জমাতিয়া, হরিনাথ দেববর্মা, অমিয় দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, সরলপদ জমাতিয়া, গৌরী শংকর রিয়াং, বুদ্ধ দেববর্মা, অনিমেশ

দেববর্মা প্রমুখ উপজাতি নেতারা । তাদেরই আকর্ষনে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বহু যুবক যোগদান করেছেন ।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন এবং বিদেশী বিতাড়নের শ্লোগান দিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন তাদের নেতৃত্বে দিয়েছিলেন বিজয় রাংখল এবং অনন্ত দেববর্মা । কংগ্রেস নেতাদের উদ্যোগেই তারা সন্ত্রাসবাদী পথ ছেড়ে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হন । ইন্দিরা গান্ধী এবং রাজীব গান্ধীর পরামর্শেই রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে জোট বাঁধতে বাধ্য হয়েছিলেন ।

ইতি পূর্বে উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা এবং জেলা পরিষদ গঠনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং উপজাতি যুব সমিতির চারটি প্রধান দাবীরই বিরোধীতা করেছিলেন । তখনই উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রশ্নে এবং স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । তবুও উপজাতি নেতারা বিশেষ পরিস্থিতির চাপেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে জোট বেঁধে ষষ্ঠতপশীলের দাবী আদায় করেছিলেন । জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনে জনশক্তির মূল উৎস হল-ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন । ভারতের জাতীয়দাবাদী আন্দোলনে ঐক্য ছিলনা বলেই স্বাধীনতার মূল্য হিসেবে দেশ বিভাজন মেনে নিতে হয়েছিল ।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হয় মতাদর্শগত ঐক্য এবং দার্শনিক ভিত্তি ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভিন্ন মতাদর্শের তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল । প্রধানত গান্ধীবাদ এবং মার্কবাদের মধ্যে ছিল তীব্র দ্বন্দ্ব ও মতভেদ । এছাড়াও ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারার প্রভাব এবং মতভেদ ছিল কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে । মুসলিম লীগের কোন মতাদর্শই ছিলনা । স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদেব কোন ভূমিকাও ছিলনা । মৌলবাদীদের অন্ধ হিন্দু বিদ্বেষ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল মুসলিম লীগ ।

ত্রিপুরায় উপজাতি জাতীয়তাবাদীদের একটা অংশ বাঙ্গালী বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তারাই সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মদত দিচ্ছে । যার ফলে উপজাতি জাতীয়তা বাদীদের মধ্যেও ঐক্য গড়ে উঠছেনা । প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যোগ্য ভূমিকা নেবার মত ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনও সৃষ্টি হচ্ছেনা ।

উপজাতি যুব সমিতি রাজ্যের প্রথম আঞ্চলিক দল হিসেবে যে গ্রহন যোগ্যতা অর্জন করেছিল তা নেতাদের মধ্যে অনৈক্যের ফলে নষ্ট হয়েছে । বারবার নতুন নতুন আঞ্চলিক দল গঠন করে নেতারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন । সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি জনগণের স্বার্থও বিপন্ন হচ্ছে । মনে রাখা দরকার উপজাতিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে নয় । প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ক্ষমতার অংশীদার হওয়াই বর্তমানে গণ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ট গুন হল এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নেতা ও কর্মীদের

মধ্যে জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধ গড়ে উঠে। সৃষ্টি হয উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা দেশের সব মানুষকে ভালবাসতে শেখায এবং মানবিক মর্যাদা বোধ ও উন্নত সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে দেয়। যার ফলে সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতারা হযে উঠেন স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব। এই জাতীয়তা বাদী আন্দোলন থেকেই জন্ম নিযেছে সাবা বিশ্বেব মানব সভ্যতার বিকাশেব উপযোগী শ্রেষ্ঠ স্লোগান। স্বাধীনতা-সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব।

উগ্রজাতীযতাবাদ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীব জন্ম দেয়। সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি কবে গণতান্ত্রিক পবিকাঠামো ধ্বংস কবে স্বেচ্ছাচাবী ফ্যাসীবাদী শাসন প্রতিষ্ঠা কবতে উদ্যত হয। পৃথিবীব ঘৃনাতম ব্যক্তি হিটলাব যাব জলন্ত উদাহবন। ত্রিপুবাব উপজাতি জাতীয়তাবাদী নেতাদেব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিযে সুস্থ গণতান্ত্রিক পবিকাঠামোর মাধ্যমে উপজাতি জনগোষ্ঠীব স্বার্থ বক্ষাব জন্য একটি মতাদর্শ ও কর্মসূচীব ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এটাই ইতিহাসেব দাবী।

ত্রিপুবায আঞ্চলিক দলেব উপজাতি নেতৃবৃন্দ

শ্যামাচবণ ত্রিপুবা — হবিনাথ দেববর্মা — নগেন্দ্র জমাতিযা — বতিমোহন জমাতিযা

বিজয় রাঙ্খল — দেবব্রত কলই — অমিয দেববর্মা — ববীন্দ্র দেববর্মা

হীবেন্দ্র কুমাব ত্রিপুরা — গৌবী শংকর বিযাং — জগদীশ দেববর্মা — বুদ্ধ দেববর্মা

অনিমেষ দেববর্মা — শ্রোত বঞ্জন খিসা — সবলপদ জমাতিযা — নবেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য আন্দোলন

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ছিলেন সারাদেশের উপজাতি জনগোষ্ঠী গুলোর প্রকৃত বন্ধু । তিনি ছিলেন বামপন্থী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষনা করেছিলেন ঃ---

১) জনগণের নিজস্ব শক্তি ও প্রতিভা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে । উপর থেকে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাবেনা ।

২) পাহাড়ের জমি ও বনের উপর উপজাতিদের অধিকারকে সম্মান দিতে হবে এবং তা রক্ষা করতে হবে ।

৩) উপজাতি এলাকায় প্রশাসনকে কখনো কঠোরভাবে ব্যবহার করা উচিত হবেনা ।

৪) তথ্য এবং অর্থের পরিমান দিয়ে উপজাতি এলাকায় উন্নয়নের ফলাফল বিচার না করে কি পরিমান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে তা দিয়েই মূল্যায়ন করতে হবে ।

কোন রাজ্য সরকারই নেহেরুর এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কাজ করেনি । ফলে উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী গুলোর জন্ম ও প্রসার ঘটেছে ।
আসামের চারটি উপজাতি জেলা আলাদা হয়ে মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও অরুনাচল নামে চারটি রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে । ত্রিপুরায়ও তার প্রভাব পড়েছে।

ভারতভুক্তির আগে ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠী গুলো নিজস্ব সামাজিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার ভোগ করত । সেই ঐতিহ্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে ।

আসাম সরকার ১৯৫৪ সালে প্রথম লুসাইদের জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে । পরে ক্রমশ নাগা- গারো -খাসিয়া- জয়ন্তিয়া ও অন্যান্য উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে । কিন্তু সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তর এবং উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি, ফলে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার আন্দোলন শুরু হয়। .

ভারতে সংবিধান রচনা করার সময় ত্রিপুরা রাজ্য এক জেলা বিশিষ্ট স্বাধীন দেশীয় রাজ্য ছিল এবং প্রজাদের অধিকাংশই ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠী ভুক্ত । কাজেই ত্রিপুরার জন্য স্বশাসিত জেলা গঠনের চিন্তা করা হয়নি ।

ভারতভুক্তির সময়ও ত্রিপুরায় উপজাতিদের কোন সংকট ছিলনা । প্রধান সমস্যা ছিল খাদ্য সমস্যা ।

১৯৫০ সালের পর উদ্বাস্তু আগমন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ১৯৫১ সালের জনগণনায় উপজাতিরা সংখ্যলঘু হয়ে পড়ায় পিছিয়ে পড়া উপজাতিদের মধ্যে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে সি পি আই প্রথম উপজাতিদের জন্য রক্ষাকবচের দাবী তুলে। নির্বাচনে জেতার পর পার্লামেন্টে দশরথ দেব এবং বীরেন দত্ত উদ্বাস্তু সমস্যার পাশাপাশি উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্বাসন এবং সমগ্র উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ রক্ষা কবচের দাবী পেশ করেন।

মহারাজা বীর বিক্রমের সময় দুবার উপজাতি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয় ।

প্রথমবার ১৯৩০ সালে উত্তর ত্রিপুরায় কিছু এলাকা ৫টি জনগোষ্ঠীর জন্য রিজার্ভ ঘোষনা করেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপজাতি জনগোষ্ঠীকে সমতল চাষে অভ্যস্ত করে তোলা এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলা । এই সময় মুসলমান চাষীরা ব্যাপকভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল।

মহারাজা বীরবিক্রমের পরিকল্পনা সফল হয়নি । উপজাতিরা জুমচাষ ছেড়ে দিয়ে সমতল চাষে কোন আগ্রহ বোধ করেনি । স্থায়ী বসতি গড়ার আকর্ষন ও তাদের মধ্যে ছিলনা ।

মহারাজা দ্বিতীয়বার ১৯৪৩ সালে প্রায় ১৯৫০ বর্গমাইল এলাকা উপজাতিদের জন্য রিজার্ভ ঘোষনা করেন । এই সময় উদ্বাস্তু সমস্যা ছিলনা । কিন্তু ১৯৪২ সালে ভারছাড় আন্দোলনের গণ-জোয়ার এবং ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত বৃটিশ বাহিনীর ক্রমাগত পরাজয় লক্ষ্য করে ভারতের সব নেতারাই ধারনা করেছিলেন যে,বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে পরাজিত হবে এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে ।

ভারতরে দেশীয় রাজারা বহু আগেই বুঝে ছিলেন যে বৃটিশ সরকার না থাকলে কোন দেশীয় রাজ্যেরও অস্তিত্ব থাকবেনা । কারন প্রতিটি দেশীয় রাজ্যেই তীব্র গণ আন্দোলনের ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল ।

ত্রিপুরার বুদ্ধিমান মহারাজা উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার পর উপজাতি জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য এবং উপজাতি প্রধান বসতি গড়ে তোলার জন্য ভূমি সংরক্ষণ প্রয়োজন । খুব সম্ভবতঃ এটাই ছিল রাজন্য শাসনের ইতিহাসে উপজাতি গণের কল্যানে প্রথম প্রচেষ্টা ।

১৯৪৬ সালের আগে পর্যন্ত অখন্ড ভারতের স্বাধীনতাই ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য । বৃটিশ কেবিনেট মিশন ও এই সময়ে ভারতে এসে স্বাধীন ভারতকে অখন্ড রাখার জন্য যাাবতীয় সম্ভাবনা বিচাব বিবেচনা করেছিল । কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালামের চেষ্ঠায় অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল । এই জটিল মুহুর্তে সভাপতি বদল করে কংগ্রেস দল দারুন ভুল করেছিল । এই ভুলের জন্যই দেশ বিভাগ অনিবার্য হয়েছিল ।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালি দাঙ্গায় নির্যাতিত বিপুল সংখ্যক হিন্দু ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু হিসেবে প্রবেশ করে । ত্রিপুরার উপজাতিরা আন্তরিকতার সঙ্গেই তাদের গ্রহন করে । অবশ্য রাজ পরিবারের একটা অংশ উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেবার বিরোধী ছিল ।

১৯৪৭ সালে মহারাজী বীর বিক্রমের অকাল মৃত্যুর তিন মাস পরেই ভারত স্বাধীন হয়।

মৃত্যুর সময় মহারাজা ভারতে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । এই সিদ্ধান্ত তিনি আগেই গ্রহন করেছিলেন এবং সংবিধান পরিষদে ত্রিপুরার প্রতিনিধি হিসেবে রাজমন্ত্রী বিরজা গুহকে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিনিধিদল কলকাতায় পৌছেই মহারাজার সংকট জনক শারীরিক অবস্থার খবর পেয়ে ফিরে এসেছিলেন । মহারাজার মৃত্যুর পর ভারত স্বাধীনতা লাভের দু'দিন আগেই মহারাজার ভারতে যোগদানের ইচ্ছা ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

প্রকৃত পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিপুরা ভারতের অঙ্গরাজ্যরূপে

গণ্য হয় । মহারাজার অকাল মৃত্যুর পলে আনুষ্ঠানিক চুক্তি দু বছর- পরে সম্পন্ন হয় ।

স্বাধীনতার পরে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে দাঙ্গা শুরু হয় । ফলে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করে ।

১৯৪৮ সালের ১৪ই আগষ্ট মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী সাতটি মহকুমায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ৩০০ বর্গ মাইল এলাকা রিজার্ভ মুক্ত করেন ।

তখনো রাজ্যে উপজাতিদের মধ্যে জমির সংকট দেখা দেয়নি । কিন্তু ১৯৫১ সালের জনগণনায় উপজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতিদের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটা আশংকা দেখা দেয় ।

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর উপজাতীদের সংরক্ষিত এলাকা এবং রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে জোরদার আন্দোলন শুরু হয় ।

১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থ ত্রিপুরা পরিদর্শন করে ঘোষণা দেন ত্রিপুরায় আর কোন উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়ার সুযোগ নেই ।

১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর উদ্বাস্তু নথিভুক্ত করা বন্ধ করে দেয় । কিন্তু উপজাতি স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন সুপারিশ করা হয়নি । এজন্য পার্লামেন্টে তীব্র চাপ সৃষ্টি করা হয়।

ফলে, ১৯৬০ সালে ডেবর কমিশন ত্রিপুরার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষন করতে আসেন। এই সময় ত্রিপুরার চীফ কমিশনার উপজাতি স্বার্থ রক্ষার জন্য পঞ্চম তপশীল অনুযায়ী উপজাতি স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব দেন । কিন্তু ডেবর কমিশন প্রথমে উপজাতি উন্নয়ন ব্লক গঠনের সুপারিশ করেন । এই ব্যবস্থা সফল না হলে পঞ্চম তপশীল অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহনের পরামর্শ দেন ।

এই সময় থেকে উপজাতি স্বার্থ রক্ষার জন্য পঞ্চম তপশীল অনুযায়ী স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য আন্দোলন শুরু হয় । একমাত্র সি পি আই দলই এই আন্দোলন শুরু করে। ফলে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা কমিউনিষ্ট বিরোধী হয়ে উঠে ।

কংগ্রেস দল প্রচার করতে থাকে কমিউনিষ্টরা ত্রিপুরাকে ভাগ করতে চায় । উদ্বাস্তুরা আবার উদ্বাস্তু হবে ।

১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে উপজাতি স্বার্থে পঞ্চম তপশীল অনুযায়ী স্বায়ত্ব শাসনের দাবীকে কমিউনিষ্টরা অত্যন্ত জোরালোভাবেই উত্থাপন করে । ফলে বাঙ্গালীদের সমর্থন কমতে থাকে । তাছাড়া ১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙ্গে যাবার ফলে গণ-আন্দোলনও বিভক্ত হয়ে পড়ে ।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দুই কমিউনিষ্ট পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে । বিধান সভায় সি পি আই একটি মাত্র আসন পায় এবং নবগঠিত সি পি এম দল পায় দুটি আসন ।

এই সময় জন্ম হয় উপজাতি যুব সমিতি নামে নতুন অরাজনৈতিক সংগঠন, যাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল উপজাতিদের উন্নয়ন, মাতৃভাষার সরকারী স্বীকৃতি, বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাওয়ার ব্যবস্থা করা ।

দুই কমিউনিষ্ট পার্টি যুব সমিতির দাবীগুলো সমর্থন করে এবং যৌথ আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহন করে । কিন্তু উপজাতি যুব সমিতির নেতারা জেদ ধরেন যে এই আন্দোলনে বাঙ্গালীদের

নেওয়া যাবেনা । কারণ এই আন্দোলন বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে হবে ।

সি পি এম নেতারা যৌথ আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং যুব সমিতিকে সাম্প্রদায়িক দল রূপে চিহ্নিত করেন । এর ফলেই উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের মধ্যে তীব্র সি পি এম বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয় ।

যুবসমিতির নেতৃত্বে স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে জোরদার গণআন্দোলন সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার উপজাতি যুব সমিতির ডাকে সারা দিয়ে মিটিং মিছিলে যোগ দিতে থাকে ।

১৯৭২ সালের নির্বাচনে উপজাতি যুব সমিতি ১১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজ্যে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিকদল রূপে আবির্ভূত হয় । এই সময় থেকেই ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী উপজাতি স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে যুব সমিতি জোরদার গণ আন্দোলন গড়ে তুলে ।

এর আগে পর্যন্ত বামপন্থীরাও ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী স্বায়ত্ব শাসনের দাবী করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কারন সংবিধান সংশোধন না করে এই ব্যবস্থা অন্য কোন রাজ্যে চালু করা সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্টে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যেব সমর্থন প্রয়োজন। সেই সময় এটা খুবই কঠিন কাজ মনে হয়েছিল ।

১৯৬৬ সালে সি পি আই দলের রাজ্য সম্পাদক অঘোর দেববর্মার দাবীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি ত্রিপুরায় উপজাতি স্বায়ত্ব শাসনের দাবীতে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয় । এই সভাতেই ককবরক লিপি নির্মাণে উদ্যোগ নেবার সিদ্ধান্ত হয় । এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপুরা উপজাতি উন্নয়ন পরিষদ-গঠন করে অঘোর দেববর্মা এবং বীরচন্দ্র দেববর্মার নেতৃত্বে ককবরক লিপি নির্মানের কাজ শুরু হয় । কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী সর্বক্ষনের কর্মী হিসেবে নিযুক্ত হন ।

কিন্তু ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে দুই কমিউনিষ্ট পার্টি সুখময় সেনগুপ্তের ত্রিপুরা কংগ্রেসের সঙ্গে যে কর্মসূচী তৈরী করে তাতে পঞ্চম তপশীলের দাবীকেই জোরের সঙ্গে উত্থাপর করা হয় । কারণ ত্রিপুরার চীপ কমিশনের সুপারিশ এবং ডেবর কমিটির অনুমোদন এই দাবীর পক্ষে ছিল । তাছাড়া পঞ্চম তপশীল অনুযায়ী স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার জন্য সংবিধান সংশোধনের কোন প্রয়োজন হয়না । রাজ্য বিধানসভাই এর জন্য আইন তৈরী ও পাস করতে পারে ।

দীর্ঘ দশ বছর ধরে উপজাতিদের স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থার দাবীতে দুই কমিউনিষ্ট পার্টি এবং যুব সমিতি অবিরাম গণ-আন্দোলন পরিচালনা করেছে । রাজ্যের কংগ্রেসদল সহ অন্যান্য সব দলই এই দাবীর বিরোধীতা করেছে ।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথমেই ষষ্ঠ তপশীল অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় জনতা সরকারের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয় । কিন্তু জনতা সরকার অভ্যন্তরীন কোন্দলে বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকায় মোরাজী দেশাই রাজ্য সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পরামর্শ দেন ।

ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চম ও সপ্তম তপশীলে ভিত্তিতে রাজ্য সরকার গুলো স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারে ।

বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারের এই ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করে । কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তীব্রভাবে বিরোধীতা করে এবং ১৯৮২ সালের প্রথম এ ডি সি নির্বাচন বয়কট করে । ত্রিপুরায় এ ডিসি গঠনের প্রতিবাদে আমরা বাঙ্গালী নামে উগ্র জাতীয়তাবাদী দলের জন্ম হয় ।

সারা রাজ্যে উপজাতি বিদ্বেষী এবং বামফ্রন্ট বিরোধী প্রচার চলিয়ে রাজ্যে দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ।

উপজাতি যুব সমিতি ও ষষ্ঠ তপশীলের দাবীতে অবিচল থেকে বামফ্রন্ট বিরোধী প্রচার জোরদার করে এবং বিদেশী বিতাড়নের শ্লোগান তোলে বাজার বয়কট আন্দোলন শুরু করে।

কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালী এই উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করে । ফলে ত্রিপুরার ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকজনক ঘটনা ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গা সংঘটিত হয় । এতে বাঙ্গালী এবং উপজাতি জনগণের বিপুল ক্ষতি ও প্রাণ হানি হয়।

এভাবেই এ ডি সি গঠনকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতি উপজাতি বিদ্বেষ চরম রূপ ধারণ করে ।

জুনের দাঙ্গার পরই উপজাতি যুবকদের একটা অংশ সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দেয় । বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা এই সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার করে ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জুল ফিকার আলি ভুট্টো ঘোষণা দিয়েছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর ধরে যুদ্ধ চলবে ।

ভারত বিদ্বেষী জুলফিকার আলিকে নিজ দেশের ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষী শাসক চক্র কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়ে ভুট্টোর ঘোষনাকেই কার্যকব করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ।

ইতি মধ্যেই বিশ্ব পরিস্থিতি বদলে গেছে । সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক রূপ নেওয়ায় বর্তমানে সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য বিশ্ব-শক্তির উদ্ভব ঘটছে । সন্ত্রাসবাদীরা দেওয়াল লিখন বুঝতে না পারলে নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে আনবে ।

উপজাতি যুবসমিতি ১৯৮০ সালে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল । প্রথম সারির নেতারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথকেই সঠিক পথ বলে মেনে নিলেন । বিজয় রাংখলের নেতৃত্বে একদল যুবক স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন এবং বিদেশী বিতাড়নের দাবীতে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদের পথে গেলেন । ফলে রাজ্যের বহু নিরীহ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে ।

উপজাতি বিদ্বেষী কংগ্রেস নেতারা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে জোট বেঁধে বামফ্রন্ট বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করলেন ।

১৯৮২ সালে এ ডি সি নির্বাচন বয়কট করে কংগ্রেস দল চরম উপজাতি বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছিল । ১৯৯০ সালে যুব সমিতির সঙ্গে জোট বেঁধে এ ডি সি নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছিল । কিন্তু উপজাতি নেতারা উপজাতি স্বার্থকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিভক্ত হয়ে

পড়েছিল ।

১৯৯৫ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস যুবসমিতি কেউ সাফল্য লাভ করতে পারেনি । বামফ্রন্টই এডিসি দখল করে নেয় ।

২০০০ সালের এ ডি সি নির্বাচনে তিনটি উপজাতি আঞ্চলিক দল ঐক্য বদ্ধ হয়ে এ ডি সি দখল করে । নির্বাচনের পর ঐক্যবদ্ধ দল আই পি এফ.টি যুব সমিতিকে যোগ দিতে আহ্বান জানায় উপজাতি যুবসমিতি নিজেদের অস্তত্ব মুছে দিয়ে নতুন দলে যোগ দেয়। দলের নতুন নাম হয় আই এন পি টি ।

তিনবছরের মধ্যে তিনবার আই এন পি টি দলের ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব বদল হয়। চতুর্থবার নেতৃত্ব বদলের প্রশ্নে দল ভেঙ্গে গিয়ে এন এস পি টি নামে নতুন দল সৃষ্টি হয় । আই এন পি টি ক্ষমতাচ্যুত হয়। সিপিএমের সমর্থনে এন এস পি টি ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই আবার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নেতৃত্ব বদলের খেলা শুরু হয় ।

উপজাতি নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতার ফলে উপজাতি জনগণের উন্নয়নের কাজ দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবী জোরদার হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা ব্যবহার করে উপজাতি জনগণের সার্বিক উন্নয়নে গ্রহণ যোগ্য কোন নীতি, কর্মসূচী বা মতাদর্শ এখনো পর্যন্ত ঘোষণা করতে পারছেনা ।

সংবিধানের পঞ্চম তপশীল অনুযায়ী উপজাতি কাউন্সিলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা প্রত্যেক উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য উপজাতি উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে পঞ্চম তপশীলে রাজ্য সরকারই বিধান সভায় আইন পাশ করে এসব কাউন্সিল গঠন করতে পারে ।

সপ্তম তপশীল অনুযায়ী স্থানীয় স্বাযত্ব শাসনমূলক স্বশাসিত প্রশাসনিক সংস্থা যে কোন রাজ্য সরকার গঠন করতে পারে । অনেকটা পুরসভার মত ক্ষমতা ভোগ করতে পারে এরূপ সংস্থা। রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তর হস্তান্তর করে স্থানীয় সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে ।

ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী স্বশাসিত পরিষদ কেমাত্র পার্লামেন্টই গঠন করতে পারে। এর জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হয় । সংবিধানে নির্দিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর এরূপ সংস্থায় যুক্ত হয় । রাজ্য সরকারও বিভিন্ন দপ্তর হস্তান্তর করতে পারে ।

ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী গঠিত উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ উপজাতি জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । শিক্ষা,স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান , আধুনিক কৃষিভিত্তিক শিল্প্য কারিগরি ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির উন্নতি ঘটাতে পারে ।

কিন্তু রাজ্যবাসীর দুর্ভাগ্য হল সুদীর্ঘ ২০ বছরেও উপজাতি নেতারা এ বিষয়ে যোগ্য ভূমিকা নিতে পারেন নি ।

শিক্ষা - কর্মসংস্থান এবং গণতান্ত্রিক স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে উপজাতি জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বিপ্লব ঘটানো সম্ভব ।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল এ ডি সি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিল গঠনের নির্বাচন প্রক্রিয়া, আইন পাস হবার দশ বছর পরও শুরু হলনা ।এজন্য কোন গণ আন্দোলনও সৃষ্টি হলনা।

এর আসল কারন হল-উপজাতি আঞ্চলিক দলগুলোর মতাদর্শগত কোন ভিত্তি । গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদ ছাড়াও জনকল্যাণ মূলক কোন নীতি-আদর্শ ও মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তিতে জনদরদী নেতৃত্ব গড়ে না উঠলে শুধু অর্থবরাদ্দ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপজাতিদের উন্নতি সম্ভব নয় । এ ডি সির ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী গঠিত স্বশাসিত জেলা পরিষদের রাজ্য বিধান সভার মতই ক্ষমতা রয়েছে ।

১) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

২) প্রশাসনিক ক্ষমতা

আইন বিভাগের প্রধান হলেন চেয়ারম্যান । তিনি পরিষদের সভা আহ্বান করেন। এই সভায় এ ডি সি এলাকার বাজেট, বিল ও আইন পাস করা হয় ।

প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান হলেন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য । তিনি রাজ্য মুখ্য মন্ত্রীর মতই মর্যাদা ভোগ করেন । কার্য নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা মন্ত্রীসভার সদস্যদের মতই বিভিন্ন দপ্তরের ভার প্রাপ্ত হন এবং রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের মতই মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন ।

ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী এ ডি সি র হাতে যে ক্ষমতা আছে তাতে এ ডি সি কে একটা মিনি বিধানসভা বলা যায় । যেমন--

১) এ ডি সি এলাকার রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া বাকী জমি দখল করা, ব্যবহার করা ও বন্টন করা ।

২) এ ডি সি এলাকার নদী, নালা, ছড়া ও অন্যান্য জলাশয় কৃষি কাজে ব্যবহার করা ও বন্টন করা ।

৩) রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া বাকী বনভূমি পরিচালনা করা ।

৪) গ্রামীন কমিটি, শহর কমিটি ও কাউন্সিল গঠন করা ।

৫) উপজাতিদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা করা ।

৬) উপজাতিদের বিবাহ - বিবাহবিচ্ছেদ, সামাজিক রীতিনীতি ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা।

৭) উপজাতি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো ।

৮) মহাজনী ব্যবসা ও অন্যান্য বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা ।

৯) প্রাথমিক স্কুল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার, ফেরি, মৎস্য চাষ ও পশুপালন কেন্দ্র স্থাপন করা ও নিয়ন্ত্রন করা ।

১০) সামাজিক ও গ্রামীন উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্মান করা ।

১১) প্রয়োজন মত কর্মচারী নিয়োগ করা ।

এছাড়াও রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তর হস্তান্তর করতে পারে ।

বর্তমানে প্রধান অভিযোগ হল, রাজ্য সরকার বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করে এবং বরাদ্দ

অর্থ সময় মত না দিয়ে কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করে ।

বর্তমানে উপজাতি আঞ্চলিক দল গুলোর প্রধান দাবী হল :-

১) এ ডি সিব ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে ।

২) বাজ্যের জনসংখ্যাব হার অনুযাযী এ ডি সি কে অর্থ ববাদ্দ দিতে হবে ।

৩) বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারেব হস্তক্ষেপ বন্ধ কবাব জন্য প্রযোজনে সংবিধান সংশোধন করতে হবে ।

৪) এ ডি সি এলাকাব পবিকল্পানা তৈরীর ক্ষমতা দিতে হবে ।

৫) সবাসরি বাজ্যপালের মারফলে ববাদ্ধ অর্থ দিতে হবে ।
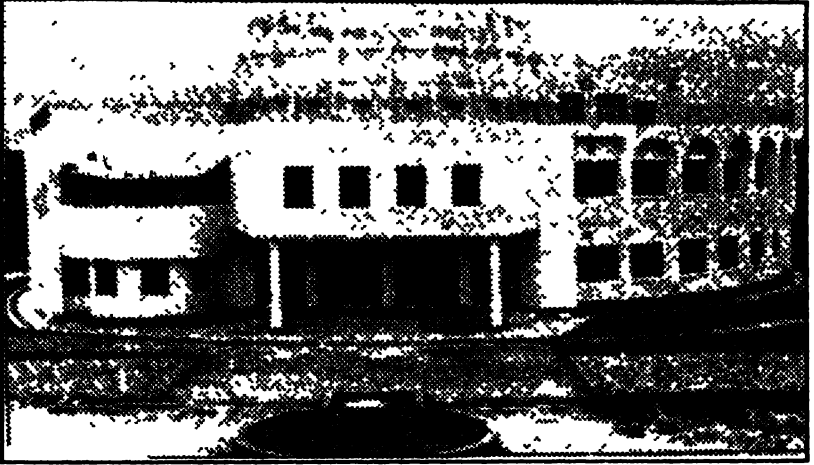
উপজাতি জেলাপরিষদের ভবন

শ্রীদাম দেববর্মা

মুলুক চাঁদ দেববর্মা

বুধু দেববর্মা

একাদশ অধ্যায়
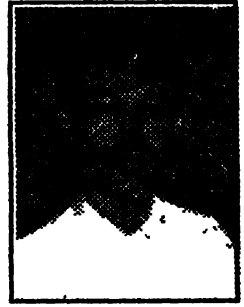
ত্রিপুরায় গণ আন্দোলনের বিভিন্ন পদ্ধতি

ত্রিপুরায় গণ - আন্দোলনের বিচিত্র ধারা সৃষ্টি হয়েছে । ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা এ রাজ্যেও প্রচলিত হয়েছে । সেদিক থেকে ত্রিপুরার গণআন্দোলনের ধারা ভারতের মূল স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে একথা নির্বিঘ্নে বলা যায় ।

পরাধীন ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের আগে গণ আন্দোলনের সুযোগ ছিল না । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে । দেশ দখল করা এবং শাসন কবার লক্ষ্য তাদের ছিলনা । ভাবতের মত বিশাল দেশ দখল করার স্বপ্ন দেখাও তাদের পক্ষে কঠিন ছিল ।

মোগল শাসনের পতনের যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল । আঞ্চলিক শাসকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল ক্ষমতা দখলের লড়াই। ইংরেজ বণিকদের সাহায্য নিয়ে ক্ষমতা দখল করার জন্য সব কয়টি সামন্ত রাজ্য বিশ্বাসঘাতক বাহিনী সৃষ্টি হয়েছিল । ইংরেজরা এই সুযোগের সদ্ ব্যাবহার করে ভারতের অধীশ্বর হয়ে বসেছিল । ভারতীয় বাহিনীই ছিল ইংরেজ বণিকদের মূল শক্তি ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একশ বছরের শাসন কাল ছিল লুণ্ঠন এবং ভারতীয় কুটির শিল্পের ধ্বংসের কাল । এই সময় একদিকে ভারতের প্রসিদ্ধ কুটির শিল্পগুলো ধ্বংস হয়েছে, অন্যদিকে চলেছে লুন্ঠন এবং নিষ্ঠুর নির্যাতন ।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবী করার কোন সুযোগ ছিলনা তাই চরম ব্যবস্থা হিসেবে হাজার হাজার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে সারা ভারতে । কিন্তু চতুর ইংরেজরা ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যেই সব বিদ্রোহ দমন করেছে নির্মমভাবে ।

বিদ্রোহ ঘটেছে ছোট ছোট অঞ্চলে । তাই দমন করা সহজ হয়েছে । সব বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করার মত কোন সংগঠন বা সাহসী নেতৃত্ব থাকলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ধুলায় মিশে যেত। কিন্তু সেকালে ভারতে স্বাধীনতার কোন ধারনাই ছিলনা । ভারতীয়ত্ব বোধও ছিলনা । তাঃ গণতান্ত্রিক চেতনার প্রশ্নই উঠেনা ।

সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত সেনা বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ । নেতৃত্ব দিয়েছেন ইংরেজদের হাতে যুদ্ধে বা কৌশলে পরাজিত প্রাক্তন রাজা ও নবাবরা । তাই সহজেই ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়েছিল । রাজধানী দিল্লী বিদ্রোহীদের দখলে এসেছিল । দেশীয় শাসক প্রাক্তন মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে দেশীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল বিদ্রোহীরা । বৃটেন থেকে সেনা বাহিনী এনে এই বিদ্রোহ দমন করা তখন সম্ভব ছিলনা । কারণ একমাত্র স্টীমার যোগে সমুদ্রপথে ভারতে সেনা পাঠাতে একমাস সময় লাগতো । তাছাড়া বৃটিশ সরকারের সামরিক শক্তি ও এতটা শক্তিশালী ছিলনা ।

সেই দুর্দিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার যখন চরম পরাজয়ের মুখে, ঠিক তখনি ভারতের দেশীয় রাজারা সিপাহী বিদ্রোহ দমন করতে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ।

ভারতের স্বাধীনতা আবারও ভারতীয়দের হাতেই পরাজয় বরণ করেছিল ।

তবে সিপাহী বিদ্রোহ দমন করার পরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ হয়ে যায় এবং ভারতের শাসনভার বৃটিশ সরকারের সরাসরি শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয় । বৃটেনেও তখন পূর্ণ গণতন্ত্র ছিলনা । সেখানেও মহিলা এবং সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ছিলনা । বণিক এবং শিল্পপতিরাই ছিল শাসনের মূল কেন্দ্রে ।

তাহলেও ভারত শাসনের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন এলো । ভারতের বণিক শিল্পপতি ও জমিদারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আলাপ-আলোচনা ও আবেদন-নিবেদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হল ।

আবেদন নিবেদনের মাধ্যম প্রতিকার দাবী করাব মাধ্যমেই ভারতে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটল । ইংলন্ডে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বণিক শিল্পপতি ও জমিদার পুত্রদের আধুনিক শিক্ষার পথ খুলে দেওয়া হল । সেই পথ ধরেই ভারতের জনজীবনে এল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার । ইউরোপের গণতন্ত্র-উন্নত শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা, শিল্প বিপ্লবের প্রভাব এবং আধুনিক দর্শন ভারতীয় শিক্ষাতেসমাজের চিন্তাব জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করল

ত্রিপুরাতে ও এই ধারা লক্ষ্য করা যায় ।

১৯৩০ -৩১ সালে মহারাজা বীরবিক্রম বিদেশ ভ্রমন করে দেশে ফিরেই প্রজাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কবেন । এই ব্যবস্থা শুধু শহরবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

কিন্তু এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই গড়ে উঠল সমাজ সেবা মূলক ক্লাব সংগঠন । শবীর চর্চা ও সমাজসেবার কাজকে মহারাজা নিজেই খুব উৎসাহ দিলেন । এসব ক্লাবের মাধ্যমেই গড়ে উঠলো ঐক্যবোধ ও সমাজ চেতনা ।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ঘোষিত হবার পর সব কয়টি দেশীয় রাজ্যের রাজারা দিল্লীতে এক সভায় মিলিত হয়ে রাজন্য শাসনের অধীনে দায়িত্বশীল সরকার চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ।

এই ঘটনাই দেশীয় রাজ্যগুলোতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ খুলে দেয় ।

১৯৩৮ সালে ত্রিপুরায় প্রথাম গণতান্ত্রিক সংগঠন **জনমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠিত** হয় । একই সময়ে গান্ধীবাদীরা গঠন করেন । **ত্রিপুরা রাজ্যগণপরিষদ-** ।

একবছর পরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার ফলে গণ আন্দোলনের প্রাথমিক স্তর সভা-সমিতি ও সংগঠন করার কাজ বন্ধ হয়ে যায় ।

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিক্ষিত উপজাতি গ্রামীন যুবকেরা - জনশিক্ষা সমিতি গঠন করে ঘুমন্ত উপজাতি সমাজে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন । মহারাজা বীর বিক্রমও এই উদ্যোগকে উৎসাহিত করেন । জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত স্কুলকেই অনুমোদন দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেন ।

অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করে মহারাজা নিজেই রাজ্যে গণতান্ত্রিক দায়িত্বশীল সরকার গঠন প্রক্রিয়ায় মহারাজার প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিশ্বস্ত সর্দারদের সম্মেলন

ডেকে - ত্রিপুর সংঘ- নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন । কিন্তু এর অল্পকাল পরেই মহারাজার অকাল মৃত্যু হওয়ায় এই সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটে ।

ত্রিপুরা রাজ্যে তখন বাঙ্গালী মুসমানরাই ছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ ।শহরের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি গেঁদু মিঞার উদ্যোগে - অঞ্জুমান ইসলামিয়া দল গঠন করে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করে ।

এই পরিস্থিতিতে প্রভাত রায়ের নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালে গঠিত হয় । ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল কারন এই সময় সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজারা প্রজামন্ডল গঠন করে জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করে । সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সংগঠন প্রতিটি দেশীয় রাজ্য আলোড়ন সৃষ্টি করে ।

শচীন্দ্রলাল সিংহের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সমস্ত সদস্যরা মিলিত হয়ে ১৯৪৬ সালের ২৬শে জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্য জাতীয় কংগ্রেস দল গঠন করা হয় ।

এভাবেই শুরু হয় ভারতীয় গণ-আন্দোলনের ধারা । গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন গণ-সংগঠন ও রাজনৈতিক দল ।

১৯৪৭ সালের পর উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠিত হতে থাকে এবং গণ আন্দোলনেও বিচিত্র ধারার সৃষ্টি হতে থাকে ।

১৯৩৮ সালে ছিল আবেদন- নিবেদনের যুগ । সভা সমিতি করা - বিভিন্ন দাবীতে প্রস্তাব গ্রহন করা এবং রাজদরবারে পেশ করা । এটাই ছিল তখনকার পদ্ধতি ।

১৯৪৫সালে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনও অনেকটা আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

১৯৪৬-১৯৪৭ সালে জাতীয় কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হবার পর গণ আন্দোলনে নতুন ধারা এল । শচীন্দ্রলাল সিংহ রামনগরের প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করলেন, সুখময় সেন গুপ্ত হরিজনদের দাবী নিয়ে মিছিল করলেন । এসব আন্দোলনের জন্যও শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ।

এই সময় কমিউনিষ্টরা একটি ছোট সেল গঠন করে প্রজামন্ডলের মাধ্যমে গণআন্দোলন পরিচালনা করেছে । পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্য গণতান্ত্রিক সংঘের মধ্যে কাজ করে গণ ভিত্তি ও সংগঠন তৈরী করেছে ।

১৯৪৮ সালে মুক্তি পরিষদের মাধ্যমে কমিউনিষ্ট পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল । যদিও শুরুতে পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলাই ছিল নেতাদের মূল লক্ষ্য । কমিউনিষ্ট নেতার মতাদর্শগত শিক্ষা দিয়ে অরাজনৈতিক সংগঠনকেই রাজনৈতিক সংগঠনে পরিনত করেন । এর ফলে উপজাতিদের মধ্যে ঐক্য ও সংগ্রামী চেতনা সৃষ্টি হয় ।

১৯৪৮ সালের ১৫ই আগষ্ট আগরতলা শহরের ১৪৪ ধারা অমান্য করে রাজ্যের প্রথম বৃহত্তম মিছিল ও সমাবেশ করে মুক্তি পরিষদ । গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও অঘোর দেববর্মা এই মিছিল ও সমাবেশের নেতৃত্ব দেন এবং প্রকাশ্যে বক্তব্য রাখেন । প্রশাসন কিছু বুঝে উঠার আগেই সমাবেশের লোকজন নেতাদের নিয়ে শহর ছেড়ে চলে যায় । এটাই রাজ্যের প্রথম

আইন অমান্য আন্দোলন ।

১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধান চালু হবার পর গণ-তান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের নীতি ঘোষনা করে কমিউনিষ্ট পার্টি ।

১৯৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে পর পর তিনটি বিশাল জন সমাবেশ করা হয় আগরতলায় ।

১৯৫১ সালের ২রা অক্টোবর দরবার মাঠে অর্থাৎ বর্তমান শিশু উদ্যানে কমিউনিষ্ট পার্টি নিজস্ব উদ্যোগে সভার আয়োজন করে । কিন্তু প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় প্রতাপগড়ের ধান ক্ষেতে সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

হাজার হাজার লাল পতাকা হাতে সাধারণ মানুষ এবং মাথায় লাল টুপি পরে হাজার হাজার শান্তি সেনা এই সভায় যোগ দেয় । সভাস্থানের নামকরন করা হয় লাল ঝান্ডার মাঠ । শহরবাসী কমিউনিষ্ট পার্টির শক্তি দেখে অবাক হয়ে যায় ।

দুই মাস পরেই ১৯৫১ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বিতীয় বিশাল নির্বাচনী সমাবেশ হয় আগরতলায় । এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজাফফর আহমেদ এবং প্রধান বক্তা ছিলেন এস এ ডাঙ্গে এবং জ্যোতি বসু ।

আবার ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে তৃতীয় বিশাল নির্বাচনী মিছিল ও সমাবেশ হয় আগরতলায় । এবারের জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ ।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের সময় কংগ্রেস দল আগরতলায় এত বড় মিছিল ও সমাবেশ করতে পারেনি । কিন্তু ঘরোয়া সভা ব্যাপকভাবে কংগ্রেস দলই করতে পেরেছিল । কমিউনিষ্ট পার্টি তখনো সর্বত্র সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি । তাই ঘরোয়া সভা ছিল পাহাড়ী এলাকায় সীমাবদ্ধ

পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন গুলোতে কংগ্রসদল বিশাল বিশাল মিছিল ও জমায়েত করেছে । কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন প্রধান বক্তা । জহরলাল নেহেরু ইন্দিরা গান্ধী রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জনসভা গুলোতে বক্তৃতা দিয়েছেন । এর ফলে কংগ্রেসের শক্তি শালী সংগঠন না থাকলেও গণ সমর্থন বেড়েছে ।

সরকারী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর জাতীয় কংগ্রেস দল গণ-আন্দোলনের প্রয়োজন বোধ করেনি । ক্ষমতা হারিয়ে বিরোধী দলের দায়িত্ব নিয়েও এখনো পর্যন্ত কংগ্রেস দল বড় ধরনের কোন গণ আন্দোলন সৃষ্টি করার উদ্যোগ নেয়নি । পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে নিন্দা করা, ধিক্কার জানানো, এবং গণতান্ত্রিক সরকার হাটিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবী করা ইত্যাদি নতুন পদ্ধতির আন্দোলনের সুত্রপাত করেছে জাতীয় কংগ্রেস ।

ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনের আরেকটি ধারা কংগ্রেস দল চালু করেছে । এর আগে বয়কট আন্দোলন হয়নি ।

ত্রিপুরায় প্রথম নির্বাচনের পর থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং বিধান সভার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীতে কমিউনিষ্টরা সহ সমস্ত বামপন্থী

ও অকংগ্রেসী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ লড়াই করেছে। উদ্বাস্তু ও জুমিয়া পুনর্বাসন, এবং খাদ্য ও কাজের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হয়েছে।

কমিউনিষ্ট পার্টিকে ট্রাইবেল পার্টি রূপে চিহ্নিত করা হয় এবং কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব থেকে ট্রাইবেলদের সরিয়ে নেবার জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা হয়।

যেমন ঃ-

১৯৫২ সালে আদিবাসী সমিতি

১৯৫৩ সালে আদিবাসী সংঘ

১৯৫৪ সালে আদিবাসী সংসদ

১৯৫৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া ট্রাইবেল ইউনিয়ন।

এগুলোও প্রধানত বিবৃতিদানের সংগঠন হিসেবে কাজ করেছে। জনসমর্থন না পেয়ে অবলুপ্তি ঘটেছে। আঞ্চলিক দলরূপেও অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি।

১৯৬০ সাল থেকে ত্রিপুরায় গণ-আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। শিক্ষিত ছাত্র ও যুবকেরা দলে দলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে থাকে। শিক্ষক কর্মচারীরাও আন্দোলনের ময়দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে।

১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে উদ্বাস্তুরা অমরণ অনশন শুরু করে। ১৫ দিনের মাথায় বিশ্বাম্বর নমঃ নামে একজন অনশনরত উদ্বাস্তু মারা যায়। ফলে রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলনের ঢেউ উঠে। প্রশাসন উদ্বিগ্ন হয়ে রাতের অন্ধকারে অনশনকারীদের গ্রেপ্তার করে জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। অন্যান্য নেতাদের পরামর্শে নৃপেন চক্রবর্তীও অনশন ভঙ্গ করেন।

১৯৬০ সালে আসামে বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন শুরু হবার ফলে ত্রিপুরায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অকংগ্রেসী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলে। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ত্রিপুরা বন্ধ পালন করা হয়।

১৯৬০ সালের ২৮ শে অক্টোবর শিশু উদ্যানে বিধানসভার দাবীতে এক বিশাল জমায়েত হয়। প্রধান বক্তারা ছিলেন দশরথ দেব এবং ভূপেশ গুপ্ত।

১৯৬৪ ও ৬৫ সালে শিশু উদ্যানে পর পর কয়েকটি যৌথ সমাবেশ হয়-খাদ্য, কাজ এবং বিধানসভার দাবীতে। এই সময় প্রগতিশীল মোর্চা গঠন করা হয়। সভা সমিতি, মিছিল ছাড়াও গণ আন্দোলনের নতুন নতুন পদ্ধতি চালু হতে থাকে।

১৯৬৬ সালে রাজ্যের শিক্ষক কর্মচারীরা চাকুরীর নিরাপত্তা, নিয়মিত করন ও অন্তর্বর্তী ভাতার দাবীতে নতুন এক আন্দোলনের ধারা সৃষ্টি করেন। যা পরবর্তীকালে রাজ্যের সরকার পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

এই সময় থেকে ত্রিপুরার গণ আন্দোলনে নতুন নতুন পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়। যেমন ঃ-

১) অবস্থান ধর্মঘট

২) কলম ধর্মঘট

৩) বিক্ষোভ মিছিল

৪) মশাল মিছিল

৫) বিক্ষোভ জমায়েত
৬) গণছুটি
৭) গণ দরখাস্ত
৮) কর্ম বিরতি
৯) হরতাল
১০) বন্ধ
১১) বেতন বয়কট
১২) ঘেরাও
১৩) বিধান সভা অভিযান
১৪) পদযাত্রা
১৫) অসহযোগ
১৬) আইন অমান্য
১৭) বাজার বয়কট
১৮) গণ- ডেপুটেশান
১৯) পথসভা
২০) অবরোধ
২১) নিন্দা-ধিক্কার
২২) প্রতিরোধ

ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতিতে গণ অন্দোলন গড়ে তোলা হয় ।

১৯৬১- থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এসব পদ্ধতি ব্যবহার করে সারা রাজ্যে গণ-আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি করা হয় ।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হবার পর উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন শুরু হয় ।

যুব সমিতি প্রথম পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বড় - বড় - মিছিল মিটিং ডেপুটেশান, বিধান সভা অভিযান, ইত্যাদি আন্দোলন সংগঠিত করে । কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদী ঝোঁক সৃষ্টি হওয়ায় যুবসমিতি ভেঙ্গে টি.এন.ভি দল সৃষ্টি হয় ।

সংবিধান বিরোধী দাবী দাওয়া নিয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী পথে বিচ্ছন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হয় । ক্রমে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় ।

এগুলো গণ আন্দোলনের পর্যয়ে পড়েনা । স্বাধীন ত্রিপুরা ও বিদেশী বিতাড়নের দাবী সংবিধান বিরোধী এবং আন্দোলনের পদ্ধতিও অগণতান্ত্রিক । নিরীহ নাগরিক, হত্যাকরা, অপহরণ করা, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেওয়া এগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা চ্যালেঞ্জ মাত্র ।

এভাবেই ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন আন্দোলনের পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে । পরিবর্তনের ধারাও লক্ষনীয় ।

চল্লিশের দশকের কট্টর সশস্ত্র বিপ্লবী নেতা নৃপেন চক্রবর্তী ১৯৬০ সালে অমরণ অনশন শুরু করে গান্ধীবাদী আন্দোলনের পথে পা বাড়ালেন । তিনিই অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন । এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ক্ষেত্রেও তিনি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে স্মরণীয় ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত হয়েছেন । অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও সন্ত্রাসবাদের পথ পরিত্যাগ করে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে । আশা করা যাচ্ছে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিগুলোর অবলুপ্তি ঘটবে। সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন সৃষ্টি করে উন্নত মানবিক পদ্ধতিতেই গণ আন্দোলন পরিচালিত হবে ।

ভারতের গণতন্ত্র সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে । সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শকে বিষাক্ত ও বিপর্যস্ত করছে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং আদর্শহীনতা।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই এসবেব মোকাবিলা কবতে হবে । কাবণ দেশেব অধিকাংশ মানুষ গণতন্ত্রকেই ভাবতেব শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গন্য কবে ।

সাধাবণ নির্বাচনেব ফলাফল বিচাব কবলেই বোঝাযায় গণতন্ত্র ধ্বংস কবাব কোন প্রচেষ্টাকেই ভাবতবাসী সমর্থন কবেনা ।

১৯৭২ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিবা গান্ধী বিপুল ভোটে জযী হলেন আবাব ১৯৭৭ সালেব নির্বাচনে বিপুল ভোটে হেবে গেলেন । কাবণ ১৯৭৫ ৭৬ সালেব জরুবী অবস্থা ভাবতীয গণতন্ত্রেব প্রতি চবম আঘাত রূপেই গণ্য হযেছে ।

একইভাবে ১৯৯৯ সালে বি জে পি দল তাদেব সাম্প্রদাযিক দাবী ও নীতিগুলো বাক্‌স বন্দী কবে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনেব কর্মসূচী ঘোষনা কবায দেশবাসী বি জে পি ব নেতৃত্বে এন ডি এ অর্থাৎ ন্যাশানাল ডেমোক্রেটিক এলাযেন্সকে ভোট দিযে ক্ষমতায প্রতিষ্ঠিত কবেছিল । কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালন না কবে জনস্বার্থ বিবোধী নীতি অনুসবণ কবা এবং গুজবাটে সবকাবী মদতে দাঙ্গা সৃষ্টি কবাব ফলে জনগণ ভোটেব বাক্সে বিপ্লব ঘটিযে দিযেছে । বি জে পি কল্পনাও কবতে পাবেনি ২০০৪ সালেব নির্বাচনে এভাবে হাবতে হবে।

ত্রিপুবায ১৯৮৮ সালে কংগ্রেস ও যুব সমিতিব জোটকে ভোট দিযে জনগণই ক্ষমতায বসিযেছিল কিন্তু জোট সবকাবেব কাজকর্ম জনস্বার্থ বিবোধী গণ্য হওযায বিপুল ভোটে পবাজিত কবে ক্ষমতা চ্যুত কবেছে সেই জনগণই ।

এ ডি সি নির্বাচনেও একই ঘটনা ঘটেছে । সুস্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলনই সুস্থ সবকাব গঠনেব একমাত্র উপায । গণতান্ত্রিক চেতনাই হল এই শক্তিব মূল উৎস ।

গণ আন্দোলন সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের প্রভাব

গণআন্দোলন সৃষ্টি,প্রসার ও জনমত গঠনে সংবাদ পত্র হল অতি গুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। এজন্যই সংবাদ পত্রকে বলা হয়েছে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ।

ভারতের সংবিধানে সরকারের তিনটি প্রধান স্তম্ভ - ১) আইন বিভাগ ২) শাসন বিভাগ এবং ৩)বিচার বিভাগ।

এই তিনটি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচিত মন্ত্রীসভার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারে। প্রত্যেক দলের রয়েছে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পৃথক পৃথক কর্মসূচী।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন দলের সরকার গঠিত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দলের সরকার সঠিকভাবে জনস্বার্থ রক্ষা করে কাজ করছে কিনা তার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবার দায়িত্ব বহন করে সংবাদপত্র। এজন্য ভারতের সংবিধানে সংবাদপত্রকে মত প্রকাশের বিশেষ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য কোন স্বাধীনতাই অবাধ এবং সীমাহীন নয়। স্বেচ্ছাচারীতাকে স্বাধীনতা বলা যায়না। সংবাদপত্রের ব্যাপক সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে। সত্য ঘটনাকে নিরপেক্ষভাবে প্রচার করে সামাজিক অন্যায় অ বিচার ও দেশের সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশের নাগরিকদের সচেতন করা এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য গণআন্দোলনকে উদ্দীপিত করা সংবাদপত্রের পবিত্র দায়িত্ব।

কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ সংবাদপত্র ব্যক্তি মালিকানায় চলে। তাদের দুটি লক্ষ্য থাকে **একটি হল** সরকারী বিজ্ঞাপন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য অর্ধসত্য, মিথ্যা, এমনকি প্ররোচনামূলক সংবাদ ও সংবাদভাষ্য প্রচার করে জনমতকে বিভ্রান্ত করা। **দ্বিতীয়টি হল** প্রত্যেক মালিক ও সম্পাদকের বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী সংবাদ তৈরী ও পরিবেশন করা। এর মূল উদ্দেশ্য হল ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করা এবং জনমতের বিভাজন সৃষ্টি করা।

আরেক ধরনের সংবাদপত্র রয়েছে যা রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং দলের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী প্রচার ও দলীয় সংগঠন গড়ে তোলার জন্যই সংবাদ ও সংবাদভাষ্য পরিবেশন করা হয়।

তৃতীয় আরেক ধরনের সংবাদপত্র রয়েছে যারা নিরপেক্ষতার ভান করে এবং বিভিন্ন ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে। কিন্তু সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালায়।

সংবাদপত্র আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান মুদ্রন যন্ত্র আবিষ্কারের আগে সংবাদপত্র প্রকাশের কোন সুযোগ ছিলনা।

আধুনিক সংবাদপত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তা পাঠকের সামনে তুলে ধরে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এবং সাংস্কৃতিক জগতে যে সব ঘটনা ঘটছে সংবাদ পত্র তা পাঠকের সামনে তুলে ধরছে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে

সচেতন করছে । নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে জনজীবনে যে পরিবর্তনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে তাও তুলে ধরে সংবাদপত্র । ফলে জনচেতনার উন্নতি ঘটতে থাকে ।

গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে জনমত । এই জনমতই গণ আন্দোলনের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে সরকারী কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রন করে। এবং প্রয়োজনে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করে নতুন সরকার গঠন করে।

রেডিও, টিভি অনেকটাই সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকে । কিন্তু সংবাদপত্র অনেক বেশী স্বধীনতা ভোগ করে । সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল গণতন্ত্রের উপর আঘাত করা ।

স্বাধীনতার পরে একবারই শুধু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন । পরবর্তী নির্বাচনে দেশের গণতান্ত্রিক জনগণ এরূপ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল । তারপরই সংবিধান সংশোধন করে প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছেমত জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা খর্ব করা হয় ।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত সংঘাত যখন সৃষ্টি হয়- তখন ও সংবাদপত্র জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় । অনেক সময় তা ধ্বংসাত্মক পরিনতিও ডেকে আনে । যেমন ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় কলংকজনক দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছিল । সংবাদপত্রের বিভ্রান্তিকর প্রচার জনমনে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করার ফলে দাঙ্গা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

এই সময় সংবাদপত্রের দায়িত্ব বোধ এবং সংযমের অভাব দেখা গিয়েছিল । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এরূপ ঘটনার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে ।

অন্যদিকে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধের সময় ত্রিপুরার সংবাদপত্রগুলো অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে ।

বিশেষত দৈনিক সংবাদ এবং ত্রিপুরা দর্পণ পাক বাহিনীর নির্মম, নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দারুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে । এবং শরনার্থীদের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে ।

তখনকার ত্রিপুরায় ১৬লক্ষ ত্রিপুরাবাসী প্রায় ষোল লক্ষ শরণার্থীর দায়িত্ব বহন করেছে । কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সার্বিক সাহায্য সত্ত্বেও ত্রিপুরাবাসীকে দীর্ঘ এক বছর ধরে বিভিন্নভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে ।

এই ঐতিহাসিক ঘটনা ত্রিপুরাবাসীকে আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোর মঞ্চে বিপুল মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এরকম মানবিক দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্ত বিশ্বের অন্য কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যাবেনা । ত্রিপুরার ঘরে ঘরে সেদিন শরনার্থীরা আশ্রয় পেয়েছিল ।

রাজন্যযুগের ত্রিপুরায় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো ।

মহারাজাদের উদ্যোগে এবং রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে প্রকাশিত ত্রিপুরাবার্তা সহ, ত্রিপুরা হিতৈষী- ত্রিপুরা প্রকাশ-ধূমকেতু- রবি এগুলো রাজপরিবারের উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়। অরুণ- পত্রিকাটি প্রকাশ করেন পন্ডিত চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য ।

এসব পত্রিকায় গণ আন্দোলন সৃষ্টির কোন উপাদান থাকার কথা নয় । কিন্তু পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকের মনে যে মানবিক চিন্তার বিকাশ ঘটে তার গুরুত্ব ও কম নয় । গণ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য এই মানবিক চেতনা হল প্রাথমিক স্তর । এই সময় পত্রিকা পাঠকের সংখ্যাও ছিল খুবই সীমিত ।

ত্রিপুরায় রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার এবং গণ আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৯৪৩ সালে প্রজামন্ডলের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকাটি হল বীরেণ দত্তের নির্দেশে অল্পদিনের মধ্যেই এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায় ।

গণ আন্দোলন সৃষ্টির উপযোগী পত্রিকা প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন । ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পরেই এই সুযোগ সৃষ্টি হয় ।

এই সময় থেকেই গণ আন্দোলন সৃষ্টিকারী সংবাদপত্র গুলোর আবির্ভাব ঘটতে থাকে ।

এই সময় থেকেই গণ আন্দোলন সৃষ্টিকারী সংবাদপত্র গুলোর আবির্ভাব ঘটতে থাকে

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হল গঙ্গা প্রসাদ শর্মা ও গোলাম নবীর **নবজাগরণ** । ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় প্রভাত রায়ের সম্পাদনায় **চিনিহা** । প্রভাত রায়ের অকাল মৃত্যুর ফলে সম্ভাবনাময় এই পত্রিকাটি ১৯৫৬ সালে বন্ধ হয়ে যায় ।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় জীতেন পালের অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা - **জনকল্যাণ** ।

১৯৫০ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় বীরেন দত্তের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক ত্রিপুরার কথা ।

পঞ্চাশের দশকেই পর পর প্রকাশিত হতে থাকে **অনিল ভট্টাচার্যের-সমাচার , অমিয় দেবরায়ের-সেবক ,বীরেশ চক্রবর্তীর-ত্রিপুরা, প্রমোদ ভট্টের- ত্রিপুরা বার্তা** । এগুলো সবই ছিল সাপ্তাহিক ঙগ ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক পত্রিকা - **জীতেন পালের সম্পাদনায় - জাগরণ** । ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় মোহন লাল রায়ের দৈনিক পত্রিকা নাগরিক

ষাটের দশকে পত্রিকা প্রকাশের জোয়ার সৃষ্টি হয় । এই সময়ে প্রকৃত গণ আন্দোলন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় । সেগুলো হল -- **ভূপেন দত্ত ভৌমিকের -দৈনিক সংবাদ, সমীরন রায়ের -ত্রিপুরা দর্পণ, সুশীল চৌধুরীর - গণদূত, কমলা রঞ্জন তলাপাত্রের - মানুষ, ইন্দ্র মোহন দেবনাথের - বিবেক** এগুলি সবই বাংলা দৈনিক ।

এই সময়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা গুলোর মধ্যে মহেন্দ্র দেববর্মার - **ইয়াফী**, কমলজিৎ সিংহের - **মরূপ**, শ্যামাচরন ত্রিপুরার - **চিনিকক**, রাম তরন ভট্টাচার্যের- **ন্যায়দন্ড**, দীলীপ কুমার চৌধুরীর - **জনতার আদালত** । ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য ।

এসব পত্রিকা ত্রিপুরায় গণ আন্দোলন সৃষ্টিতে জনগণকে বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে । অবশ্য পত্রিকা গুলোর বিভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবের ফলে ত্রিপুরার জনমত এবং গণ আন্দোলন নানা ধারায় বিভক্ত হয়েছে । কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার মূল

আদর্শ অক্ষুন্ন রয়েছে।

গণ আন্দোলন সংগঠিত করার মূল দায়িত্ব থাকে বিরোধী দল গুলোর উপর। ত্রিপুরায় বামপন্থীরা যখন বিরোধী দলে ছিল তখন গণ আন্দোলন বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। ফলে ত্রিপুরায় গণ চেতনার মান খুব উন্নত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে বাপক সংখ্যায় ভোট দানের মধ্যেই তা প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর সরকার বিরোধী দলগুলো সুস্থ ও সচেতন গণ আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাই নিতে পারেনি। ফলে সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ শক্তিশালী হযে উঠেছে। জনগণ প্রতিবোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারায খুবই অসহায় বোধ করছে।

গণ আন্দোলনের এই শূন্যতা পুরণের দায়িত্ব নিতে হয়েছে ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলোকেই। এর ফলে বিরোধী দল গুলোব প্রভাব এবং গণ আন্দোলন সংগঠিত কবার ক্ষমতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। এটা সুস্থ গণতন্ত্রেব পক্ষে শুভ সংকেত নয়।

প্রজাতান্ত্রিক ত্রিপুরার সংবাদ পত্রের বিশিষ্ট সম্পাদকগণ

বীরেন দত্ত, পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, প্রভাত বায়, জীতেন পাল

অনিল ভট্টাচার্য্য, অমিয় দেববায, সুশীল চৌধুবী, কমলজিৎ সিংহ

ভুপেন দত্ত ভৌমিক, গৌতম দাস, সমীরণ রায়, সুবল দে

কারাগার সংশোধনের জন্য আন্দোলন

পরাধীন ভারতে বৃটিশ কারাগার ছিল এক বিভীষিকা । বিচারাধীন বন্দীদের উপর চলতো অমানুষিক নির্যাতন । বিভিন্ন তথ্য আদায়ের জন্য হাতের ও পায়ের নখের নীচে সূচ ঢুকিয়ে দেওয়া, বুকের উপর বাঁশ বসিয়ে দুদিকে দুই সেপাইকে দিয়ে চাপ দেওয়া, সারা শরীরে ডান্ডা দিয়ে মারা, শরীরের বিভিন্ন স্থানে সিগারেটের আগুন চেপে ধরা, দুই পায়ে লোহার বেরী পরিয়ে মাথা নীচে রেখে ঝুলিয়ে দেওয়া, ইত্যাদি নানা পন্থায় অত্যাচার চালানো হতো ।

শাস্তি প্রাপ্ত কয়েদীদের উপর পাশবিক অত্যাচারের সঙ্গে কল্পিত যম রাজার ভয়ংকর নরক যন্ত্রনার তুলনা চলতে পারে । নরক যন্ত্রনার কাহিনী সম্ভবত কারাগারের অত্যাচারের দৃষ্টান্ত থেকেই নেওয়া হয়েছে ।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর নির্যাতন ছিল আরো ভয়ানক, আরো নির্মম। হাতে পায়ে লোহার ডান্ডা বেরী পরিয়ে ছোট সেলের অভ্যন্তরে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো ।

স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবকেরা এসব নির্যাতনের বিরুদ্ধে নানা কায়দায় প্রতিবাদ জানাতো । জেলখানায় অমরণ অনশন করে যতীন দাস মৃত্যু বরণ করার পর সারা দেশে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে উঠে ।

বিপ্লবীরা অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের গুলি করে হত্যা করতে থাকে । এসব অত্যাচারী পুলিশ অফিসারদের মধ্যে ইংরেজ ছাড়াও বহু ভারতীয় ছিল ।

অফিসারদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ায় বৃটিশ সরকার কিছু কিছু আইনের সংস্কার করতে বাধ্য হয় ।

বন্দী কয়েদীদের সঙ্গে পশুর মত আচরণ করা হতো এবং তাদেরকে প্রায় পশুখাদ্যই পরিবেশন করা হতো । ক্রমে এসবের পরিবর্তন হতে থাকে ।

বৃটিশ কারাগারে বন্দী নেতারাই যখন স্বাধীনতার পরে দেশের কর্ণধার হলেন । তখন তাদের অনেকেই পুরানো অভিজ্ঞতার কথা ভুলেই গেলেন । বৃটিশের তৈরী প্রশাসন, বৃটিশ আইন এবং বৃটিশের প্রশিক্ষন প্রাপ্ত নির্যাতনকারী কর্মচারীরাই বহাল রইলো। কারাগারে কয়েদীদের জীবনে কোন পরিবর্তন এলনা ।

অকংগ্রেসী সব দলই এর বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তুললেন । ফলে কেন্দ্রীয় সরকার কারাগারের কিছু আইন ও রীতিনীতি বাতিল করে নতুন আইন ও নতুন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন ।

সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রত্যেক অপরাধীর জীবনে এক করুণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। বহু দুঃখ-বঞ্চনা ও নির্যাতনের ফলে মানুষের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে । সামাজিক ন্যায়বিচার না পেয়ে নিষ্ঠুর উপায়ে প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে ।

তাছাড়া অধিকাংশ অপরাধী সাময়িক উত্তেজনা বশত অপরাধ করে ফেলে । পরে অনুশোচনায় ভোগে ।

রাজনৈতিক বন্দীরা জনগণের স্বার্থে লড়াই করেই বন্দী হয় । মিথ্যা মামলায়ও বহু নেতা ও কর্মীদের বন্দী করা হয় ।

কাজেই কারাগারে প্রয়োজন মানবিক আচরণ এবং মানবিক পরিবেশ । দেশের বহু রাজ্যে কারাগার গুলোতে এই পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ শুরু হয়েছে ।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার এবিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছে । কয়েদীদেব জন্য শিক্ষা - স্বাস্থ্য-কর্ম সংস্থানের উপযোগী প্রশিক্ষণ - সংস্কৃতিক কার্যকলাপেব মাধ্যমে মানসিকতার উন্নতি ঘটানো এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মানবিক আচরণ ইত্যাদিব উপব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।

ত্রিপুরার ১১টি কারাগারেই সংশোধনের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । কৃষি ও কুটির শিল্পে নানা রকম প্রশিক্ষণ নিয়ে কয়েদীরা মুক্তির পবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে । আগবতলা কেন্দ্রীয় কারাগাবে কৃষি ও মৎস্য চাষের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে । তাছাড়া পশুপালন, তাঁত, বাঁশবেতের কাজ, বাইন্ডিং, প্রিন্টিং, টেইলারিং, ও কম্পিউটারে বিশেষ প্রশিক্ষনেব ব্যবস্থা রয়েছে। মহিলা কাবাগাবেও এসব ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বাধীনতার পরেও তীব্র গণ-আন্দোলনের ফলেই কারাগার সংস্কারের আয়োজন শুরু হযেছে । কিন্তু বহু রাজ্যে এখনো সন্তোষজনক উন্নতি হযনি ।

হরিজনদের জন্য আন্দোলন

হিন্দু সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, সবচেয়ে বঞ্চিত, এবং অস্পৃশ্যরূপে গণ্য সাম্প্রদায় হল হরিজন সম্প্রদায় । ত্রিপুরা রাজ্যে মেথর ও মুচিরা এই সম্প্রদায়ের -অন্তর্ভুক্ত ।

মহাত্মাগান্ধী হরিজন নাম দিয়ে কিছুটা মর্যাদা দেবার চেষ্টা করলেও পরাধীন ভারতে সামাজিক মর্যাদা হরিজনরা দেশের কোথাও পায়নি ।

প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মল বহন করার জন্য মেথর সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে আর গৃহপালিত পশুর মৃতদেহ বহন করে বসতি এলাকার বাইরে নির্দিষ্ট পতিত জায়গায় ফেলার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল মুচি সম্প্রদায় । পশুর মৃতদেহেব চামরা ও হার সংগ্রহ করে মুচিরা জীবিকা নির্বাহ করতো ।

উচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দুরাও মনে করতো সমাজের প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে । এই পেশা বাদ দিলে সমাজের পরিচ্ছন্নতা এবং সভ্যতা টিকবেনা । এজন্যই শত শত বছব ধরে এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে তাদের পেশা পরিবর্তন করতে না পারে তার জন্য বহু বিধি নিষেধ তৈরী করা হয়েছে ।

ভারতে হাজার হাজার গ্রামবাসী এখনো নদী-নালা, পুকুর ও জলাশয়ের পাড়ে এবং জঙ্গলে মলত্যাগের কাজ সম্পন্ন করে । শুধু বিত্তবান পরিবারের লোকেরাই বাসগৃহ থেকে দূরে কাঠের একটি খোলা ছোট খাট বানিয়ে নীচে টিন বা ড্রাম বসিয়ে মলত্যাগ করে । এই ব্যবস্থাকে খাটা পায়খানা বলা হতো ।

মেথর সম্প্রদায় মলের টিন বা ড্রাম মাথায় করে বহন করে নিয়ে দূববর্তী নির্দিষ্ট পতিত জমিতে মল ফেলে আবাব ড্রাম বা টিনটিকে যথাস্থানে ব্যবহারের জন্য রেখে আসতো ।

আগরতলা শহরে ৫০ এর দশকেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । পুরসভা মালবহনের গাড়ী কিনে দেবার পরও মেথরের কাজ ঠিকই ছিল । শুধু মল বহনের দূরত্বটাই কমেছিল ।

গান্ধীজী এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছিলেন । তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে মল বহনের বিকল্প ব্যবস্থা না করে মেথরদের অস্পৃশ্যতা দূর করা যাবেনা । এ ব্যবস্থা বন্ধ না হলে অস্পৃশ্য মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে সব বাধা রয়েছে তাও দূর করা যাবেনা । স্বাধীনতার পরে গান্ধীজীর চিন্তাধ'রা কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন করে।

১৯৪৮ সালে ত্রিপুরায় জাতীয় কংগ্রেস দলের নেতা সুখময় সেনগুপ্ত প্রথম পুরসভায় কর্মরত হরিজনদের সমস্যা নিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জরুরী কয়েকটি দাবী সমাধানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেন । কর্তৃপক্ষ হরিজনদের দাবী মেনে না নেওয়ায় তিন দিন হরতাল পালন করা হয়। সুখময় সেনগুপ্ত রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হন ।

১৯৫০ সালে গান্ধীবাদী নেতা ক্ষীরোদ সেন হরিজনদের মধ্যে সংগঠন তৈরীর উদ্যোগ নেন । কংগ্রেস নেতা চিত্তদেবকে সম্পাদক করে হরিজনদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ্য বৃদ্ধ ভুলন বাসফরকে সভাপতি করে একটি সংগঠন তৈরী করা হয় । এ বছরই ভারতের সংবিধান চালু হয় । পরবর্তী

সময়ের সভাপতিরা হলেন শচীন্দ্র লাল সিংহ , ক্ষিরোদ সেন, তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ।

ভারতের সংবিধানে দেশের সমস্ত অঞ্চলের ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের সমান মর্যাদা ও সমান অধিকার ঘোষণা করা হয় । শিক্ষা - স্বাস্থ্য পরিষেবা ও সংস্কৃতির অধিকার সহ যে কোন পেশা গ্রহনের অধিকার স্বীকৃত হয় ।

হরিজনদের শিক্ষা- সামাজিক মর্যাদা এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয় ।

ইতিমধ্যে সেনিটারী ও আধা সেনিটারী পায়খানা তৈরীর নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে সারা দেশে খাটা পায়খানা নিষিদ্ধ করা হয় ।

আগরতলা পুরসভা শহরের সর্বত্র খাটা পায়খানার পরিবর্তে সেনিটারী পায়খানা করার জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা করে । কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ঋনের পরিমান কম এবং চাহিদাব তুলনায় বরাদ্দ অর্থও কম থাকায় এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে দুই দশকের বেশী সময় লেগে যায় ।

গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেক পরিবারকে একটি গভীর গর্ত করে উপরে সিমেন্টের তৈরী স্লেভ বসিয়ে আধা সেনিটারী পায়খানা তৈরীর জন্য বিনামূল্যে সিমেন্ট স্লেভ দেওয়া হয।

এভাবে সুদীর্ঘ কালের একটি কলংকজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে এবং হরিজনরা একটি ঘৃন্য পেশা থেকে মুক্তি লাভ করে ।

হরিজনদের শিক্ষা ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । কারণ আইন পাশ করলেই সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করা যায়না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে বা কোন মন্দিরের উৎসবে যোগদান করার ব্যাপারে নানা বাধা লক্ষ্য করা গেছে ।

স্বাধীনতার আগেই গান্ধীজী এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করে ১৯৩২ সালে হরিজন সেবক সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন । হরিজনদের শিক্ষা-উন্নয়ন-পরিচ্ছন্নতা - সামাজিক মর্যাদা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি সংবিধান রচনা করেন ।

স্বাধীনতার পরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হরিজন সেবক সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৫৫ সালে ত্রিপুরায় কংগ্রেস দলের সম্পাদক চিত্তদেব কে প্রতিনিধি করে কেন্দ্রীয় সংগঠনের অনুকরণে সংস্কার মূলক কাজ শুরু হয় ।

দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে চিত্তরঞ্জন দেব এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করে চলেছেন । ক্ষীরোদ সেন জীবিতকালে সর্বপ্রকারে সহযোগিতা করেছেন । রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করে এই প্রতিষ্ঠানকে সচল করে রেখেছে ।

হরিজন সেবক সংঘ- ৫টি মহিলা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালনা করে অনাথ ও নির্যাতিতা মহিলাদের শিক্ষা-আশ্রয় বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষন কর্ম-সংস্থান ও বিবাহের আয়োজন করে ।

হরিজন সেবক সংঘ হল ত্রিপুরায় একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান । হরিজনদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানীয় গ্রামবাসীরা যুক্ত থেকে সহযোগিতা করে চলেছে । প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক কমিটিও গঠন করা

হয়েছে। রাজ্যভিত্তিক সংগঠনের বর্তমান সভাপতি হলেন । চিত্ত দেব এবং সম্পাদক হলেন চিত্রা দেব।

সরকারী সাহায্য ছাড়াও ও এন জি সি এবং বহু মহৎ ব্যক্তির ব্যক্তিগত দানে বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হরিজনদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে মর্যাদাবোধ, পরিচ্ছন্নতা বোধ, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং সামাজিক কর্তব্য বোধ। বহু হরিজন যুবক-যুবতী আধুনিক শিক্ষা লাভ করে সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছে।

এছাড়া পুরসভায় কর্মরত হরিজনদের ইউনিয়ন অজয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে বহু আন্দোলন সংগঠিত করে কর্মক্ষেত্রে উপযুক্ত মর্যাদা এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধা লাভ করেছে। অনিয়মিত কর্মীরা স্থায়ী হয়েছে।

চিত্ত দেব

চিত্রা দেব

দ্বাদশ অধ্যায়
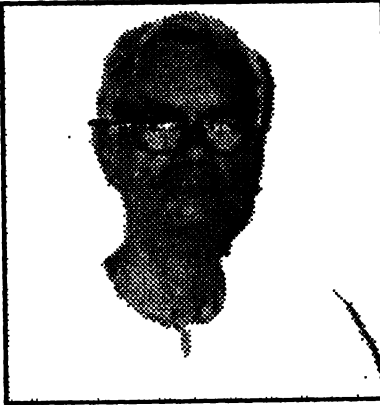
শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য আন্দোলন

ত্রিপুরায় রাজন্য যুগের ইতিহাসে কখনো জাতি উপজাতির মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দেয়নি। মহারাজা রত্ন মানিক্যের সময় বাঙ্গালী কৃষক, কারিগর, কামার, কুমার, সূত্রধর, ধোপা, নাপিত, মৎসজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার প্রায় দশহাজার বাঙ্গালী মহারাজার আমন্ত্রণে ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। তারপর থেকে প্রতি বছরই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা ত্রিপুরায় এসে বসবাস শুরু করেছে। সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের মধ্যে কখনো কোথাও জাতি- উপজাতি বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি।

ভারতভূক্তির পর ব্যাপক সংখ্যায় বাঙ্গালী উদ্বাস্তু আগমনের ফলে একদল যুবক সেংক্রাক নামক সংগঠন তৈরী করে বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারের সূচনা করে। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল নগন্য। উপজাতি জনগোষ্ঠীর কোন অংশের মধ্যেই তারা কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি।

১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে সেংক্রাক দলের নেতা স্নেহকুমার চাকমা কাঞ্চনপুর কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে মাত্র ৬১টি ভোট পেয়েছিলেন।

এই নির্বাচনী ফলাফলে প্রমাণ হয় সেংক্রাক দলের প্রতি উপজাতি জনগণের সমর্থন ছিলনা। অন্যদিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা থেকে প্রমাণিত হয় সেংক্রাক দলের নেতাদের মধ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিলনা। জন সমর্থন না থাকায় সেংক্রাক দলের বিলুপ্তি ঘটে। নেতাদের মধ্যে অনেকে কংগ্রেস দলে যোগ দেন।

তারপর থেকে দীর্ঘদিন যাবত উদ্বাস্তু এবং জুমিয়ারা পুণর্বাসনের দাবীতে বহু মিছিল মিটিং যৌথভাবেই জাতি উপজাতির মানুষেরা করেছে।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতির আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যেব সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

সত্তরের দশকে উপজাতি যুব সমিতির একটা অংশ 'স্বাধীন ত্রিপুরা এবং বিদেশী বিতাড়নের শ্লোগান দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সূত্রপাত করার পরই শিক্ষিত উপজাতি যুবকদের একাংশের মধ্যে বাঙ্গালী বিদ্বেষ তীব্রভাবে প্রকাশ পেতে থাকে।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান মিশনারীদের একাংশ বাঙ্গালী বিদ্বেষকে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য ধর্মান্তর করনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন করে।

১৯৮০ সালের দাঙ্গা মিশনারীদের ধর্মান্তর করনের পক্রিয়ায় ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। ক্রমে ক্রমে ছোট বড় ১৭টি সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সারা রাজ্যে নির্বিচারে নিরীহ মানুষকে হত্যা করা, অপহরণ করে মুক্তিপন আদায়করা মুক্তিপণ না পেলে হত্যা করা, বাঙ্গালী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, নিরাপত্তা বাহিনী ক্যাম্প আক্রমণ করে হত্যা ও অস্ত্র লুষ্ঠন ইত্যাদি কাজের পুলিশ মাধ্যমে সারা রাজ্যে আতংক ছড়িয়ে দেয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার এসব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে আপোষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ফলে তীব্র গণ অসন্তোষ দেখা দেয়। এর ফলে কংগ্রেস ও যুবসমিতির জোট

সরকারের জন্ম হয় । কিন্তু জোটসরকার জনগণের আশাপুরণে ব্যর্থ হয় । সারা রাজ্যে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয় ।

তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সন্ত্রাসবাদী সমস্যার মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত হয় । কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য পাওয়া যায়নি । তবুও জনগণ বামফ্রন্টের উপরই আস্থা স্থাপন করেছে । কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্টের কোন বিকল্প শক্তি এখনো তৈরী হয়নি ।

চতুর্থ বামফ্রন্ট সরকার আন্তরিক ভাবেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করে । মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহনের পরই ২৬শে এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখে সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয় । রাজের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এই আহ্বানে সারা দিয়ে প্রত্যেক দলের মতামত প্রকাশ করে ।

সি পি এম দলের পক্ষ থেকে সন্ত্রাসবাদী সমস্যাটিকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খোঁজার আহ্বান জানানো হয় । সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সংগ্রহের দুর্বলতা দুর করে প্রচলিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করাব দাবী করা হয়।

কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন কবে দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা দাবী করা হয় । বিরোধী দল গুলির উপর দোষারূপ করে প্রচার বন্ধ করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর উপযুক্ত পুনর্বাসনের দাবী করা হয় । সারা রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণার দাবীও করা হয় ।

উপজাতি যুবসমিতির পক্ষ থেকে দাবী করা হয় রাজ্যে কতগুলি সন্ত্রাসবাদী দল বা গ্রুপ রয়েছে তার তথ্য সরকারকে প্রকাশ করতে হবে । শহরে খুন হলে বলা হয় সমাজ বিরোধীদের কাজ আর গ্রামে খুন হলে বলা হয় সন্ত্রাসবাদীদের কাজ । আসল ঘটনার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়না। শহরে সমাজ বিরোধীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সর্বাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের দরকার হয়না । তবুও শহরের দুস্কৃতিকারীদের ধরা হয়না কেন ? এ প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে । বর্তমানে পাহাড়ে অপহরণ একটি ব্যবসায় পরিনত হয়েছে । এর বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় । এবং তা নিতে হবে ।

জনতা দলের পক্ষ থেকে বলা হয় সমস্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্দ্ধে উঠে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । উগ্রপন্থী কোন গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে ।

টি.এন.ভি দলের পক্ষ থেকে বলা হয় - সন্ত্রাস বাদ সৃষ্টির কারনগুলো প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে । সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে শান্তি আলোচনার জন্য সাদা পতাকা সহ শান্তি শিবির স্থাপন করতে হবে । রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ চাকুরী উপজাতি যুবকদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে । হাজার হাজার উপজাতি যুবক যারা বিভিন্ন কারনে স্কুল শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেনি তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে । নতুবা এরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কোন না কোন উগ্রপন্থী দলে যোগ দিতে বাধ্য হবে । এবিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে ।

বি জে পি দলের পক্ষ থেকে বলা হয় নিরাপত্তা বাহিনীকে স্বাধীনভাবে পরিস্থিতির

মোকাবেলা করার ক্ষমতা দিতে হবে । সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সরকার কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে তার বিবরণ দিয়ে একটি শ্বেতপত্র অবিলম্বে প্রকাশ করার দাবী করা হয়।

সি পি আই দলের পক্ষ থেকে দাবী করা হয় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে ব্যাপক ভাবে প্রচার অভিযান চালাতে হবে । বামপন্থীরা নাসা আইন ব্যবহারের পক্ষপাতি নয় । তবুও জনগণের স্বার্থে আইনের অপব্যবহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা রেখে নাসা আইন প্রয়োগ করা উচিত ।

আর এস পি এবং ফরওয়ার্ডব্লক দল সহ অন্যান্য দলগুলো সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে দাবী জানিয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজ চালু রাখার জন্যে প্রয়োজন হলে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ চলতে থাকায় ব্লকস্তর পর্যন্ত সর্বদলীয় শান্তিও প্রচার অভিযানে ব্যাপক সারা পাওযা গেছে । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রচার অভিযানকে মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্থায়ী হতে পারেনি।

পরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজস্ব উদ্যোগে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু করে । কিন্তু এভাবে সর্বদলীয় প্রচারের প্রভাব সৃষ্টি করা যায়না ।

সন্ত্রাসবাদের বিভিন্ন কারনের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যাটি হল অর্থনৈতিক। ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলো ভারতেব স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত ছিলনা । ফলে ভারতভুক্তির পর শিক্ষিত উপজাতি যুবকদের মধ্যে স্বাধীন সত্তা অর্জনের একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশী মদতে এই মোহ আরো পুষ্ট হয়েছে।

ব্যাপক স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে এই মোহভঙ্গ হতে পাবে এবং ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করার মধ্য দিয়ে ভারতীয়ত্ব বোঃ জাগ্রত হতে পারে । এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে ।

রাজ্যে এডিসি গঠন হল এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। কিন্তু তা এখনো সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় প্রধান কারনটি হল অর্থনৈতিক । উত্তরপূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘকাল যাবত অবহেলা করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সমীক্ষার পর এই সত্যটুকু স্বীকার করেছে ।

বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় বহু উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে । কিন্তু সন্ত্রাসবাদের কারনে গ্রামীন উন্নয়নের বহু কাজ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে । এর ফলে প্রধানত উপজাতি জন গোষ্ঠীর লোকেরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদের তৃতীয় প্রধান কারনটি হল- জাতীয় সংহতির উপলব্ধির অভাব । এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘকালের সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক ঐতিহ্যগত কারণ ।

আধুনিক যুক্তবাদী বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমেই জাতীয় সংহতির সমস্যাটির সমাধান হবে । ভারতীয় সংবিধানকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেই জাতীয় সংহতির বিকাশ ঘটবে।

ভারতে জাতি সত্তার বিকাশ ঘটেছে ৬০০ বছর আগে । কিন্তু উপজাতি জন গোষ্ঠীর জাতি সত্তার বিকাশ শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পরে। কাজেই জাতি-উপজাতির মানসিকতায় সৃষ্টি হয়েছে বিরাট ব্যবধান যা দূর করতে যথেষ্ট ধৈর্য এবং সংযমের প্রয়োজন ।

ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে কোন চেতনা ছিলনা । স্বাধীনতার পরে এই সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধানের কোন উদ্যোগও ছিলনা । উপজাতি জীবন ধারাকে উন্নত করে ভারতের মূল স্রোতে নিয়ে আসার জরুরী কর্তব্য টুকু পালন করেনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারগুলো । এই উদাসীনতার বিরুদ্ধেই শিক্ষিত উপজাতী যুবকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং প্রজাতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতি আস্থা সৃষ্টি হয়েছে । ফলে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো গণভিত্তি গড়ে তুলতে পারছেনা । শুধু অস্ত্রের জোরে কোন কিছুই লাভ করা যাবেনা এই চেতনার বিকাশ ঘটেছে বলেই সন্ত্রাসবাদী দলগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং আত্মসমর্পণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী উপজাতি আঞ্চলিক দলগুলো ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বার বার ভাঙ্গছে । তাই স্বায়ত্তশাসনের সুফল জনগণ ভোগ করতে পারছেনা ।

আই এন পি টি ভেঙ্গে সর্বশেষ আঞ্চলিক দল এন এস পি টি গঠিত হয়েছে । দলের নামকরনের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে । ন্যাশনাল সোসিয়ালিষ্ট পার্টি অব ত্রিপুরা দলের এই নামকরনের দ্বারা বুঝানো হচ্ছে তারা জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী । একটা মতাদর্শ ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক দল টিকে থাকতে পারে না, এই অনুভূতি উপজাতি নেতাদের মধ্যে এবারই প্রথম প্রকাশ পেল । এটা অবশ্য প্রশংসনীয় ।

এই নতুন দলের নেতারা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে । উপজাতিদের নেতৃত্বে এরাই প্রথম সারা রাজ্যব্যাপী আলোড়ন সৃস্টি করে শান্তি ও সম্প্রীতির দাবীতে রাজ্যের সম্পূর্ণ জাতীয় সড়কব্যাপী পদ যাত্রার এক ঐতিহাসিক মিছিল ও জন জমায়েত করেছে ।

হীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরার নেতৃত্বে এই পদযাত্রা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ধর্মনগর থেকে আগরতলা এবং সাব্রুম থেকে আগরতলা পর্যন্ত মিছিল করে সারা রাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

২০০৪ সালের ৪ ঠা জানুয়ারী ভোর ৪ টা থেকে দুদিক থেকে পদযাত্রা শুরু হয় ।

ধর্মনগরে ১২ হাজার মানুষের জমায়েত হয় । সাদা পায়রা উড়িয়ে হীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা পদযাত্রা শুরু করেন । সাত হাজার মানুষ পদযাত্রায় অংশ গ্রহন করে।

দীর্ঘ পদযাত্রায় মাঝে মাঝে বিশ্রামের জন্য ধর্মনগর থেকে অগরতলা পর্যন্ত সাতটি বিশ্রাম ক্যাম্প স্থাপন করা হয় । পদযাত্রায় অংশগ্রহণ কারীদের খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন স্থানীয় নেতারা ।

বাগবাসা, পানিসাগর- পেঁচারথল- মনু- আমবাসা- চাকমাঘাট-ও চম্পকনগর এই সাতটি বিশ্রাম ক্যাম্প থেকে স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে বহুলোক পদযাত্রায় যোগ দেয় ।

কিন্তু এই শান্তি ও সম্প্রীতির উদ্যোগকে বাধা দেবার চেষ্টাও আড়াল থেকে করা হয় । বাগবাসায় প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়া হয় । ফলে একটা বিশৃঙ্খলা

দেখা দেয় । চারদিকে গাড়ী পাঠিয়ে ৪০টি হোটেল থেকে অর্দ্ধেক লোকের খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় । বাকীদের জন্য ধর্মনগর থেকে চিড়া মুড়ি গুড় সংগ্রহ করা হয় । কিন্তু চাহিদার তুলনায় এসব খাদ্য কম হওয়ায় অনেকে কাঁচা শাক সবজি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন ।

আবার রাতের বেলায় পেঁচারথল বিশ্রাম ক্যাম্পে অজ্ঞাত পরিচয় দুস্কৃতিকারীরা হীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুড়ে পালিয়ে যায় । কিন্তু অতি দ্রুত নিক্ষেপ করায় বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় । কোন কারনে বোমাটি পূর্ণ শক্তিতে ফাটেনি । মাছমারার বিশিষ্ট নেতা গসিরাম ত্রিপুরার পায়ে আঘাত লাগে । পায়ের মাংস ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন ।

এসব ঘটনায় পদযাত্রীদের জেদ বেড়ে যায় । পথে পদযাত্রীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে ।আগরতলার পথে পদযাত্রীদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে ।আগরতলায় বিশাল জমায়েতে পদযাত্রীদের বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয় ।

সাব্রুম থেকে প্রায় পাঁচ হাজার পদযাত্রী ৪ঠা জানুয়ারী ভোর ৪টায় আগরতলার উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু করে । পথে জাতীয় সড়কের উপর ছয়টি স্থানে বিশ্রাম শিবির খোলা হয় । সাব্রুম-আভাঙ্গা-মনু- চন্দ্রপুর- বিশ্রামগঞ্জ - সূর্যমনিনগর এই ছয়টি বিশ্রাম শিবির থেকে স্থানীয় নেতাদের নেতৃত্বে বহুলোক পদযাত্রায় অংশ গ্রহন করে ।

আগরতলা পর্যন্ত ধর্মনগর থেকে নেতৃত্ব দেন হীরেন্দ্র কুমার ত্রিপুরা, চরণ জয় ত্রিপুরা, শান্তিরঞ্জন রিয়াং, কৃষ্ণ চাকমা, কৃষ্ণ রিয়াং, লালরিম পিয়া-মলসই - লেবেন জয় রিয়াং, মায়া মোহন ত্রিপুরা, জহর জমাতিয়া, যাত্রা মোহন ত্রিপুরা যোগেন্দ্র রিয়াং, সুধন দেববর্মা, সুকুমার দেববর্মা, বিশ্বমোহন ত্রিপুরা গৌরাঙ্গ রিয়াং, রাজকুমার চৌধুরী, মুলুকচাঁদ দেববর্মা, উত্তম কুমার ত্রিপুরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

সাব্রুম থেকে নেতৃত্ব দেন - গৌরীশংকর রিয়াং, বুধু দেববর্মা, নক্ষত্র ত্রিপুরা, রবিজয় জমাতিয়া, চন্ডীবাসী মুড়াসিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ।

পদযাত্রায় মূল স্লোগান ছিল —

১) জাতি- উপজাতির শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে- করতে হবে ।

২) বিভ্রান্ত ভাই ও বন্ধুরা বন্দুক ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এস-ফিরে এস।

হীরেন্দ্র ত্রিপুরার নেতৃত্বে শুধুমাত্র উপজাতি জনগোষ্ঠীর এই পদযাত্রা এবং জমায়েত ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা ।

পরবর্তী সময়ে শহরের উপজাতি বুদ্ধিজীবীরাও হল সভায় মিলিত হয়ে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা ও প্রসারের জন্য আবেদন জানান।

১৯৮০ সালের দাঙ্গার পর বামফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী প্রতিটি ব্লক এলাকায় শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য প্রচার সভার সূত্রপাত করেন। বামফ্রন্ট সেই প্রচার অভিযান এখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

সারা রাজ্যে ব্লক ভিত্তিক শান্তি ও সম্প্রীতির প্রচার অভিযান

রাজ্যপালের কাছে আত্মসমর্পন ও শান্তির শপথ গ্রহণ